রাসায়েল ও মাসায়েল

৩য় খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

www.icsbook.info

রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খন্ড
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

শ প্র : ৩২
ISBN : 984-645-014-1

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১
চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

RASAIL-O-MASAIL Vol. III By Sayyed Abul A'la Maudoodi (R), Published by Shatabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone 8311292 1st Edition October 1991, 4th Print : July 2008.
Price Tk : 160.00 only.

www.icsbook.info

আমাদের কথা

ইসলামী জ্ঞান গবেষণার বিশ্ববরেণ্য বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে ১৯৩২ সালে 'তরজমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন, যা অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবত মানব জাতির কাছে ইসলামী জ্ঞান পরিবেশন করে আসছে। আজও সে পত্রিকাটি লাহোর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এ মাসিক পত্রিকায় তিনি ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে পরিবেশন করতে থাকেন, যার ফলে পাঠকবর্গের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাঠকদের পক্ষ থেকে উক্ত পত্রিকাটির মাধ্যমে তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর ও ব্যাখ্যা দাবি করা হয়। মাওলানা পত্রিকাটির মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন। এ প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এ প্রশ্নোত্তরগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে প্রকাশিত হতে থাকে। রাসায়েল 'রিসালাহ্' শব্দের বহুবচন যার অর্থ 'পত্রপত্রিকা' 'সাময়িকী' ইত্যাদি। 'মাসায়েল' 'মাস্য়ালা' শব্দের বহুবচন। অর্থ প্রশ্ন বা সমস্যা। মাওলানা তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকাটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার জবাব দিয়েছেন এবং এসবের জন্যে 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনাম ব্যবহার করেছেন।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। কেউ জ্ঞান লাভের জন্যে প্রশ্ন করেছেন, কেউ তাঁর প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে পত্র লিখেছেন। এসবের তিনি সুন্দর জবাব দিয়েছেন।

তাছাড়া প্রশ্নের ধরন ছিলো বিভিন্ন। কুরআন, হাদিস, তফসীর, ফিকাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি

www.icsbook.info

সম্পর্কে প্রশ্ন, সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের সাথে বহু আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও মনজয়কারী জবাব তিনি দিয়েছেন। এসব প্রশ্নোত্তর "রাসায়েল ও মাসায়েল" শিরোনামে গ্রন্থাকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানার মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ গ্রন্থের বংগানুবাদের নামকরণও আমরা করলাম 'রাসায়েল ও মাসায়েল'। গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

আমরা মনে করি আলেম সমাজ, কুরআন হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানপিপাসু, সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্যে জ্ঞান আহরণের এ এক অমূল্য গ্রন্থ। তবে জ্ঞান লাভের জন্যে সুস্থ ও নিরপেক্ষ মন মানসিকতার যে প্রয়োজন সম্মানিত পাঠকবর্গ সেই মন নিয়েই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবেন বলে আশা করি। জবাবদাতার মূল চিন্তা ও ভাবধারাকে সামনে রেখেই প্রশ্নোত্তরগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। জ্ঞানপিপাসু বাংলা ভাষীদের চির আকাঙ্ক্ষিত এ গ্রন্থখানি তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাতর প্রার্থনা, তিনি যেনো এ গ্রন্থখানি কবুল করেন এবং এতে প্রভূত বরকত দান করেন। তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আব্বাস আলী খান

চেয়ারম্যান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

www.icsbook.info

সূচিপত্র

www.icsbook.info

বিষয় | পৃষ্ঠা

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আয়াতের তফসীর এবং হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

কুরআন বিশ্লেষণের মূলনীতি

(আমেরিকার TUFTS UNIVERSITY-র জনৈক অধ্যাপক কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলো দূর করার জন্যে তিনি কতিপয় প্রশ্ন প্রেরণ করে সেগুলোর বিস্তারিত উত্তর চেয়ে আবেদন করেন। উত্তরসহ তার প্রশ্নমালা নিম্নে প্রদত্ত হলো।)

প্রশ্ন : কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে যে সমস্যা আমাকে সবচাইতে বেশি পেরেশানীতে ফেলেছে তা হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমস্যা। এ সম্পর্কে আমার মনের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে আমি নিম্নোক্ত প্রশ্নমালা একত্র করেছি। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে আমার প্রশ্নমালার লক্ষ্যবস্তু এজন্যে ঠিক করেছি যাতে কুরআন বিশ্লেষণের মূলনীতি অবগত হবার সাথে সাথে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সেসব মূলনীতির প্রয়োগ পদ্ধতিও জানতে পারি। কুরআন বলে : 'দীনের মধ্যে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই' (সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৬)। আয়াতটির উপর নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলী সৃষ্টি হয় :

১. ইরানে বাহাইদের মূলোৎপাটন এ আয়াতের বিরুদ্ধে যায়নি কি? যদি না গিয়ে থাকে তবে কেন? পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে হৈ হাঙ্গামা এ আয়াতের বিরোধিতা ছিলো না কি? এর উত্তর যদি না হয়, তবে কেন?

২. 'ইকরাহ' শব্দের অর্থ কি? এটি 'কাহ্‌র' (COERCION) শব্দ থেকে অধিক ব্যাপক নয় কি? বর্তমান যুগে কোনো রাষ্ট্রে মুসলমানরা যদি কর প্রদানে রেয়ায়েত লাভ করে কিংবা নাগরিক জীবনে অধিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তবে কি অমুসলিমদের অধিকারের ব্যাপারে এটা ইকরাহ্-র পর্যায়ে পড়ে না? এমতাবস্থায় অবশ্যি সামান্য মুনাফা করে এমন একজন অমুসলিম ব্যবসায়ী স্বীয় রুযি' রোযগারের হেফাজতের জন্যে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হতে পারে।

৩. এখানে দীন دِيْن শব্দ কি এর সাধারণ এবং ব্যাপকতর অর্থের তুলনায় সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

৪. এ আয়াতের তফসীরে জনৈক মুফাসসির বলেন : মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে তখন তাদেরকে এ মূলনীতির অনুসরণ করতে হবে যে, 'দীনের মধ্যে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।' এই মুফাস্‌সির এ আয়াতের হুকুমকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা অর্থাৎ শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্যে সীমিত করছেন কেন? আপনি কি এ ব্যাখ্যার সাথে একমত?

www.icsbook.info

৫. এর সাথে যদি আপনি একমত হন, তবে তার অর্থ কি এই যে, মুসলমানরা ততোক্ষণ পর্যন্ত জোর-জবরদস্তি করতে পারে যতোক্ষণ না তারা ক্ষমতা লাভ করবে?

৬. ইসলামী রাষ্ট্রে মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) যদি হত্যাযোগ্য হয়, তবে এটা দীনের মধ্যে জোর-জবরদস্তির প্রয়োগ নয় কি? কুরআন বলে "তিনি হলেন আল্লাহ, যিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এর কিছু আয়াত হচ্ছে মুহকাম। আর সেগুলোই হলো কিতাবের মূল বুনিয়াদ। আর অপর ধরনের আয়াত হচ্ছে মুতাশাবিহাত। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময় মুতাশাবিহাতের পিছে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭)।

৭. একথা কি সঠিক যে, 'আয়াতে মুহকামাত' বলতে বুঝায় সেসব আয়াত যেগুলোর অর্থ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এবং যেগুলোর তাবীল ও তাবীর করার প্রয়োজন পড়ে না? যদি তাই হয়, তবে কি ধরে নিতে হবে যে, সেগুলোর অর্থ সকলের নিকট পরিষ্কার এবং সকল মানুষ একই রকম চিন্তা করে এবং একই রকম জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে?

৮. لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটি কি মুহকাম আয়াতের অন্তর্ভুক্ত? আপনার উত্তর যদি 'না' হয়, তবে এমন কতিপয় আয়াত চিহ্নিত করে দিন, যেগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার অর্থ প্রকাশ করে।

৯. সূরা নিসার তৃতীয় আয়াত, যাতে স্ত্রী সংখ্যার বিধান উল্লেখ হয়েছে- মুহকাম না মুতাশাবিহ? যদি মুহকাম হয়ে থাকে তবে তার অর্থে মতপার্থক্য হয়েছে কেন এবং আয়াতটির এতো অধিক তাবীল কেন করা হয়ে থাকে? কেউ যদি মনে করে আয়াতটির অর্থ সুস্পষ্ট তবে আয়াতটির ব্যাখ্যার জন্য তার হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন আছে কি? (প্রকাশ থাকে যে, আমি নিজে স্ত্রী সংখ্যা সংক্রান্ত বিধানটির ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই। তবে আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কুরআনের তাবীল সমস্যা)।

১০. কুরআনের বিভিন্ন আয়াত যখন একই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং সেগুলোর বক্তব্য যখন পরস্পর বিরোধী পাওয়া যায়, তখন কোনো ব্যক্তি কেমন করে ফায়সালা করবে যে, কোন্ আয়াত কোন্ আয়াতকে রহিত করেছে? কোনো আয়াত পরে নাযিল হলেই কি রহিত করার জন্যে যথেষ্ট? যদি তাই হয়, তবে কুরআনকে অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সংকলন করলে ভালো হতো না?

১১. ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তির কি এ অধিকার থাকবে যে, তিনি মুহকাম আয়াতসমূহের যে অর্থ নিজে বুঝবেন, তারই অনুসরণ করবেন? তার নিজের

www.icsbook.info

তাবীরের বিপরীত কোনো তাবীরকে মানতে অস্বীকার করার অধিকার তার থাকবে কি, সে তাবীর রাষ্ট্র মনোনীত কোনো কমিশনই করুক না কেন? যদি তা না হয়, তবে সূরা আলে ইমরানের সাত নম্বর আয়াতের ফায়দা কি?

১২. বাইবেল 'নবীগণের কর্ম' দশম অধ্যায়ে লেখা আছে যে, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু হালাল। অথচ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং কুরআন এই উভয় গ্রন্থই কোনো কোনো জন্তুকে হারাম ঘোষণা করেছে। এসবগুলো গ্রন্থই যদি অহির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়ে থাকে, তবে এগুলোর মধ্যে এই যে বিরোধ রয়েছে, মুসলমানগণ সেটার পিছনে কি কারণ আছে বলে মনে করে? (উল্লেখ্য, কোনো বিশেষ ধরনের গোশ্‌ত খাওয়া বা না খাওয়ার বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। বরঞ্চ আমি সেই বিরোধের সমাধান করতে চাই, যা আসমানী কিতাবসমূহে বর্তমান রয়েছে বা আমি অনুভব করি)।

১৩. প্রচার করার জন্য কেবলমাত্র ইসলামকেই সঠিক বলে কেমন করে মানা যায়? অথচ কুরআন বলে বিভিন্ন উম্মতের জন্য আল্লাহ বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই পন্থা-পদ্ধতিগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

১৪. প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞানের অগ্রযাত্রা (পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি) মানুষকে অধিকতর ভালোভাবে কুরআন বুঝার যোগ্য বানিয়ে দিচ্ছে না?

১৫. কুরআন কোথাও কোথাও ইয়াহূদী ও ঈসায়ীদের গ্রন্থগুলোকে ঐশী গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু বহু বাইবেল বিশেষজ্ঞ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এসব গ্রন্থ ঐতিহাসিক দস্তাবেজ ছাড়া আর কিছু নয়। এর কোনো কোনোটা একাধিক ব্যক্তিও রচনা করেছেন এবং গ্রন্থগুলো ঐহিক হবার ব্যাপারে সেগুলোর মধ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ খুব কমই রয়েছে। তবে এ গ্রন্থগুলো সম্পর্কে কুরআন 'অহি' এবং 'ইলহাম' শব্দ কোন্ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে? এই বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মতামত কি ভ্রান্ত? নাকি আমরা ধরে নেবো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে ইয়াহূদী এবং খৃষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে কোনো বিকৃতি এসেছে?

উত্তর : কুরআন তা'বীলের সঠিক পন্থা

সর্বপ্রথম কুরআন ব্যাখ্যার সঠিক নিয়ম পন্থা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া একান্ত জরুরি।

আপনি যে আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে চান, সর্বপ্রথম আরবি ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী বাক্যটির গঠন প্রণালী লক্ষ্য করুন। অতপর পূর্বাপর (CONTEXT) বক্তব্যের সাথে

www.icsbook.info

বাক্যটির বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান করুন। এরপর একই বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করুন। দেখুন, আলোচ্য আয়াতটির সম্ভাব্য ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যা এসব আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর কোন্ ব্যাখ্যা সেগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যশীল। (উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তির কোনো কথার যদি দুই বা ততোধিক ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যাখ্যাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে যা একই বিষয়বস্তু সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল)। কুরআনের মর্ম স্বয়ং কুরআন থেকে বুঝার ব্যাপারে এ পরিমাণ প্রচেষ্টা চালানোর পর আপনাকে এটাও দেখতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে যিনি এই কুরআনকে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের কি মর্ম উদ্ভাসিত হয়েছে? তাছাড়া সমকালীন যাঁরা তাঁকে নিকট থেকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁরাই বা আয়াতটির কি তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন?

'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' আয়াতের অর্থ

এই নীতিগত বিশ্লেষণের পর এখন আমি সেই আয়াতটির প্রতিই প্রত্যাবর্তন করছি, যেটিকে আপনি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতে বলা হয়েছে : "দীনে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।" আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী 'দীন' শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত: 'দীন কবুল করা বা অবলম্বন করার ব্যাপারে।' দ্বিতীয়ত: 'দীনের বিধান ও ব্যবস্থায়।' এ দু'টি ব্যাখ্যার কোন্টি অধিকতর গ্রহণযোগ্য? শুধু এই আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা এ ফায়সালা করা যেতে পারে না। এর জন্য পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

যে প্রেক্ষাপটে আয়াতটি এসেছে তা এই যে, প্রথমত আল্লাহ তায়ালার একত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর এক সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করা হয়েছে। এ ধারণা বিভিন্ন প্রকার শিরকে নিমজ্জিত বর্তমান যুগের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আল্লাহ সংক্রান্ত ধারণা থেকে ভিন্নতর। আর এটাই হচ্ছে ইলাহ্ সম্পর্কে এই দীনের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস। এই ইলাহ্র প্রতি কুরআন মানুষকে আহ্বান করছে। অতপর বলা হয়েছে, 'দীনে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই', সত্য-সঠিক পথ গোমরাহী থেকে পৃথক ও আলাদা হয়ে গেছে। এখন থেকে যে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক রজ্জু ধারণ করলো, যা কখনো ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। যারা ঈমান আনলো, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবলম্বন করলো কুফরী, তাদের

www.icsbook.info

পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে টেনে এনে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।" ...আলোচনার এই ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত বাক্যাংশটির অর্থ পরিষ্কারভাবে এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ সংক্রান্ত উপরোল্লেখিত আকীদা-বিশ্বাস জোর-জবরদস্তি করে কাউকেও স্বীকার করিয়ে নেয়া হবেনা। ভ্রান্ত আকীদার মোকাবিলায় সঠিক সত্য আকীদা-বিশ্বাস পরিষ্কার ও স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। এখন থেকে ভ্রান্ত আকীদা পরিত্যাগ করে আল্লাহকে সেভাবে স্বীকার করে নেবে যেভাবে এখানে উল্লেখ করা হলো, সে নিজেই তাতে উপকৃত হবে। আর যে তা অস্বীকার করবে, তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতপর আপনি গোটা কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখতে পাবেন, বিভিন্ন প্রকার অপরাধের জন্য বহু শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। বহু নৈতিক দোষত্রুটিকে বশীভূত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনেক জিনিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বহু জিনিসকে ফরয ও অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেনো রসূল এবং কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করে। এ সকল বিধানকে কার্যকর করার জন্যে কোনো না কোনো প্রকার coercive Power-এর প্রয়োগ অনস্বীকার্য। চাই সেটা রাষ্ট্রীয় শক্তি হোক কিংবা সমাজের নৈতিক প্রভাবের শক্তি। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, "দীনে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই" বলা দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় শক্তি ও বল প্রয়োগের কোনো অবকাশই নেই। বরঞ্চ একথার অর্থ কেবল এতোটুকুই যে, দীন ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। যার ইচ্ছা সে তার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে তা গ্রহণ করতে পারে আর যে গ্রহণ না করবে, ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে বল প্রয়োগ করে তাকে বাধ্য করা হবে না।

এ বিষয়ে অধিক আলোকপাত হয়েছে নবী পাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর সাহাবায়ে কেরামের কর্মনীতিতে। কোনো অমুসলিমকে ঈমান আনার জন্যে তাঁরা কখনো বাধ্য করেননি। কিন্তু যারা ইসলাম কবুল করে মুসলিম সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল ইসলামের বিধান পালন করার ব্যাপারে তাদেরকে তারা বাধ্য করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে কেবল নৈতিক ও সামাজিক চাপই প্রয়োগ করা হয়নি, বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় শক্তিও প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের যুগে ব্যাপক হারে অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা ছিলো। তাদেরকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, পূজা-উপাসনা এবং ধর্মীয় রসম-রেওয়াজ পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল এবং তাদের ধর্মীয় আইন

www.icsbook.info

(PERSONAL LAW) বহাল রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের public law তাদের উপরও তেমনি প্রয়োগ করা হয়েছিল, যেমনি প্রয়োগ করা হয়েছিল মুসলমানদের উপর।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমি আয়াতটির মূল তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমি আপনার ১-৬ নম্বর প্রশ্নের পৃথক পৃথক উত্তর দিচ্ছি।

কাদিয়ানীদের বিষয়

১. ইরানে বাহাইদের সাথে কি আচরণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে আমার নিকট পুরো তথ্য নেই। তাই এ বিষয়ে আমি মতামত প্রকাশ করতে পারছিনা। কিন্তু পাকিস্তানের কাদিয়ানীদের সম্পর্কে আপনার উত্থাপিত প্রশ্নের ভিত্তি নিতান্তই ভুল বুঝাবুঝির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। এখানে কাদিয়ানীদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে কোনো দাবি কেউ উত্থাপন করেনি। এরূপ দাবিও কেউ করেনি যে, তাদের ধ্বংস করে দেয়া হোক, কিংবা কাদিয়ানী মতবাদ ত্যাগের জন্য তাদের বাধ্য করা হোক অথবা তাদেরকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক। তাদের ব্যাপারে দাবি তো কেবল এতোটুকুই ছিলো এবং আছে যে, তারা মৌলিক আকীদা বিশ্বাস, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার দিক থেকে যখন মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তখন এই স্বাতন্ত্র্যকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেয়া হোক এবং কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া তাদেরকে মুসলিম সমাজের একটি অংশ বলে আখ্যায়িত না করা হোক। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এ দাবি কোন্ যুক্তিতে কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে? দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি না থাকার অর্থ কি এই যে, যাদেরকে সকল মুসলমান দীন থেকে বহির্ভূত বলে মনে করে এবং যারা নিজেরাই সকল মুসলমানকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে, বাস্তবেই মুসলিম সমাজ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করার জন্য মুসলমানদেরকে বাধ্য করতে হবে?

বাকি থাকলো '৫৩ সালের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা। এ দাঙ্গা-হাঙ্গামা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ছিলো- একথা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাকে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামার (Anti Qadiani Disterbances) নামে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নামকরণ করা হয়েছে। ফলে আসল ঘটনা সম্পর্কে অনবহিত লোকদের মধ্যে খামোখা একটি ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এখানকার সাধারণ মুসলমানরা বুঝি কাদিয়ানীদেরকে নিধন করার জন্য মেতে উঠেছে।

www.icsbook.info

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয় জনগণ ও সরকারের মধ্যে। এর কারণ ছিলো, একদিকে জনগণ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে তাদের উপরোক্ত দাবি আদায়ের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করছিল আর অপরদিকে শক্তিবলে সরকার তাদের এই এজিটেশনকে দাবিয়ে দিতে চাইছিল। সুতরাং সংঘর্ষ মূলত সরকার ও জনগণের মধ্যে সংঘটিত হয়, জনগণ এবং কাদিয়ানীদের মধ্যে নয়। কাদিয়ানীদের জান-মালের উপর জনগণ কেবল তখনই আক্রমণ চালায়, যখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলাকালে পুলিশ এবং ফৌজের উর্দি পরে কোনো কোনো কাদিয়ানী মুসলমানদের হত্যা করছিল। (এ দৃঢ় বিশ্বাসের পক্ষে অনেকগুলো বলিষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে। দ্রষ্টব্য আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, পৃ: ১৫৬)।

মুসলমানদের বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন

২. ইসলামী আইনে কর আরোপের ব্যাপারে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সন্দেহ নেই, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান ব্যবসায়ীদের তুলনায় অমুসলিম বণিকদের থেকে অধিক হারে বাণিজ্য শুল্ক আদায় করা হতো। কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র কোনো শরয়ী বিধানের ভিত্তিতে করা হতো না এবং অমুসলিম বণিকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার জন্যও হতোনা। বরঞ্চ সেটা ছিলো একটা পদক্ষেপ মাত্র। আর মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিলো সে পদক্ষেপের উদ্দেশ্য। কারণ, তখন অধিকাংশ মুসলমানই সামরিক এবং সিভিল সার্ভিসে জড়িয়ে পড়েছিলো। আর নব অধিকৃত দেশগুলোর গোটা অর্থনৈতিক জীবনই (যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, চাষবাস ইত্যাদি) অমুসলিমদের হাতে চলে যায়। এখানে যদি আপনি প্রশ্ন তোলেন যে, মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই সুবিধার ফলশ্রুতিতে স্বল্প মুনাফার ব্যবসায়ীরা (Marginal Businessman) নিজেদের জীবিকার পথ টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমান হয়ে যেতে বাধ্য হতে পারতো- তাহলে বলবো, আপনার এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা মুসলমান হবার সাথে সাথেই তার উপর যাকাত নির্ধারিত হতো। আর যাকাতের পরিমাণ তো জিযিয়া কর এবং বাণিজ্য করের মিলিত পরিমাণের চাইতেও অধিক ছিলো। তার উপর যাকাত ধার্য হতো প্রতি বছর তার সমগ্র ব্যবসায়িক পুঁজি, ঘরের অলংকার এবং সঞ্চিত অর্থের উপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে। পক্ষান্তরে বিরাট বিরাট সম্পদশালী অমুসলিমকেও ৪৮ দিরহাম (প্রায় তিন ডলার)-এর চাইতে অধিক বার্ষিক কর প্রদান করতে হতোনা। আর বাণিজ্য করের ক্ষেত্রে তাকে মুসলমানের তুলনায় খুব বেশি হলে ৫০% বেশি দিতে হতো।

www.icsbook.info

৩. প্রাথমিক ব্যাখ্যায় এ প্রশ্নের উত্তর এসে গেছে।

ক্ষমতা ও বল প্রয়োগ

৪-৫. আপনি যে মুফাস্সিরের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য এরকম বলে মনে হয়না যে, মুসলমানরা যতোক্ষণ ক্ষমতাসীন হবেনা ততোক্ষণ তারা মানুষকে জোর-জবরদস্তি করে নিজেদের দীনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করতে পারে। অবশ্য ক্ষমতা লাভের পর বল প্রয়োগ ত্যাগ করবে। বরঞ্চ তিনি আয়াতটির এ তফসীর সম্ভবত এজন্যই করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অপর কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বল প্রয়োগের প্রশ্ন তো কেবল তখনই আসে, যখন কোনো না কোনো প্রকারে তারা বল প্রয়োগের জন্য শক্তি এবং ক্ষমতা লাভ করে। অন্যথায় কোনো ক্ষমতাহীন ব্যক্তিকে একথা বলা তো নিতান্তই অর্থহীন যে, তুমি বল প্রয়োগ করোনা। ক্ষমা করবেন, আপনি উক্ত মুফাস্সিরের বক্তব্যের যে উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছেন তা যৌক্তিকতার দিক থেকেও সঠিক নয়।

মুরতাদের শাস্তি

৬. মুরতাদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান বাহ্যত উক্ত আয়াতের বিপরীত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আয়াতটির বিপরীত নয়। আয়াতটির বক্তব্য শুধুমাত্র ঐসব লোকদেরই সাথে সম্পর্কিত যারা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাদের সম্পর্কে এ ফায়সালা দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাদের উপর বল প্রয়োগ করা যাবেনা। পক্ষান্তরে মুরতাদ সংক্রান্ত ইসলামী বিধান হচ্ছে ঐসব লোকদের সম্পর্কে যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করতে চায়। তাদের উপর বল প্রয়োগের আসল উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাদেরকে ইসলামের আওতায় ধরে রাখা হবে। বরঞ্চ ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ইসলামী সমাজকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। ইসলামী আইন যেমনি একজন মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের অনুমতি দেয়না, তেমনি কোনো অমুসলিম যিম্মিকেও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের আনুগত্য অস্বীকারের অনুমতি দেয়না। আর আমি যতোদূর জানি কোনো রাষ্ট্রই তার শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়াকে বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকেনা। এক্ষেত্রে সকলেই "প্রবেশ করেনি" এবং "প্রবেশ করে বের হতে চায়" এমন লোকদের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে এবং এতদুভয়ে একই ধরনের আচরণ করেনা। মার্কিন নাগরিকত্ব কিংবা বৃটিশ জাতীয়তাবাদ যে গ্রহণ করেনি এবং যে গ্রহণ করে পরিত্যাগ করেছে- এ উভয়ের পজিশন কি এক হয়ে থাকে? আমেরিকান জোটভুক্ত না হওয়া এবং হয়ে বেরিয়ে যাওয়া এ দু'ধরনের রাষ্ট্রের সঙ্গে কি আপনারা একই ধরনের আচরণ করেন?

www.icsbook.info

মুহকাম ও মুতাশাবেহর অর্থ

এবার দ্বিতীয় আয়াতটির আলোচনায় আসা যাক, যা আপনি সূরা আলে-ইমরান থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আয়াতটি সম্পর্কে আপনি যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেগুলোর উত্তর অন্বেষণের পূর্বে 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবেহ্' আয়াতের তাৎপর্য এবং দু'ধরনের আয়াতের মধ্যকার পার্থক্য ভালভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। মুতাশাবেহ আয়াতসমূহ হচ্ছে সেসব আয়াত যেগুলোতে মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি বহির্ভূত তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। সেসব তত্ত্ব যেহেতু মানুষের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত, সে কারণে মানবীয় ভাষায় সেগুলোকে বুঝানোর জন্য কোনো শব্দ বা বাক্য বর্তমান নেই। তাই সেসব তত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য ঐসব শব্দ এবং বাক্যই ব্যবহার করা হয়েছে যা মানুষ কোনো কিছুকে বুঝার জন্য ব্যবহার করে থাকে। যেমন- আল্লাহ তায়ালার জীবন, দৃষ্টি, শ্রবণ, কথা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিংবা যেমন ব্যবহার করা হয়েছে- আল্লাহর আরশ, কুরসী। অথবা যেমন বলা হয়েছে- আল্লাহ আকাশে রয়েছেন, তিনি ভালবাসেন, রাগান্বিত হন। এ ধরনের শব্দ ও বর্ণনারীতি প্রকৃত সত্যের একটা মৌলিক ধারণা প্রদান করে বটে এবং এতোটুকু ধারণা লাভ করা এবং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত সেসব তত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকৃতি (Nature) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

এ কারণেই যারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব শব্দের বিশ্লেষণের (তা'বীল) চেষ্টা করেন, তারা ভ্রান্ত মানসিকতার শিকার হন। কেননা এসব শব্দ ও বাক্যের ধরনই এমন নয় যে, মানুষ সেগুলোর অর্থ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে, কিংবা এমন কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হবে, যদ্বারা সেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যাবে।

পক্ষান্তরে 'মুহকাম আয়াত' হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো মানুষ এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্বাবলী এবং মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে আসার মতো যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অথবা মানুষকে সেসব বিধি-বিধান ও পথ-নির্দেশনা দান করে, যেগুলো মেনে নেয়া মানুষের কর্তব্য। আর এসব আয়াতে যেহেতু সেই সকল শব্দ এবং বাক্যই ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো উক্ত বিষয়সমূহের জন্য মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাষায় তৈরি করে নিয়েছে- এজন্যই মানুষ এগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। সেগুলোর অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করা সম্ভব এবং বৈধ। বরঞ্চ তা করা শরিয়তেরও উদ্দেশ্য। কেননা কুরআনের দাবি ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি এবং তার থেকে পথ-নির্দেশনা লাভের জন্য একাজ করা জরুরি। অবশ্য এজন্য শর্ত হচ্ছে এই যে; এ প্রচেষ্টা নেক নিয়্যতে চালাতে হবে। পথনির্দেশ লাভের জন্য চালাতে হবে এবং সেসব যুক্তিসংগত পন্থায় চালাতে হবে, যেসব পন্থা

www.icsbook.info

দুনিয়ার লোকেরা কোনো কথার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার জন্য ব্যবহার করে থাকে (নিজস্ব খেয়ালখুশী ও মতবাদের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর জন্য নয়)।

এ বিশ্লেষণের পর এখন আমি আপনার অবশিষ্ট প্রশ্নাবলীর ধারাবাহিক উত্তর দিচ্ছি:

৭. উপরের বিশ্লেষণের পর এ প্রশ্নের জবাবের প্রয়োজনীয়তা আর বাকি থাকে না। 'মুহকাম আয়াত'-এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, 'সেগুলো ঐসব আয়াত যেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই।' বরঞ্চ কুরআন মজীদ মুতাশাবেহাত আয়াতের তা'বীল করতে নিষেধ করে মুহকাম আয়াতসমূহের প্রতি মানুষের দৃষ্টি এজন্যই ফিরিয়ে দেয়, যেহেতু এগুলোই চিন্তা-গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তা'বীল তাবীরের প্রচেষ্টা চালানোর সঠিক লক্ষ্যস্থল, মুতাশাবেহ আয়াতসমূহ নয়।

৮. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ নি:সন্দেহে মুহকাম আয়াত। কেননা 'দীন', دِيْن 'ইকরাহ' إِكْرَاه এবং "দীনের মধ্যে ইকরাহ না হওয়া" এগুলো সবই এমন শব্দ ও বাক্য যেগুলোর অর্থ আমরা অভিধান, ব্যাকরণ, পূর্বাপর আলোচনা, কুরআনের অন্যান্য বর্ণনা এবং সুন্নাত, ইজমা ও কিয়াসের সাহায্যে নির্ণয় করতে সক্ষম। এমনি করে কুরআনের ঐ সকল আয়াতই মুহকাম আয়াত যেগুলো দ্বারা মানুষের নিকট কোনো কিছুকে স্বীকার করা, কিংবা কোনো কিছুকে অস্বীকার করা অথবা কোনো কিছুর উপর আমল করার কিংবা কোনো কিছু পরিত্যাগ করার দাবি করা হয়েছে। ঐসকল আয়াতও মুহকাম আয়াত যেগুলোতে অনুভব করা যায় এবং প্রত্যক্ষ করা যায় এমন জিনিসের আলোচনা করা হয়েছে কিংবা সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যা মানুষের অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত।

বহু বিবাহ প্রসঙ্গ

৯. উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একথা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, সূরা নিসার ৩ নম্বর আয়াত মুতাশাবেহ নয়, বরঞ্চ মুহকাম আয়াত। আপনি প্রশ্ন করেছেন : আয়াতটি যদি মুহকাম হয় তবে এর ব্যাখ্যায় এতো মতপার্থক্য কেন দেখা যায়?" আপনার এ প্রশ্ন অনেকগুলো ভ্রান্ত ধারণার পরিণাম। আপনার প্রথম ভুল ধারণা এই যে : "মুহকাম আয়াতসমূহে মতপার্থক্য থাকা উচিত নয়।" আর এই ভুল ধারণা আপনার মধ্যে এজন্য সৃষ্টি হয়েছে যে, আপনি মনে করেন মুহকাম আয়াত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষীই নয়। আপনার দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে এই যে, এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় অনেক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং সে মতবিরোধের ব্যাপকতা বড় ধরনের। অথচ ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে বিগত বারশত বছর থেকে আয়াতটির একটি সর্বসম্মত অর্থই রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, একজন পুরুষকে আয়াতটি একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান

www.icsbook.info

করেছে। আর সে আধিক্যের সীমা একত্রে চারজন পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এজন্য সমতা রক্ষা করার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর এ সমতা রক্ষার عدل অর্থ আচরণ এবং অধিকারের সমতা রক্ষা করা, ভালবাসা ও প্রাণাকর্ষণের সমতা নয়।

এখন আসুন সেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কথায়, যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে কোনো কোনো মুসলমান করতে শুরু করেছে। আর এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই আপনার নিকট আয়াতটির ব্যাখ্যায় ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমার পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে এগুলো আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়, বরঞ্চ এগুলো হচ্ছে কুরআনের মনগড়া ও বিকৃত অর্থ, কুরআনের বৈধ তফসীরের সীমায় যেগুলোকে স্থান দেয়া যেতে পারেনা। বস্তুতঃ ঐসব লোকেরাই এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে যারা আপনাদের নিকট থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করে, কুরআন থেকে নয়। অতপর তারা কুরআনকে বাধ্য করে সে কথা সঠিক বলাতে যেটাকে আপনারা সঠিক বলেন। আমার মতে এভাবে কোনো জিনিসের মনগড়া অর্থ করার চেষ্টা করা মুনাফিকী এবং বেঈমানী। (বিশ্বাস করুন) আমি যদি এ বিষয়ে বা অন্য যে কোনো বিষয়ে ঈমানদারির সাথে বুঝতাম যে, সে বিষয়ে কুরআনের দৃষ্টিকোণ ভ্রান্ত এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক, তাহলে আমি পরিষ্কার ভাষায় কুরআন অস্বীকার করে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা করে দিতাম এবং আমি মুসলমান নই- একথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতামনা। প্রত্যেক সত্যপন্থী নিষ্ঠাবান ব্যক্তির নীতি এরকমই হওয়া উচিত। দু:খের বিষয় আপনারা আমাদের মধ্যকার মুনাফিকদের সাহস যোগাচ্ছেন। কারণ যিন্দেগীর বিভিন্ন বিষয়ে তারা আপনাদের অনুসারী। তাদের "অন্ধ অনুকরণ" আপনাদের নিকট ভালো লাগে আর "মুনাফিকীটা" খারাপ লাগেনা।

কুরআন ব্যাখ্যায় হাদিসের গুরুত্ব

আপনি এ প্রশ্নটির ভিতরেই আরেকটি প্রশ্ন ঢুকে দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি যদি কোনো আয়াতের তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে, তারপরও কি তার জন্য হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি? আমি বলছি, কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বরচিত মনে করে কিংবা আল্লাহর কিতাবই মনে করে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে তাঁর রসূল মনে করে- উভয় অবস্থাতেই তার এ দাবি করা ভুল হবে যে, কুরআন বুঝবার জন্যে তার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক এবং বাস্তব

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা থেকে সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। সে যদি এটাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বরচিত গ্রন্থ মনে করে তবে তাকে স্বীকার করতেই হবে রচয়িতা গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন- তাই সে গ্রন্থের মূল বক্তব্য। আর যদি সে এটাকে আল্লাহর কালাম বলেই স্বীকার করে এবং একথাও স্বীকার করে যে, আল্লাহ এ গ্রন্থের শিক্ষাদানের জন্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন সে অবস্থায়ও তাকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহর কালামের যে অর্থ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছিলেন, তা-ই নির্ভুল ও যথার্থ। অবশ্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে প্রচারিত কোনো হাদিস সম্পর্কে একথা বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা যে, হাদিসটি সত্যিই সঠিক কিনা এবং তা সঠিক হওয়া বা না হওয়ার দলিল প্রমাণ কি? কিন্তু কুরআন বুঝার জন্য যে আমরা হাদিসের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারিনা- সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায়না।

কুরআন অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ নিষ্প্রয়োজন

১০. কুরআনে কোনো একটি বিষয়ে যদি দু'ধরনের নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহলে শেষের নির্দেশকে প্রথম নির্দেশের রহিতকারী ধরে নিতে হবে। কিন্তু এজন্য গোটা কুরআনকে অবতীর্ণের সন তারিখের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী গ্রন্থাবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সংকলনেই আমরা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা জানতে সক্ষম যে, কোন্ নির্দেশ প্রথমে নাযিল হয়েছিল আর কোন্ নির্দেশ পরে।

ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার অধিকার

১১. কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআনের জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই কুরআনের তা'বীল করা বৈধ হতে পারে। কিন্তু তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা (তা'বীল) সকল মুসলমানের জন্য আইন হতে পারেনা। কেবল ঐসব তাবীলই আইনে পরিণত হতে পারে, যেগুলোর উপর দীনের বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত কিংবা অধিকাংশের মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা কোনো বৈধ আদালত যেগুলোকে আইন হবার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তাবীল করার অধিকার নি:সন্দেহে সকল কুরআন বিশেষজ্ঞের রয়েছে। কিন্তু সামষ্টিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত তাবীলের অধিকার কিভাবে দেয়া যেতে পারে?

কুরআন কোন্ ইনজীলের সত্যতা স্বীকার করে?

১২. 'নিউ টেস্টামেন্ট' তো ঐশী গ্রন্থ হওয়া দূরের কথা চার ইনজীল (GOSPELS) ও ঐশী কিতাব নয়। এসব গ্রন্থের সত্যতা কুরআন স্বীকার করেনা। কুরআন অবশ্যি ঐ ইনজীলের সত্যতা স্বীকার করে যা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের

www.icsbook.info

প্রতি নাযিল হয়েছিল। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, সে ইনজীল কোথায়? এর জবাবে আমি বলবো : সেই ইনজীলের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে নিউ টেস্টামেন্টের চারটি ইনজীলের রচয়িতাদের নিকট পৌঁছে এবং তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অবস্থা বর্ণনা করার সময় নিজ নিজ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে সেগুলো গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। এসব গ্রন্থে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব বক্তৃতা ও বাণী পাওয়া যায় সেগুলো সেই আসল ইনজীলেরই বিভিন্ন অংশ। এসব অংশে কুরআনের বিপরীত কোনো কথা দেখবেন দুষ্প্রাপ্য।

ইসলাম প্রচারের বৈধতার কারণ

১৩. আপনি যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, তা কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াত তা লেখেননি। কিন্তু সেটি যদি সূরা হজ্জের সাতষট্টি নম্বর আয়াত হয়ে থাকে তবে সেটির অর্থ তা নয় যা আপনি বুঝেছেন। বরঞ্চ তার অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যে আল্লাহ একটি পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং সে যুগের জন্যে সে পন্থা বৈধ ছিলো। একইভাবে একালে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে একটি পন্থা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এখন এটাই বৈধ (Valid) পন্থা। এটা একথারই বৈধতার প্রমাণ যে, আহলে কিতাবসহ সকল অমুসলিমকে মুসলমানরা ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাবে।

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জানার গুরুত্ব

১৪. এতে সন্দেহ নেই, বিশ্বজগত এবং নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতোটা বৃদ্ধি পাবে, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে ততোবেশি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের চাইতেও অধিক কুরআন বুঝতে থাকবে। এর অর্থ এটাও হতে পারেনা যে, যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী, তাকে অবশ্যি কুরআনের উত্তম সমঝদার বলে আখ্যায়িত করতে হবে। কোনো ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, তাকে এ কুরআন আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করতে হবে। এটাকে হেদায়াতের উৎস বলে স্বীকার করে নিতে হবে। সেসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে, যেগুলো কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে জরুরি। তাছাড়া নিজের যথেষ্ট সময় তাকে কুরআন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার কাজে ব্যয় করতে হবে। এসব সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি এ দাবি করতে পারেনা যে, সে ঐ পয়গম্বরের চাইতে অধিক কুরআনের

www.icsbook.info

সমঝদার, যাকে স্বয়ং আল্লাহ স্বীয় কিতাবের শিক্ষক নিয়োগ করেছেন (কিংবা আপনাদের নিকট যিনি নিজেই ঐ কিতাবের রচয়িতা)।

কুরআন কোন্ কোন্ ঐশী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে

১৫. কুরআন মজীদ যেসব কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে সেগুলো Old Testament এবং New Testament নয়। বরঞ্চ সেগুলো হচ্ছে- তাওরাত, যাবূর এবং ইনজীল। ইয়াহূদীরা তাওরাতকে স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। তারা তাওরাতের বিভিন্ন অংশকে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত (Incorporate) করে ফেলেছে। এসব অধ্যায় থেকে আপনি সেই মূল তাওরাতের বিভিন্ন অংশ এরূপ নিদর্শনের সাহায্যে খুঁজে বের করতে পারেন যে, যেসব স্থানে কোনো বাক্য শুরু হয়েছে এভাবে :

"আল্লাহ মূসাকে বলেছেন" কিংবা
"আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছেন" কিংবা
"মূসা বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এ বক্তৃতা করেন"।

এসব স্থানে খুব সম্ভব মূল তাওরাতের কোনো অংশ চয়ন করা হয়েছে।

ইনজীলেরও একই দশা। মসীহ আলাইহিস সালামের অনুসারীরা ওটাকে একটা স্বতন্ত্র কিতাবের মর্যাদায় অক্ষুণ্ন রাখেনি। বরঞ্চ তাঁর জীবনী লেখকরা (মথি, মারকস, লূক, যোহন প্রভৃতি) স্ব স্ব গ্রন্থে মূল ইনজীলের মৌখিক বর্ণনা সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশ সন্নিবেশ করে নিয়েছেন। সেগুলোও এরূপ নিদর্শনের মাধ্যমে খুঁজে বের করা যেতে পারে যে : "মসীহ বলেছেন"। "মসীহ এই উদাহরণ দিয়েছেন।" কিংবা "জনগণকে সম্বোধন করে মসীহ এই নসীহত করেছেন।" আমি যা বললাম- এসবের ভিত্তিতে আপনি ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টে তাওরাত, যাবূর এবং ইনজীলের সেসব অংশ পৃথক করে নিন এবং কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন, সেগুলোর শিক্ষা এবং কুরআনের শিক্ষার মধ্যে কদাচিতই কোনো পার্থক্য রয়েছে। যদিও সামান্য কিছু পার্থক্য থেকে থাকে, তারও যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। আর তা হচ্ছে, কুরআন তার শব্দে শব্দে এবং বাক্যে বাক্যে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদায় বর্তমান রয়েছে। আর উক্ত তিনটি গ্রন্থই না সেগুলোর মূল শব্দ ও বাক্যসহ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে[১] আর না

১. মূল শব্দ ও বাক্যসহ যে গ্রন্থগুলো সংরক্ষিত নেই- একথায় যদি কারো সন্দেহ হয় তবে সে, উদাহরণস্বরূপ মথি এবং লূকের ইনজীল বের করে পাহাড়ী নসিহতের বাক্যগুলো দেখে নিক। উভয় বর্ণনায় এতো বেশি পার্থক্য রয়েছে যে, এগুলোকে অহির মূল বাক্য মনে করা সহজ ব্যাপার নয়। - লেখক

www.icsbook.info

সেগুলোকে স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদায় থাকতে দেয়া হয়েছে। আমার পক্ষে একথা বলা মুশকিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এ তিনটি গ্রন্থ স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদায় বর্তমান ছিলো কিনা? তবে অন্তত তাওরাত সম্পর্কে স্বয়ং ওল্ড টেস্টামেন্ট এর বর্ণনা দ্বারা[১] এবং আমাদের হাদিস থেকে একথা জানা যায় যে, এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদায় দীর্ঘদিন ইয়াহুদীদের নিকট বর্তমান ছিলো। এমনকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়ও মদিনার ইয়াহুদীর নিকট এর একটি কপি বর্তমান ছিলো। (তরজমানুল কুরআন : সফর : ১৩৭৫ হি: অক্টোবর : ১৯৫৫ ঈ :)

যেসব জাতির মধ্যে নবীর আগমন ঘটেনি তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে?

প্রশ্ন : কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করার সময় মনে এমন কিছু কঠিন সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়, যা মনকে যথেষ্ট পেরেশানীতে ফেলে দেয়। একদিকে ঈমানী ত্রুটির আশংকা জাগ্রত হয়। মনে হয় না জানি আয়াতে কুরআনের ত্রুটি ধরা এবং অভিযোগ সৃষ্টি হবার কারণে ঈমানে গোলমাল ও বিশৃংখলা উদ্ভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝে না আসার কারণে সন্দেহ সংশয় আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ আয়াতগুলোর তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য আমি মনোযোগের সাথে উর্দু ও আরবি তফসীরসমূহ অধ্যয়ন করছি। কিন্তু মন আশ্বস্ত হয়না। পেরেশানী দূর হয়না। অতপর আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। আপনার নিকট থেকে সঠিক তাৎপর্য জানতে চাই। কিন্তু আপনি দুয়েক কথায় উত্তর দিয়ে দেন। অবশ্য অনেক সময় আপনার সংক্ষিপ্ত উত্তর সন্তোষজনক হয়। নিয়ম মাফিক আজ সকালে আমি তফসীর অধ্যয়ন করছিলাম। অধ্যয়ন করছিলাম সূরা ইয়াসীন থেকে। নিম্নোক্ত আয়াতে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম :

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ.

(যাতে তুমি এমন এক কওমকে ভয় প্রদর্শন করতে পারো, যাদের পূর্ব পুরুষদের ভয় প্রদর্শন করা হয়নি। তাই তারা গাফলতে নিমজ্জিত)। এর ব্যাখ্যায় তফসীরে নিম্নোক্ত বাক্যটি লেখা রয়েছে :

لِاَنَّ قُرَيْشًا لَمْ يَاْتِهِمْ نبى قبل محمد صلى الله عليه وسلم

(কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কুরাইশদের মধ্যে কোনো নবীর আগমন ঘটেনি)। এখন আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে- যেহেতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

১. উদাহরণস্বরূপ দেখুন : রাজাবলী-২, ২২-২৩ অধ্যায়।

www.icsbook.info

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে আরব দেশে কোনো নবী পাঠানো হয়নি তাহলে ঐ লোকগুলো কি জান্নাতবাসী হবে নাকি জাহান্নামবাসী? আর নাকি তারা আ'রাফে অবস্থান করবে? একই বক্তব্য সম্বলিত আরো কয়েকটি আয়াত কুরআন মজীদে বর্তমান রয়েছে। এখন বিবেকের দাবি তো হচ্ছে এই যে, যেসব জাতির নিকট দীনের দাওয়াত পৌছেনি, সত্যের সাক্ষ্য যারা লাভ করেনি- তারা এর দায়িত্ব থেকে মুক্ত। অবশ্য তাদের কথা আলাদা ইসলামের পয়গম্বরের দাওয়াত যাদের কাছে পৌছেছে, অথচ তারা ঈমান আনা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে- তারা অবশ্যি শাস্তিযোগ্য।

অপর একটি আয়াত এ বক্তব্যকেই মজবুত করছে। আয়াতটি হচ্ছে :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا۔

(আমরা কোনো জাতিকে শাস্তি দেইনা, যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি)।

আমার নিকট আরেকটি জটিল বিষয়ও রয়েছে, আশা করি সেটারও সমাধান বলে দেবেন। তা হচ্ছে : দিল (অন্তর) এবং আকল (বিবেক) কি একই জিনিস নাকি এগুলোর অস্তিত্ব আলাদা আলাদা?

উত্তর : কুরআন মজীদ থেকে যে মূলনীতি জানা যায় তা হচ্ছে এই আল্লাহ তায়ালা কেবল ঐ ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীকেই পাকড়াও করবেন, যাদের নিকট সত্যের দাওয়াত পৌছেছে। এখন কথা হচ্ছে, দাওয়াত কার নিকট পৌছেছে আর কার নিকট পৌছেনি, কে এ সত্যের দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত ছিলো আর কে ছিলোনা সে বিষয়ে কেবল আল্লাহই অবগত রয়েছেন এবং ফায়সালাও তিনিই করবেন। এ প্রশ্নের সাথে তো আমাদের সম্পর্ক নেই। তবে এ বিষয়ের ফায়সালার জন্যে আমাদের এতো মাথা ঘামানি কেন? এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেন না যে, কার নিকট কখন কোথায় এবং কি পন্থায় দাওয়াত পৌছেছে? সে যদি এ দাওয়াতকে কবুল না করে থাকে তবে কেনো করেনি? আর ঐ ব্যক্তিই বা কে যার নিকট কোনো প্রকারেও কিছু মাত্র দাওয়াত পৌছেনি? তাছাড়া এটাও আল্লাহরই ব্যাপার যে, কাকে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর কোন্ বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবেনা। এসব কারণে এসকল প্রশ্নের সমাধান করার কাজে আমাদের মন মগজকে এতোটা পেরেশান করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদেরকে তো এ চিন্তায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকা দরকার যে, আমাদের নিকট সত্যের দাওয়াত পৌছেছে এবং এ বিষয়ে অবশ্যি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তাছাড়া যাদের যাদের ব্যাপারে আমরা জানতে পারি যে, তাদের নিকট দাওয়াত পৌছেনি, তাদেরকে দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্বও আমাদের উপর অর্পিত।

www.icsbook.info

কুরআন যে জিনিসকে কলব, দিল বা অন্তর বলে তা পুরোপুরি আকল বা বিবেকের সমার্থক নয়। মূলতঃ মন বা অন্তর হচ্ছে সেই জিনিস যা মানুষের মধ্যে কোনো জিনিসের গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এ ফায়সালা গ্রহণের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি, আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি তাকে সাহায্য করে। (তরজমানুল কুরআন : আগস্ট ১৯৫৯ ঈসায়ী)

পাথর মেরে হত্যার আয়াতটি কি কুরআনের আয়াত ছিলো?

প্রশ্ন : রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ডে 'নাস্‌খে কুরআন' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি লিখেছেন : পাথর মেরে হত্যার আয়াতটি তাওরাতের, কুরআনের নয়। আমি বিস্মিত হয়েছি যে, আপনি এমন একটি মত প্রকাশ করলেন, যা সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের খেলাফ। আহলুস সুন্নাতের প্রাচীন ও আধুনিক সকল উলামায়ে কিরামের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, কুরআনে কোনো কোনো আয়াত এমন আছে, যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়েছে বটে কিন্তু হুকুম বর্তমান রয়েছে। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭)

والسخ قد يكون فى التلاوة مع بقاء الحكم (احكام القرآن للجصاص جلد اول ٦٧)

এখন আমি সেসব দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করছি যেগুলো দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, পাথর মেরে হত্যার আয়াত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং সেটি কুরআনের আয়াত ছিলো :

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবন খালিদ (রা.) এর বর্ণনা : যখন দুই ব্যক্তি যিনার ঘটনা নিয়ে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়, তখন তিনি বলেন "আল্লাহর কসম। আমি 'আল্লাহর কিতাব' অনুযায়ী তোমাদের ফায়সালা করবো।" অতপর তিনি বিবাহিত ব্যভিচারিণীর জন্য পাথর মেরে হত্যার ফায়সালা করেন (মুআত্তা ইমাম মালিক, সহীহ বুখারি : বাবুল ইতেরাফ বিযযিনা)। প্রকাশ থাকে যে, 'আল্লাহর কিতাব' মানে- কুরআন মজীদ।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা.) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন "আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যতা সহকারে প্রেরণ করেছেন। তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। পাথর মেরে হত্যার আয়াতও আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবে ছিলো। আমি সেই আয়াত (আয়াতে রজম) পড়েছি, অনুধাবন করেছি এবং মুখস্থ করে রেখেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের শাস্তি প্রদান করেছেন এবং

www.icsbook.info

তাঁর মৃত্যুর পর আমরাও রজমের শাস্তি প্রদান করেছি। আমার ভয় হচ্ছে কিছুকাল পরে কেউ আবার একথা বলে না বসে যে, আয়াতে রজম তো আল্লাহর কিতাবে নেই এবং একথা বলে তারা আল্লাহর অবতীর্ণ ফরীযা (অবশ্য করণীয়) পরিত্যাগ করে গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে। অথচ আয়াতে রজম আল্লাহর কিতাবের আয়াত। (বুখারি : রজমুল হুবলা মিনায যিনা ইযা আহসানাত)

৩. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত। হযরত উমর (রা.) বলেছেন সাবধান! আয়াতে রজম অস্বীকার করে ধ্বংস হয়োনা। কেউ যেনো একথা না বলে যে, আমরা যিনার দুইটি দণ্ড বিধান আল্লাহর কিতাবে পাচ্ছিনা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের শাস্তি প্রদান করেছেন এবং আমরাও তা করেছি। আল্লাহর কসম! উমর বিন খাত্তাব আল্লাহর কিতাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে- আমার প্রতি এ অভিযোগের আশংকা যদি না থাকতো তাহলে আমি এ আয়াত (কুরআনে) লিখে দিতাম : اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ.: (বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যদি যিনা করে, তবে অবশ্যি তাদের পাথর মেরে হত্যা করো)।

নিঃসন্দেহে এ আয়াতটি আমরা পড়েছি (মুআত্তা ইমাম মালিক : বাবুয যানীউল মুহসিন ইয়ুরজামু)।

৪. আল্লামা আলুসী তার বিখ্যাত তফসীরে লিখেছেন :

ونسخ الاية على ما ارتضاة بعض الاصوليين . بيان انتهاء التعبد بقراءتها كاية الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (روح المعانى جلد اول ص ٣١٥)

আহকামুল কুরআন থেকে রহিতকরণ সংক্রান্ত যে দৃষ্টিকোণ উল্লেখ করেছি, তা মনকে বিচলিত করে তুলছে। কেননা, যে আয়াতের হুকুম অবশিষ্ট থাকবে তা তিলাওয়াত থেকে রহিত হয়ে যাবার কারণ বুঝে আসছেনা। উল্লেখিত দলিলগুলো দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আয়াতে রজম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তা কুরআনের আয়াত। কিন্তু আয়াতটি পূর্ণাংগ কুরআনের মধ্যে অনুপস্থিত। কেন? এ এক অসমাধানযোগ্য বিষয়। সমস্যাটি আমাকে পেরেশান করে রেখেছে। আশা করি আপনি কুরআন সংক্রান্ত আমার এ বিচলিত অবস্থাকে বিদূরিত করার চেষ্টা করবেন। মেহেরবানী করে একটু বিস্তারিত আলোকপাত করবেন। আমার দলিল প্রমাণগুলো যদি আপনার মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করে, তবে রাসায়েল ও মাসায়েলের উক্ত বাক্যটি পরিবর্তন করে দেবেন বলে আশা করি।

www.icsbook.info

উত্তর : 'আয়াতে রজম' কুরআনের আয়াত ছিলো- একথা অবশ্যি বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এ বক্তব্য গ্রহণ করার ব্যাপারে যেসব কারণে আমার সংশয় রয়েছে- সেগুলো নিম্নরূপ :

১. যেসব হাদিসে এ আয়াতের উল্লেখ হয়েছে সেগুলোকে একত্র করলে দেখা যায়- আয়াতটিতে সুস্পষ্ট শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। কোনো বর্ণনায় البتة শব্দ রয়েছে, আবার কোনো বর্ণনায় তা নেই। কোনো বর্ণনায় البتة শব্দ পর্যন্ত আয়াত সমাপ্ত হয়েছে। আবার কোনো বর্ণনায় এরপর نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ বাক্যাংশ রয়েছে। কোনো আয়াতে এই বাক্যাংশের পরিবর্তে রয়েছে : بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ বাক্যাংশ।

এটি যদি সত্যি কুরআনের আয়াত হয়ে থাকতো, লোকদের মুখস্থ থাকতো এবং পাথর মেরে হত্যার বিষয়ে সুস্পষ্ট কুরআনী প্রমাণের মর্যাদা রাখতো, তাহলে এর উদ্ধৃতিতে এমন পার্থক্য কেমন করে থাকতে পারতো?

২. সুন্নাহর অবিচ্ছিন্ন অর্থ দ্বারা এ বিষয়ের যে নির্দেশ পাওয়া যায় এবং আয়াতটির সুস্পষ্ট অর্থ থেকে যে নির্দেশ প্রকাশ পায়- এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। সুন্নাহ থেকে যে বিধান প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে বিবাহিত পুরুষ কিংবা নারী যখন যিনার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তখন তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে- চাই সে যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ। পক্ষান্তরে উল্লেখিত আয়াত থেকে যে বিধান বের হয় তা হচ্ছে এই যে, বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা দ্বারা যিনা সংঘটিত হলে তাদের 'রজম করতে হবে'- চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা না হোক। এভাবে এ আয়াত সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ সুপ্রমাণিত সুন্নাতের পরিপন্থী প্রমাণিত হয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য অতীত আলেমদের কেউ কেউ شيخ (বৃদ্ধ)কে ثيب (অকুমার) এবং شيخة (বৃদ্ধা)কে ثيبة (অকুমারী)র সমার্থক বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা নির্ঘাত একটা মনগড়া বিশ্লেষণ। আরবি ভাষার অভিধান, বাকপদ্ধতি, পরিভাষা এমনকি রূপক ও উপমাতে পর্যন্ত এমন কোনোই অবকাশ নেই যে, شيخ এবং شيخة দ্বারা - ثيب এবং ثيبة অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. স্বয়ং সেই আয়াতে রজমের শব্দাবলী الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. কুরআনের বাকরীতির মানদণ্ডের তুলনায় এতোটা নিম্নতর যে, আল্লাহ্ তায়ালা এমন বাক্য কুরআন মজীদে নাযিল করেছেন- ভাষাগত রুচি তা স্বীকারই করেনা।

৪. এমন একটি মরফূ হাদিসও (যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে) বর্তমান নেই, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের তিলাওয়াত রহিত করার,

www.icsbook.info

সেটাকে মূল কিতাবের বহির্ভূত রাখার এবং কিতাবে (কুরআনে) সংযুক্ত না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫. ইয়াহুদীর ওখানে যিনার যে মুকাদ্দমা উত্থাপিত হয়েছিল তার ফায়সালা করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত আনতে বলেন এবং তাওরাতের আয়াতকে পাথর মেরে হত্যার ভিত্তি বলে ঘোষণা করেন। সহীহ মুসলিম এবং সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুকাদ্দমার ফায়সালায় পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন : اللهم اني اول من احيا امرك اذا اماتوه "হে আল্লাহ! এরা তোমার বিধানকে হত্যা করার পর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তা জীবিত করছে।"

৬. 'আল্লাহর কসম! তোমাদের ফায়সালা আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করবো'- একথা বলে যে মুকাদ্দমায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর মেরে হত্যার ফায়সালা করেছিলেন, সেখানে একথা কোথাও নেই যে, তিনি الشيخ والشيخة আয়াতের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সেটাকে আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা বলেছিলেন। সেখানে একথাও তিনি বলেননি যে, আয়াতটির তিলাওয়াত যদিও রহিত হয়েছে কিন্তু তার নির্দেশ বহাল রয়েছে। সুতরাং নবী পাকের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত ইরশাদ নিঃসন্দেহে এ আয়াতের প্রতি ইংগিত, একথা বলা যেতে পারেনা। তাঁর বক্তব্যের এরূপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে, যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের বৈধ হাকিম ছিলেন, সেহেতু তাঁর ফায়সালা মূলত কিতাবুল্লাহরই ফায়সালা। তাঁর বক্তব্যের বিশ্লেষণ এরূপও করা যেতে পারে যে, তাওরাত অনুযায়ী তিনি ইয়াহুদীদের মুকাদ্দমার যে ফায়সালা করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তার যথার্থতার কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে বলে দিয়েছেন।

বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। এ মুকাদ্দমা সম্পর্কেই সূরা মায়িদার সেই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, যেগুলো আরম্ভ হয়েছে- يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ দ্বারা এবং শেষ হয়েছে وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ 'র মাধ্যমে।

দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমদ, মুসলিম এবং আবু দাউদ।

৭. বিবাহ পরবর্তী যিনার জন্যে রজমের বিধান প্রমাণের জন্যে এ আয়াতের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন হয়না। এ বিধান প্রমাণের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন

www.icsbook.info

মুকাদ্দমায় এ আইন প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশেদীন এ আইন প্রয়োগ করেছেন এবং তাদের পরে সকল ফকীহ এবং মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। এ জিনিসগুলো যখন একটি আইনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে যথেষ্ট, তখন তিলাওয়াত মনসূখ করা একটি আয়াতকে এ বিষয়ে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার কি প্রয়োজন রয়েছে? এটি কুরআনের আয়াত বলে প্রমাণিত হলেও এ আইনটিকে প্রমাণ করার জন্যে দলিল হতে পারেনা। কেননা, এ আয়াত তো কেবল বৃদ্ধাবস্থায় যিনাকারীদের জন্যেই রজমের শাস্তি নির্ধারণ করে। অথচ আয়াতটিকে যে আইনের দলিল বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, সেখানে রজমের বিধান নির্ধারিত হয়েছে বিবাহিত অবস্থায় যিনার অপরাধের জন্যে।

৮. আয়াতটির শুধুমাত্র তিলাওয়াত রহিত হয়েছে এবং হুকুম বাকি রয়েছে- এমনটি বলাও সঠিক নয়। কেননা যে হুকুম বাকি রয়েছে তাতো এ নয় যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অবিবাহিত হলেও তাদের রজম করতে হবে। বরঞ্চ সে বিধানটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ অবিবাহিত অপরাধী যদি বৃদ্ধও হয়, তবু সে কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তিই পাবে এবং বিবাহিত অপরাধী যদি যুবকও হয়, তবু তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হুমামের ঐ মতটিও বিবেচনাযোগ্য যা আল্লামা আলুসী রূহুল মাআনী অষ্টদশ খণ্ডের সতের পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন

اَلزَّانِيْ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. সূরা নূরের এ আয়াতটির হুকুম বিবাহিতদের উপর থেকে রহিত হওয়ার দলিল হচ্ছে নির্ভুল সুন্নাহ। আর اَلْبَتَّةَ আয়াতকে উক্ত আয়াতের রহিতকারী বলে আখ্যায়িত করা ততোটা নির্ভুল নয়। কেননা এই শেষোক্ত আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসেবে নাযিল হয়েছিল এবং পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়েছিল- একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। হযরত উমর (রা.) যদি তাঁর খুতবায় এ আয়াতের উল্লেখ করে থাকেন এবং শ্রোতারা তা শুনে চুপ থাকে (যেমন নাকি এ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়), তবে এটা আয়াতটির পক্ষে অকাট্য নির্ভুল 'প্রমাণ' নয়। কেননা চুপ থাকা ইজমাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আর তা যদি 'প্রমাণ' হয়ও তবু আমরা অকাট্যভাবে একথা বলতে পারিনা যে, হযরত উমরের ঐ বক্তৃতার সময় সকল মুজতাহিদ সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। আর এ রিওয়ায়াত যে ধারণা কল্পনার ভিত্তিতে হযরত উমরের প্রতি আরোপ করা হয়েছে- তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত) হযরত আলী শারাহাকে কোড়া এবং পাথর মারার শাস্তি প্রদান করতে গিয়ে বলেছিলেন : আমি তাকে আল্লাহর কিতাব

www.icsbook.info

অনুযায়ী কোড়া এবং রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী রজমের শাস্তি প্রদান করলাম। এখানে হযরত আলী (রা.) পাথর মারার জন্যে সেই তিলাওয়াত রহিত আয়াতকে 'প্রমাণ' হিসেবে উল্লেখ করেননি।"

বাকি থাকলো হুকুম বিদ্যমান এবং তিলাওয়াত রহিতের মাসআলা। উলামায়ে উসূল নিঃসন্দেহে এ ধরনের নসখের (রহিত হওয়ার) কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে, গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার পরও তাঁদের এ মতামত আমার বুঝে আসেনি। আমার মতে, ঐ সমস্ত আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হওয়াটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যেগুলোর হুকুম রহিত হয়েছে, ঐ সমস্ত আয়াত নয় যেগুলোর হুকুম বর্তমান রয়েছে। কোনো প্রাজ্ঞ আলেম এ বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা করতে পারলে কৃতজ্ঞ থাকবো। (তরজমানুল কুরআন রবিউল আউয়াল ১৩৭৫ হি:, নভেম্বর ১৯৫৫ ঈসায়ী)

হুকুম বর্তমান থাকা অবস্থায় আয়াত রহিত হওয়া সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন

(তরজমানুল কুরআন ১৯৫৫ সালের নভেম্বর সংখ্যায় রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে 'আয়াতে রজম' এবং "হুকুম বর্তমান থাকা অবস্থায় আয়াত রহিত হওয়া" সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির যে উত্তর লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তা দেখে জনৈক ব্যক্তি নিম্নোক্ত পত্রখানা লিখে পাঠান। তার অনুরোধে পত্রখানা তরজমানুল কুরআনে ছাপা হলো)

'প্রশ্নের জবাবে আপনি যে যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা করেছেন তা একজন সমঝদার এবং নিরপেক্ষ মনের লোকের জন্য খুবই সান্ত্বনাদায়ক। কিন্তু আপনি অন্যান্য বিজ্ঞজনের নিকট এ বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করার আবেদন জানিয়েছেন, সে কারণে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করছি :

১. হুকুম বর্তমান থাকা অবস্থায় আয়াত রহিত হবার মতবাদ উসূলে ফিকাহর কোনো কোনো আলেমের ব্যক্তিগত মত। গোটা আহলুস সুন্নাতের সর্বসম্মত আকীদা এটা নয়। আপনি রূহুল মায়ানী প্রথম খণ্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠা থেকে যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তা থেকেও একথারই প্রমাণ মেলে। এমতাবস্থায় প্রশ্নকর্তা যে বলেছেন "পূর্বাপর সকল উলামায়ে আহলুস সুন্নাতের আকীদা হচ্ছে এই যে, কুরআনের কোনো কোনো আয়াত এমন আছে, যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু হুকুম বর্তমান রয়েছে"– এটা দলিল প্রমাণবিহীন একটা দাবি ছাড়া কিছু নয়, বরঞ্চ একটা ভ্রান্ত বক্তব্য। কেননা, কোনো কোনো উসূল বিশেষজ্ঞের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গোটা আহলুস সুন্নাতের আকীদা হতে পারেনা।

www.icsbook.info

২. এখন দেখা দরকার কোনো কোনো উসূল বিশেষজ্ঞের এই মত সঠিক নাকি ভ্রান্ত? একথা সুস্পষ্ট যে, এই মত যুক্তি ও প্রমাণ উভয় দিক থেকেই বাতিল :

ক. যুক্তির দিক থেকে মতটি এজন্যে বাতিল যে, যে জিনিস কুরআনের অংশই নয়, সেটাকে কুরআনী হুকুম বলে স্বীকার করে নেয়াটা একটা বাজে বরঞ্চ হাস্যকর ব্যাপার। এটা তেমনি একটা ভিত্তিহীন ধারণা যেমনি কুরআনকে চল্লিশ পারা মনে করার ধারণা।

খ. আর প্রমাণগত দিক থেকে মতবাদটি এজন্যে বাতিল, যেহেতু এর ফলে কুরআনকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। কেননা হুকুম বর্তমান থাকা কোনো আয়াত কুরআনে অবর্তমান থাকাটা কুরআনকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। অথচ উম্মতের সর্বসম্মত রায় হচ্ছে, কুরআনকে ত্রুটিযুক্ত মনে করা কুফরী এবং اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ. আয়াতের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ।

৩. যিনা সম্পর্কে শরিয়তের হুকুম ও বিধান হচ্ছে এই যে, অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে একশত কোড়া মারতে হবে– চাই তারা বৃদ্ধ হোক কিংবা জোয়ান। আর বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে– চাই তারা জোয়ান হোক কিংবা বৃদ্ধ। এ এক সুপরিচিত সর্বসম্মত বিধান যা সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সুপ্রমাণিত। বরঞ্চ অবিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীর দণ্ডবিধান তো কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। কেননা – اَلزَّانِيُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوْا الخ আয়াতে 'আলিফ লাম' যে আহদে খারেজী তা অকাট্য সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত –যার অর্থ হয় শুধুমাত্র অবিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী। এমন সুপরিচিত ও সর্বসম্মত শরয়ী বিধানের মুকাবিলায় প্রথমত প্রশ্নকর্তা কর্তৃক উত্থাপিত হযরত উমরের বক্তৃতা সংক্রান্ত বর্ণনাটিই অনির্ভরযোগ্য। কেননা, এরূপ সুপরিচিত সর্বসম্মত শরয়ী বিধানের সাথে মতানৈক্য করার অভিযোগ হযরত উমরের মতো একজন শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদের প্রতি আরোপ করাটাই ধারণাতীত।

আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ বক্তব্য তাঁর, তবু এক সুপরিচিত সর্বসম্মত বিধানের মুকাবিলায় হযরত উমরের এ রায় একটি ব্যক্তিগত ও ইজতেহাদী রায় বলেই গণ্য হবে। আর নবী ছাড়া অপর কারো ব্যাপারে এ ধরনের রায় কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কারণ : – اَلْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ 'মুজতাহিদ ভুলও করে আবার সত্যেও উপনীত হয়।" (তরজমানুল কুরআন : জমাদিউল আখির ১৩৭৫ হি:, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ ঈসায়ী)

www.icsbook.info

মুত্‌আ বিয়ে

প্রশ্ন : আপনি সূরা মুমিনূনের তফসীরে মুতআ বিয়ে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবি ও তাবেয়ীর বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন যে, তাঁরা অনন্যোপায় অবস্থায় মুত্‌আ বিয়ে সমর্থন করেন। অথচ প্রায় সকল মুফাসসিরই লিখেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পরবর্তীতে মুত্‌আ বিয়ে বৈধ হওয়ার মত পরিহার করেন। আমি অবাক হলাম, হযরত ইবনে আব্বাসের প্রত্যাবর্তন কেমন করে আপনার নযর থেকে গোপন থাকলো! মুতআ বিয়ের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যে সকল সাহাবি এবং তাবেয়ীই একমত– তা সকল মুফাস্‌সিরই লিখেছেন। এতে সন্দেহ নেই, আপনিও মুত্‌আ বিয়েকে হারাম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু 'অনন্যোপায়' শব্দ প্রয়োগ করে একটি কাল্পনিক চিত্র অংকনের মাধ্যমে আপনি মূলত মুত্‌আকে জায়েযই বানিয়ে দিলেন। আশা করি আপনার এ মত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবেন। কারণ মুত্‌আ হারাম হওয়াটা আহলুস সুন্নাতের সর্বসম্মত মত।

উত্তর : এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি, তার উদ্দেশ্য মূলত একথা বলা যে, সাহাবি, তাবেয়ী এবং ফকীহগণের মধ্যে যে ক'জন বুযর্গ মুত্‌আকে বৈধ বলে মনে করতেন, তাদের এ মনে করার অর্থ এ ছিলোনা যে, তারা স্বাধীন নিয়ন্ত্রণহীন মুত্‌আ বিয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। বরঞ্চ তাঁরা এটাকে হারাম মনে করতেন এবং 'অনন্যোপায়' অবস্থায় বৈধ মনে করতেন। তাদের কোনো একজনও মুতআকে বিয়ের মতো সাধারণ ও স্বাধীন ব্যাপার মনে করতেননা। 'অনন্যোপায়' অবস্থা বুঝানোর জন্যে আমি যে কৃত্রিম উদাহরণটি পেশ করেছি, তা দ্বারা 'অনন্যোপায় হওয়ার' প্রকৃত অবস্থার একটি চিত্র অংকন করাই উদ্দেশ্য ছিলো। যাতে করে যে কেউ বুঝতে পারে যে, শীয়ারা যদি মুত্‌আ বৈধ হওয়ার মতই অবলম্বন করতে চায়, তবে কি ধরনের 'অনন্যোপায় হওয়া' পর্যন্ত তাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত। আমার বক্তব্য দ্বারা মূলত ঐসব লোকদের ধারণার সংশোধনই উদ্দেশ্য ছিলো, যারা 'অনন্যোপায় হওয়ার' শর্ত উড়িয়ে দিয়ে মুত্‌আ বিয়ের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার বর্ণনাভংগি দ্বারা আপনার মতো কারো কারো মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি নিজেই অনন্যোপায় অবস্থায় মুত্‌আ বিয়ের পক্ষপাতী। অথচ আমি মুত্‌আকে অকাট্য হারাম মনে করি। এখন থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে রাসায়েল মাসায়েল দ্বিতীয় খণ্ডে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমি পেশ করেছি। যাহোক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দ্বিতীয়বার দেখার সময় আমি এ বাক্যটিকে এমনভাবে সংশোধন করে দেবো যাতে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

www.icsbook.info

মনে রাখা দরকার, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত মুত্আর বিষয়টা মতবিরোধপূর্ণ ছিলো। আর সেই মতবিরোধও ছিলো একথা নিয়ে যে, মুত্আ কি অকাট্য হারাম নাকি মৃত প্রাণী ও শুকরের গোস্ত ভক্ষণের মতো হারাম– যা নাকি 'অনন্যোপায়' অবস্থায় হালালে পরিবর্তিত হতে পারে। অধিকাংশ লোক প্রথমোক্ত (অকাট্য হারাম) মতের পক্ষে ছিলেন আর স্বল্প সংখ্যক লোক ছিলেন শেষোক্ত মতের পক্ষে। পরবর্তীতে আহলে সুন্নাতের সকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেন যে, মুত্আ বিয়ে অকাট্য হারাম। 'অনন্যোপায়' অবস্থায়ও এর বৈধতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেন। পক্ষান্তরে শীয়াগণ মুত্আ স্বাধীনভাবে বৈধ হওয়ার আকীদা গ্রহণ করেন এবং 'অনন্যোপায় হওয়া' তো দূরের কথা 'প্রয়োজন' শর্তটিও তারা বাকি রাখেননি। এ সম্পর্কে আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, মুত্আর নিষিদ্ধতা সর্বাবস্থায়ই প্রমাণিত এবং এর স্বাধীন বৈধতার কাল্পনিক ধারণা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য কেবলমাত্র 'অনন্যোপায় হওয়া' অবস্থার জন্যে অতীত আলেমগণের একটি দলের রায়ের মধ্যে এর বৈধতার অবকাশ ছিলো। সুতরাং মুত্আর পক্ষপাতী লোকদেরকে এই আলেমগণের অনুসরণ যদি করতেই হয়, তবে কমপক্ষে এই (অনন্যোপায় হওয়ার) সীমা অতিক্রম করা কিছুতেই উচিত হবেনা।

মুত্আর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.) এর পূর্বমত প্রত্যাহারের যে কথা আপনি বলেছেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো– উলামায়ে কিরামের সেসব বক্তব্য আমার সম্মুখে রয়েছে, যেগুলোতে হযরত ইবনে আব্বাসের পূর্বমত প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব দাবি মতবিরোধপূর্ণ। এ বিষয়ে যেসব রেওয়ায়েতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার মত যে ভুল একথা স্বীকার করে নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়না। বরঞ্চ মনে হয় কেবল ভালো বিবেচনা করেই ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকছিলেন। ফতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ইবনে বাত্তালের একথা উল্লেখ করেছেন যে :

"মক্কা ও ইয়েমেনের লোকেরা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মুত্আ মুবাহ হবার কথা উল্লেখ করেছেন। একথা দ্বারা যদিও তার পূর্বমত থেকে প্রত্যাবর্তনের রেওয়ায়েত এসেছে, কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল। অধিকতর বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহ হচ্ছে এই যে, তিনি মুত্আকে জায়েযই মনে করতেন।"

আরেকটু অগ্রসর হয়ে স্বয়ং ইবনে হাজার একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তার পূর্বমত প্রত্যাহারের বর্ণনাগুলো ইখতেলাফপূর্ণ (৯ম খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা)। এ বিষয়ে

www.icsbook.info

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম তাঁর গবেষণা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভালো বিবেচনা করে ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকাটাই তাঁর প্রত্যাবর্তন ধরে নেয়া হয়েছে। ইবনে কাইয়্যেম বলেন : লোকেরা যখন এ বিষয়ে (মুত্আ) বাড়াবাড়ি করতে লাগলো এবং প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই যথেচ্ছ এ পন্থা অবলম্বন করতে থাকলো এবং কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও সীমারেখাই বাকি রাখলনা, তখন ইবনে আব্বাস (রা.) এর বৈধতার ফতোয়া দেয়া বন্ধ করে দেন এবং পূর্বমত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন (যাদুল মাআদ, ২ খণ্ড, পৃ: ৩০)। (তরজমানুল কুরআন : রবিউল আওয়াল ১৩৭৫ হি:, নভেম্বর ১৯৫৫ ঈসায়ী)

তাফহীমুল কুরআন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন : আমি কয়েকটি তফসীরের সাহায্যে কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করে থাকি। প্রথমে আপনার লেখা তাফহীমুল কুরআন পড়ি। তারপর তফসীরে জালালাইন, তফসীরে খাযেন এবং অন্যান্য বিবিধ তফসীরও পড়ি। কোনো কোনো জায়গায় দেখতে পাই, আপনি প্রাচীন মুফাস্সিরদের সাথে প্রচুর ভিন্নমত পোষণ করেন। এতে মনে সন্দেহ জন্মে। আমি এ ধরনের কয়েকটি মতভেদের জায়গা তুলে ধরছি। আশা করি আপনি সন্তোষজনক উত্তর দেবেন।

১. তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ডে হুরুফে মুকাত্তায়াত (কতিপয় সূরার প্রথমে উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা যথা আলিফ লাম মীম প্রভৃতি) সম্পর্কে আপনি লিখেছেন যে, সে যুগের বাচনভঙ্গিতে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। বক্তা ও কবিগণ এ বাচনভঙ্গিতে কথা বলতেন। আপনার একথা সংখ্যাগুরু তফসীরকারদের মতের পরিপন্থী। তফসীরে মাদারেক ও মায়ালেমে হুরুফে মুকাত্তায়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

اَللّٰهُ اعلم بمراده اشارة الى ما اختاره جمهور السلف والخلف إن الحروف المقطعة من المتشابهات التى لا يعلم تاويلها الا اللّٰه كما قَالَ الشعبى وجماعة الف لام ميم وسائر حروف الهجاء فى اوائل السور من المتشابة الذى استاثر اللّٰه تعالى بعلمه وهو سرا القران فنحن نؤمن بظاهر ها ولكل العلم الى اللّٰه وفائدة ذكرها طلب الايمان بها قال ابو بكر الصديق رض فى كُلّ كتاب سر وسر اللّٰه تعالى فى القران اوائل السور-

"এ অক্ষরগুলো দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চান তা আল্লাহই ভালো জানেন। অধিকাংশ প্রাচীন ও আধুনিক মুফাস্সীরগণের অভিমত এই যে, বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ পবিত্র কুরআনের সেই রহস্যময় কথাগুলোর অন্যতম, যার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। ইমাম শাবী ও একদল মুফাস্সিরের অভিমতও

www.icsbook.info

তদ্রূপ। তাঁরা বলেন যে, আলিফ লাম মীম ও সূরাসমূহের শুরুতে বিদ্যমান বাদবাকি সবগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা সেই রহস্যময় জিনিস যার নিগূঢ় তত্ত্ব একমাত্র আল্লাহরই জানা আছে। এটা কুরআনের গুপ্ত রহস্য। আমাদের কাজ হলো এর বাহ্যিক রূপের উপর ঈমান রাখা এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহর উপর সোপর্দ করা। এগুলোর উল্লেখের সার্থকতা হলো, এর উপর ঈমান আনার দাবি জানানো হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন : প্রত্যেক গ্রন্থেই একটা অজানা রহস্য থাকে। কুরআনে আল্লাহর গোপন রহস্য হলো এই সূরাসমূহের প্রথমাংশ।"

হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবিও এ ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন। আপনার কথামত যদি সে যুগে হুরুফে মুকাত্তায়াতের ব্যবহার চালু থাকতো, তাহলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) অবশ্যই এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তো জানা যাচ্ছে যে, সকল প্রাচীন ও আধুনিক মুফাস্সিরগণ এ অক্ষরগুলো সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহর উপরই সোপর্দ করতেন। সাহাবিগণও যখন এর কোনো অর্থ নির্দিষ্ট করেননি তখন বুঝা যায় যে, আপনার ধারণা অনুযায়ী তখনকার কবি সাহিত্যিকরাও এসব অক্ষর ব্যবহার করতোনা। তবে বায়যাবী একটা চমকপ্রদ কথা লিখেছেন। সেটি এই যে, হুরুফে মুকাত্তায়াতের মাধ্যমে মক্কার মুশরিকদের এই বলে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে যে, এই অক্ষরগুলো দিয়েই তোমরা তোমাদের সাহিত্য রচনা করে থাক, আর এই অক্ষরগুলো দিয়েই আল্লাহর এই কিতাবও রচিত। অথচ তা সত্ত্বেও তোমরা কুরআনের সমতুল্য সাহিত্য রচনা করতে পারছোনা।

২. হযরত ঈসা (আ.) কে আকাশে তুলে নেয়ার ব্যাপারেও আপনি মুফাসসিরদের সাথে মতভেদ করেছেন এবং رَفَعَ (তুলে নেওয়া) শব্দের মর্মটাকে অস্পষ্টতার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।

৩. আসহাবে কাহ্ফের গুহার মধ্যে ঘুমানোর সময়কাল কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আপনি ইতিহাসের উপর নির্ভর করে প্রাচীন তফসীর গ্রন্থসমূহেরই শুধু নয়, কুরআনেরও বিরুদ্ধে লিখেছেন।

৪. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ (তোমাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া ফেলেছি) এই বাক্যটার যে তফসীর আপনি করেছেন, তাও তফসীরকারকদের মতের বিরুদ্ধে। এমনকি তা কুরআনেরও বিপরীত। কেননা কুরআনের অন্যত্র ظُلَّةٌ ظُلَلٌ এই শব্দ দুটি আপনার তফসীরকে সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন।

৫. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হিজরতের ঘটনা এই যে, তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং এক অত্যাচারী বাদশাহ কুকর্মের মতলব এঁটেছিল। আল্লাহ্

www.icsbook.info

সেই জালেম বাদশাহকে আপন অলৌকিক শক্তি দ্বারা তার কুমতলব থেকে ফিরিয়ে রাখেন। আপনি এখানেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং এই ঘটনাকে বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আমার অনুরোধ এই যে, আপনি এই স্থানগুলোতে আপনার তফসীর পুনর্বিবেচনা করবেন, অথবা নিজের মতামত প্রত্যাহার করবেন, নচেত নিজের মতের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করবেন। আপনার বিরোধিরা সব সময় এই ধরনের সুযোগের সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত করুন।

উত্তর : আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর ক্রমিক নম্বর অনুসারে নিম্নে দেয়া হলো :

হুরুফে মুকাত্তায়াতের অর্থ

১. হুরুফে মুকাত্তায়াত সম্পর্কে আমি যা লিখেছি, তা দুটো জিনিসের ভিত্তিতে লিখেছি। প্রথমত কুরআন নাযিল হওয়ার সময় কাফিররা কুরআন সম্পর্কে সব ধরনের আপত্তিই তুলেছে। কিন্তু এ আপত্তি কখনো তোলেনি যে, কুরআনে এসব অক্ষর কিভাবে এলো, যার কোনো অর্থ আমাদের বুঝে আসেনা। তাদেরকে তো আর একথা বলে শান্ত করা যেতোনা যে, এগুলো রহস্যময় এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ এর অর্থ জানেনা। মুমিন সাহাবিগণ তো এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারতেন, কিন্তু কাফিররা কেমন করে সন্তুষ্ট হতো? হরেক রকম প্রশ্ন উত্থাপনকারীরা যে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তুললোনা, তার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্যই থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত আরবদের কবিতা ও ভাষণে এ ধরনের অক্ষরসমূহ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এ বাকরীতি তাদের সাহিত্যে প্রচলিত ছিলো। আমার মতে, এ কারণেই কাফেররা এ নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেনি। একথা সত্য যে, কোনো কোনো সাহাবির এরূপ উক্তি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এসব অক্ষরের তাৎপর্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই। কিন্তু অন্য কিছু সংখ্যক সাহাবির এমন উক্তিও তো বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে যাতে এগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বায়যাবীর যে উক্তি আপনার খুব ভালো লেগেছে বলেছেন, ওটা আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। আপনার কাছে যদি সন্তোষজনক হয়ে থাকে তাহলে সেটা খুব ভালো কথা। আসলে তো মনে তৃপ্তিই কাম্য। আমি খামাখা আপনার মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে যাবো কেন?

হযরত ঈসা (আ.)-কে তুলে নেওয়ার তাৎপর্য

২. হযরত ঈসা (আ.) কে তুলে নেওয়া সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি, তা শুধু এতটুকুই যে, পবিত্র কুরআনের ভাষা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝা যায় না যে, তাঁকে

www.icsbook.info

সশরীরেই আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তাই বলে আমি এ কথা বলিনি যে, কুরআনের ভাষা থেকে এরূপ ধারণা পাওয়ারই অবকাশ নেই। আমার বক্তব্যের মর্ম শুধু এতটুকুই যে, শুধুমাত্র কুরআনের এই শব্দগুলোর ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় না যে, সশরীরে আকাশে তুলে নেয়ার কথা কুরআন দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্যভাবে বলে দিচ্ছে। সুতরাং কুরআনের তফসীরে আমাদের কেবল ততোটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকতে হবে, যতোটুকু আল্লাহ বলেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন : 'আল্লাহ্ তাকে তুলে নিয়েছেন।' এই তুলে নেওয়ার বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। তার মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে নিতে চাইলে কুরআনের বাইরে গিয়ে করা যেতে পারে। কিন্তু তাকে কুরআনের স্পষ্টোক্তি বলা যেতে পারেনা। এতে যদি আপনি অস্পষ্টতার অভিযোগ তোলেন, তাহলে আমি সবিনয়ে বলবো যে, এ ঘটনার অন্য কয়েকটা অংশও অস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এই বিষয়টাই ধরুন যে, হযরত ঈসা (আ.) যখন শত্রুদের হাতে আটক ছিলেন এবং তারা তাকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো, তখন তারা যে হযরত ঈসার পরিবর্তে অন্য একজনকে শূলে চড়িয়ে বসলো এবং তারপরও এই বিভ্রমে লিপ্ত থাকলো যে, আমরা মরিয়মের ছেলে ঈসাকেই শূলে চড়িয়েছি, এটা কিভাবে ঘটলো? শুধু তারাই নয়, হযরত ঈসার অনুসারীরাও একই বিভ্রাটে পড়ে গিয়েছিল। কুরআনে বলা হয়েছে شُبِّهَ لَهُمْ 'তাদেরকে বিভ্রমে লিপ্ত রাখা হলো।' কি উপায়ে এই বিভ্রমে লিপ্ত রাখা হয়েছিল, সেটা সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে কুরআনে কোথাও বর্ণিত দেখতে পান কি? এখন আমরা যদি কুরআন বহির্ভূত কোনো তথ্য দ্বারা এর কোনো নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত রূপ নির্ণয় করি, তবে তা করতে পারি। কিন্তু একথা তো বলতে পারিনা যে, এই নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত রূপটি কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে।

আসহাবে কাহ্ফ কতদিন ঘুমিয়েছিলেন ?

৩. আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের মেয়াদ সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাফহীমুল কুরআনে পুরো ঘটনার তফসীর যদি আপনি পড়তেন, তাহলে ওখানেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন। আপনি একটা নিদারুণ কটূ বাক্য ছুড়ে দিয়েছেন যে, কুরআন স্পষ্ট ভাষায় মেয়াদ নির্ণয় করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তুমি ইতিহাসের কথা বিশ্বাস করেছ এবং কুরআনের স্পষ্টোক্তি প্রত্যাখ্যান করেছ। আপনি কি এমন লোককে মুসলমান মনে করতে পারেন যে কুরআনকে বাদ দিয়ে ইতিহাসে বিশ্বাস করে? আমি তো এ ধরনের লোককে কাফির ঘোষণা করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করবোনা। এবার সূরা কাহ্ফের নিম্নোক্ত আয়াতটি নিয়ে একটু ভাবুন :

www.icsbook.info

وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا.

"তারা তাদের গুহায় তিনশো বছর থেকেছিল, কতেকে আরও নয় বছর যোগ করল। তুমি বলে দাও : তারা কতদিন থেকেছিল তা আল্লাহই অধিক জানেন।"

এ দ্বারা কি আল্লাহর তরফ থেকে ঘুমের মেয়াদ নির্ণয় করা হয়ে গেলো? তা যদি হতো তাহলে তো 'তারা কতদিন থেকেছিল তা আল্লাহই অধিক জানেন' একথা বলার কোনো অর্থ হয়না।

তূর পর্বত উত্তোলনের স্বরূপ

৪. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. এ আয়াত সম্পর্কে আপনার আপত্তি আমি বুঝতে পারলামনা। كَانَّهٗ فَسّتَّ اِهْبِطُوْا এর উল্লেখ দ্বারা তো মনে হয় যে, আপনার আপত্তি এ আয়াত নিয়ে নয়, বরং وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ. এ আয়াত নিয়ে। যদি তাই হয় তবে অনুগ্রহপূর্বক তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ড পৃ: ৮৩ এবং দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ৯৬ (উর্দূ সংস্করণ)–এর পাদটীকাগুলো মনোনিবেশ সহকারে পড়ে জানান যে, আপনার আপত্তি কোন্‌টা নিয়ে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর তিনটি মিথ্যা কথা সম্পর্কে

৫. হযরত ইবরাহীম (আ.) এর তিনটি মিথ্যা কথা সম্পর্কে আমি দুই জায়গায় আলোচনা করেছি। একটি হলো, রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ডের ৩৫ থেকে ৩৯ নং পৃ: পর্যন্ত (উর্দূ সংস্করণ)। অপরটি হলো, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়ার ৬০ নং পাদটীকা। যে রেওয়ায়েতে এই তিনটি মিথ্যা কথার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার বিশুদ্ধতা মেনে নিতে আমি অপারগ কেন, সে ব্যাপারে বিশদ যুক্তি প্রমাণ ঐ দু'জায়গায় উল্লেখ করেছি।

আমার ঐসব যুক্তি প্রমাণে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন তাহলে ভালো কথা। নচেত আপনি যা সঠিক মনে করেন সেটাই সঠিক মনে করতে থাকুন। এ ধরনের বিষয়াদিতে যদি মতভেদ থেকে যায় তবে তাতে অসুবিধা কি? আপনার মতে এ হাদিসের বক্তব্য এজন্য গ্রহণযোগ্য যে, তা বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত এবং বুখারি, মুসলিম, নাসায়ী এবং আরো কয়েকজন বড় বড় মুহাদ্দিস তা উদ্ধৃত করেছেন। আমার কাছে ওটা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, এতে একজন নবীকে মিথ্যা বলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটা এমন মামুলী ব্যাপার নয় যে, কয়েকজন বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে তা সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়। এ ব্যাপারে আমি ইমাম রাজী যতোদূর গিয়েছেন অতদূর যেতে চাইনা। তিনি তো বলেন যে, 'যখন নবীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে, তখন নবীর

www.icsbook.info

পরিবর্তে বর্ণনাকারীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা শতগুণ ভালো' (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৩। তিনি আরো বলেছেন যে, 'যখন নবী ও হাদিস বর্ণনাকারী–এ দু'জনের একজনকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখন তা রাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট করা উচিত' (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪৫)। তবে আমি এই হাদিসের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের কারো সম্পর্কে একথা বলিনা যে, তিনি মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আমি শুধু এতটুকু বলি যে, কোনো না কোনো পর্যায়ে ঘটনাটা বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো বর্ণনাকারী অবশ্যই অসাবধানতাবশতঃ ভুল করে ফেলেছেন। তাই এটাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি বলা সমীচীন নয়। কেবল সনদের উপর নির্ভর করে আমরা এমন একটা কাহিনীকে চোখ বুজে কিভাবে মেনে নেই, যা দ্বারা একজন নবীর বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়?

এই হাদিসটির বিশুদ্ধতার সপক্ষে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ যেসব যুক্তি প্রমাণ দিয়েছেন, তা আমি অবহিত। কিন্তু ওগুলো আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا 'বরঞ্চ এই বড় মূর্তিটাই অন্য সকল মূর্তিকে ভেঙ্গেছে' এবং إِنِّي سَقِيمٌ 'আমি অসুস্থ' হযরত ইবরাহীমের এ দুটো উক্তি সম্পর্কে তো সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিস একমত যে, প্রকৃতপক্ষে একথা দুটো মিথ্যার ভাষণের সত্যের আওতায় পড়েনা। আপনি তফসীরের যে কোনো কিতাবে এ আয়াত দুটোর তফসীর বের করে দেখতে পারেন এবং ইবনে হাজার, আইনী, আসকালানী প্রমুখ হাদিস ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোও পড়ে দেখতে পারেন। কেউ একথা স্বীকার করেননি যে, একথা দুটো মিথ্যা ছিলো। এরপর আসে স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিয়ে বাদশাহর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টার প্রসঙ্গ। এটা এমন বেখাপ্পা কথা যে, মুহাদ্দিসগণ এটাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যতো চেষ্টাই করেছেন, সফল হয়নি। ঘটনাটা যে সময়কার বলে বর্ণনায় বলা হয়েছে সে সময়ে হযরত সারার (রা.) বয়স কমপক্ষে ৬৫ বছর ছিলো। এ বয়সের মহিলার উপর কোনো ব্যক্তিই প্রলুব্ধ হতে পারেনা।[১] প্রশ্ন এই যে, বাদশাহ যখন হযরত সারাকে পাওয়ার জন্য তৎপর হলো, তখন তিনি কোন উদ্দেশ্যে তাকে বোন বলে পরিচয় দিলেন? এরকম পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে বোন বললে কি ফায়দা হতো? হাদিস ব্যাখ্যাতাগণ এ প্রশ্নের যে কটি উত্তর দিয়েছেন তা একটু লক্ষ্য করুন :

১. সেই বাদশাহর ধর্মে এরূপ বিধি ছিলো যে, কেবল সধবা রমণীকেই ছিনিয়ে

---

১. মিসর সফরকারে হযরত সারার বয়স এরকম ছিলো, এটা বাইবেলের বর্ণনা হলেও কুরআন ও হাদিস থেকে এর প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। এক দিকে হাদিস থেকে জানা যায় যে, এই সফরের সময়ই মিসরের বাদশাহ হযরত হাজেরাকে হযরত ইবরাহীমের কাছে সমর্পণ করেন

www.icsbook.info

নেয়া যায়। এজন্য হযরত ইবরাহীম স্ত্রীকে এই আশায় বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন যে, বাদশাহ হয়তো তাকে স্বামীহীন মহিলা মনে করে ছেড়ে দেবে।

২. হযরত ইবরাহীম স্ত্রীকে বোন বলেছিলেন এজন্য যে, বাদশাহ মহিলাকে ছাড়ার পাত্র নয়। তাই তিনি ভাবলেন, এখন যদি জানাই যে, আমি ওর স্বামী তাহলে স্ত্রীও যাবে আমিও প্রাণে মারা যাবো। আর যদি বোন বলি, তবে শুধু স্ত্রীই যাবে কিন্তু আমার প্রাণ বেঁচে যাবে।

৩. হযরত ইবরাহীম আশংকা করেছিলেন যে, সারাকে যদি স্ত্রী বলে পরিচয় দেই, তাহলে সে আমার কাছ থেকে জোরপূর্বক তালাক আদায় করবে। এজন্য তিনি বললেন যে, এ আমার বোন।

৪. ঐ বাদশার ধর্মে এরূপ বিধিও ছিলো যে, ভাই নিজের স্বামী হবার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি হকদার। এজন্য তিনি স্ত্রীকে এ আশায় বোন বলে পরিচয় দিলেন যে, সে সারাকে আমার জন্য ছেড়ে দেবে। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪৭, আইনী, ১৫শ খণ্ড, পৃ: ২৪৯, কাসতল্লানী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৮০)।

একটু ভেবে দেখুন তো, এসব ব্যাখ্যা দ্বারা কি সমস্যার কোনো সুরাহ হয়েছে না আরো জট পাকিয়েছে? এমন উদ্ভট তথ্য কোন্ ইতিহাস থেকে জানা গেলো যে, পৃথিবীতে কখনো এমন ধর্মও ছিলো, যাতে স্বামীহীন মহিলাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র স্বামীওয়ালা মহিলাকে ভিন্ন পুরুষের উপভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। একজন নবীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এটা কি কোনো মহৎ ও উচ্চ ধারণা প্রতিপন্ন করে যে, তিনি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য স্ত্রীর সতীত্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারেন? আর জোরপূর্বক তালাক আদায় করা হবে এই আশংকায় স্ত্রীকে বোন পরিচয় দিয়ে অন্যের হাতে সোপর্দ করা এবং বিনা তালাকেই তাকে উপভোগ করতে দেয়ার যে তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে, এটাই বা কতখানি যুক্তিসঙ্গত? আর এটাই বা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, বাদশাহ ভাইকে তো বোনের স্বামী হবার অধিকতর হকদার মেনে নেবে, অথচ স্বয়ং স্বামীকে স্বামীত্বের হকদার মানবেনা? এ ধরনের খেই হারা কথার মালা গেঁথে

এবং তাঁর পেটেই হযরত ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করেন। অপরদিকে কুরআন থেকে জানা যায় যে, হযরত ইসমাঈল যখন পিতার সাথেই হাটতে চলতে সক্ষম হলেন তখন কুরবানীর অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে এবং এর কাছাকাছি সময়েই হযরত ইবরাহীমকে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এ সুসংবাদ শুনে হযরত সারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। কেননা তিনি তখন অতিশয় বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। এই দুটো ঘটনার মধ্যে খুব বেশি হলে ১২/১৩ বছরের ব্যবধান থাকতে পারে। এখন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, এমন বয়োবৃদ্ধ মহিলা মাত্র ১২/১৩ বছর আগে এমন সুঠাম যুবতী ছিলেন যে, মিসরের বাদশা তাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেলো?

www.icsbook.info

একটা অযৌক্তিক জিনিসকে যুক্তিসঙ্গত করার চেষ্টা করার চাইতে একথা স্বীকার করে নেয়াই কি ভালো নয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদৌ একথা বলেননি এবং কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে ভুল পন্থায় এ কাহিনী চালু হয়ে গেছে? কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে এরূপ আশংকা প্রকাশ করে থাকেন যে, হাদিস বিশারদদের যাচাই বাছাইকৃত ও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসকে যদি এভাবে যুক্তিতর্ক দ্বারা সন্দেহজনক সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে সকল হাদিসই সন্দেহজনক হয়ে পড়বে। কিন্তু এ আশংকা ভিত্তিহীন। কারণ উদ্ধৃত উক্তির বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ সকল হাদিসের ক্ষেত্রে হতে পারেনা। এটা কেবল এমন হাদিসের বেলায়ই হওয়া সম্ভব, যাতে একেবারেই অসঙ্গত ও বেমানান কোনো বক্তব্যকে রসূলের বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং কোনো ব্যাখ্যা দ্বারাই যাকে মানানসই করা সম্ভব হয়না। এ ধরনের কতিপয় হাদিসের উদ্ধৃতিকে সন্দেহজনক সাব্যস্ত করলে সকল হাদিস সন্দেহজনক কেন হবে? একথাটিও ভেবে দেখা দরকার যে, যেসব অশোভন উক্তির কোনো ব্যাখ্যাই দেয়া সম্ভব হয়না, সেসব উক্তিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি হিসেবে মেনে নেয়া বেশি বিপজ্জনক, না হাদিস বিশারদদের যাচাই বাছাই– এ ভুল থাকা অথবা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের দ্বারাও কোনো কোনো হাদিস উদ্ধৃত করতে ভুল হওয়া সম্ভব বলে মেনে নেয়া বেশি ঝুঁকিপূর্ণ? বলুন তো, একজন ঈমানদার ব্যক্তি এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা মেনে নেয়া বেশি পছন্দ করবে? (তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর : ১৯৫৫ ইং)

আরো কিছু আপত্তি

জনৈক ভদ্রলোক এ দীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে তরজমানুল কুরআনের সম্পাদকের (মাওলানা মওদূদী) কোনো কোনো লেখার উপর কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। সম্পাদক সাহেব এসব আপত্তির বিস্তারিত উত্তর দিয়েছিলেন। সর্বসাধারণের উপকারার্থে প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

"আমি দীর্ঘদিন ব্যাপী আপনার পুস্তকাদি একাগ্রতার সাথে অধ্যয়ন করছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন সংশয় দেখা দিলো যে, আপনার প্রতি যথেষ্ট সুধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও তা মনে মারাত্মক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। জামায়াতের নেতৃবৃন্দের সাথে এ ব্যাপারে কয়েকবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাতে উক্ত দ্বন্দ্ব নিরসনের পরিবর্তে আরো জটিল হয়েছে। আন্তরিকতা সম্পন্ন উক্ত নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমেই স্থির করেছি যে, সরাসরি আপনার কাছ থেকেই জেনে নেবো। তাই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে উপকৃত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি :

www.icsbook.info

১. তাফহীমুল কুরআন দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৪ পৃ : (উর্দূ সংস্করণ) আপনি লিখেছেন : "এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে, মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী যুগের প্রথম হজ্জ অষ্টম হিজরীতে প্রাচীন নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নবম হিজরীতে মুসলমানগণ নিজস্ব পদ্ধতিতে দ্বিতীয় হজ্জ আদায় করেন। এ বছর মুশরিকগণও নিজেদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে হজ্জ করে। অতপর দশম হিজরীতে শুধুমাত্র ইসলামী পদ্ধতিতেই হজ্জ সম্পন্ন হয়।"

প্রশ্ন এই যে, ৮ম হিজরীতে কোন্ কোন্ সাহাবি হজ্জে গিয়েছিলেন? কোন্ সালে হজ্জ ফরয হয়? হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে তার নিয়মবিধিও কি নাযিল হয়নি? হজ্জযাত্রীদেরকে কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম কোনো নিয়মবিধি শিখিয়ে দেননি? নবম হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের নেতৃত্ব যে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, তা ইসলামী পদ্ধতি বাদ দিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে সম্পন্ন হলো কেমন করে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে অনৈসলামী পদ্ধতিতে হজ্জ করায় কোনোরূপ তিরস্কার করেননি? প্রাচীন নিয়মে তো উলংগ তাওয়াফ হতো। সাহাবাগণও কি তাই করেছিলেন? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আলাদা আলাদাভাবে লিখে দিবেন।

২. তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ডের সূরা ইউনুছ : আপনি লিখেছেন যে, 'রসূল হিসেবে কর্তব্য পালনে হযরত ইউনুসের কিছুটা ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল।"

কথা হলো, নবীরা কি নিষ্পাপ হননা? বিশেষত: রিসালাতের দায়িত্ব পালনে নবীদের ভুল হওয়া কিভাবে সম্ভব?

لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ.

"তিনি (নবী) যদি আমার ব্যাপারে মনগড়া কথা বলতেন, তাহলে আমি ডান হাত দিয়ে তাকে চেপে ধরতাম অতপর তার ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম।"

এ আয়াত কয়টি থেকে কি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়না যে, নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়না? নবীর যদি নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনেও ত্রুটি হয় তাহলে আল্লাহর দীনের আর থাকে কি? আপনার এ বক্তব্য দ্বারা কি নবীদের অবমাননার ধারণা সৃষ্টি হয়না?

৩. তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর–নভেম্বর, ১৯৫৫ : আপনি লিখেছেন যে, রহিত হওয়া বিধান অনুসারে এখনও কাজ করা যায়, যদি সমাজে সেই ধরনের প্রয়োজন দেখা দেয়। শরিয়তের বিধানের যিনি রচয়িতা, তিনিই যদি কোনো বিধিকে রহিত করেন, তাহলে তা আবার চালু করবেন কোন্ শরিয়ত প্রণেতা? আজ যখন প্রত্যেক মতের অনুসারী নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করার হিড়িক পড়ে

www.icsbook.info

গেছে তখন শরিয়তের জ্ঞানধারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি ইসলামী বিধানের সংশোধন ও রহিতকরণের অধিকার দেয়া হয়, তবে সেটা কি ইসলামকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পর্যায়ে পড়বেনা? এসব রহিত বিধি কি কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ, না সকল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট? যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, তা কি আবার হালাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, না হালাল ঘোষণাকারী বিধিগুলো আবার রহিত হয়ে যেতে পারে? অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন। কেননা এগুলো মৌলিক বিষয়ের সাথে জড়িত।

৪. তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল, ৭৫ হি: "হযরত আদম (আ.) যে বেহেশতে ছিলেন, তা পৃথিবীতে ছিলো।"

বেহেশত যদি পৃথিবীতেই থাকতো, তাহলে اِهْبِطُوْا (নেমে যাও) বলা হলো কেন? اُخْرُجُوْا (বেরিয়ে যাও) বলাটাই কি সঙ্গত হতোনা?

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ. তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা ও ভোগের সামগ্রী থাকবে।" একথারই বা কি অর্থ থাকে? আগে থেকেই যখন পৃথিবীতে অবস্থিত রয়েছে, তখন পুনরায় অবস্থানের কি অর্থ হয়? তাছাড়া বেহেশ্ত সম্পর্কে তো কুরআনের প্রদত্ত ধারণা এরূপ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَجَنَّةٍ. (সমগ্র আসমান যমীনব্যাপী যে বেহেশতের বিস্তৃতি) এতো বড় বেহেশ্ত পৃথিবীতে কিভাবে অবস্থান করতে পারে? عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى. তার (সিদরাতুল মুনতাহার) নিকটে জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত। সেই সিদরাকে আচ্ছন্নকারী যখন আচ্ছন্ন করে।) এই সিদরাতুল মুনতাহা কি পৃথিবী ছিলো? ধরে নিচ্ছি, বেহেশ্ত পৃথিবীতে ছিলো। তাহলে এখন তা কোথায়? একটি বিমানে চড়ে আমরা সেখানে চলে যাই না কেন? আর যদি তা পৃথিবী থেকে উধাও করে দেয়া হয়ে থাকে– তবে কেন দেয়া হয়েছে এবং তার প্রমাণ কি?

৫. তাফহীমাত দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৪৩ "এটা একটা মজার ব্যাপার যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক নবীর উপর থেকে কোনো না কোনো সময়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটা পদস্খলন ঘটতে দিয়েছেন।

নবীরা কি সকল গুনাহ থেকে মুক্ত নন? নবুয়্যত চালু থাকা অবস্থায় যদি নবীর নিষ্পাপ অবস্থা তিরোহিত হতে পারে তাহলে তার নবুয়্যত ও নবুয়্যতের শিক্ষার উপর কিভাবে পুরোপুরি ভরসা করা সম্ভব? প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে যে, এটা হয়তো পাপমুক্ত না থাকার সময়কার ব্যাপার। এ জিনিসটার

www.icsbook.info

সীমানা চিহ্নিত করার উপায় কি? বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন।

৬. তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ড (উর্দু) পৃ. ৪২১ : "সুতরাং কুরআনের বক্তব্যের সাথে যা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হলো এই যে, ঈসা আলাইহিস সালামের সশরীরের আকাশে উঠার কথাও স্পষ্টভাবে না বলা উচিত আর তাঁর মৃত্যুর কথাও স্পষ্টভাবে না বলা উচিত।

প্রশ্ন এই যে, কুরআনে এ বিষয়টার যে বর্ণনা রয়েছে, তা কি অস্পষ্ট? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. "তারা (ইহুদীরা) তাঁকে (হযরত ঈসাকে) হত্যাও করেনি শূলেও চড়ায়নি" এতে যদি দৈহিক হত্যার অস্বীকৃতি স্পষ্টভাবে উক্ত হয়ে থাকে তাহলে একই বাক্যের পরবর্তী بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ. "বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন" এই অংশটিতে কি এমন অস্পষ্টতা এসে গেলো? যদি মেনে নেই যে, এই "তুলে নেয়াটা" দৈহিকভাবে নয় বরং আত্মীকভাবে হতে পারে এবং এ কারণে এতে অস্পষ্টতা এসেছে, তাহলে একই বাক্যে ব্যবহৃত সর্বনামে (তাকে) কি বিশৃংখলা অনিবার্য হয়ে উঠেনা অথচ এরূপ বিশৃংখলা তো ব্যাকরণের দিক থেকে দূষণীয়। জিজ্ঞাসা এই যে, এ আয়াতটি দ্বারা দৈহিকভাবে তুলে নেয়া বুঝতে অসুবিধা কোথায়? হাদিস থেকে যখন জানা যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে সশরীরেই তুলে নেয়া হয়েছে, তখন এ আয়াতে দৈহিকভাবে তুলে নেয়া বুঝাবেনা কেনো? তাছাড়া সমগ্র উম্মতের ইজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত অভিমত এটাই। তাহলে এই সর্বসম্মত অভিমতকে কুরআনের মূল বক্তব্যের দিক থেকে অস্পষ্ট আখ্যায়িত করে সংশয়াপন্ন করে দেয়ার যুক্তি কি? আর শব্দ তো এতো জোরদার যে, কুরআনের মূল বক্তব্যের সাথে তা অধিকতর সামঞ্জস্যশীল।

৭. তাফহীমাত দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ২৮৯ "ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমসাময়িক অবস্থা এবং অভিযুক্তদের অবস্থাও বিবেচনা করতে হয়। যুদ্ধের সময় দণ্ডবিধির কার্যকারিতা স্থগিত রাখা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটা হয়না।" অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়টি কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুক্তিপ্রমাণ সহকারে বিশ্লেষণ করুন। হযরত সা'দের ঘটনা ইসলামী দণ্ডবিধি লংঘন বা স্থগিতকরণের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। হযরত সা'দ কুরআন ও হাদিস থেকে কোনো অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।[১]

---

১. বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যারা সাহাবাদের সমালোচনা করাকে অবৈধ মনে করেন, তারা নিজেরা নির্দ্বিধায় তাদের সমালোচনা করেন। কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণ ছাড়া ইসলামী দণ্ডবিধি লংঘন ও স্থগিতকরণের যে অভিযোগ এখানে হযরত সা'দের উপর আরোপ করা হয়েছে, তা সমালোচনার পর্যায় অতিক্রম করে অপবাদ আরোপের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

www.icsbook.info

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক হযরত হাতেব (রা.) এর গোলামদেরকে মুক্তি দেয়া এবং হযরত হাতেবের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা থেকে বুঝা যায় যে, অপরাধটা ভিন্ন ধরনের ছিলো। অন্যথায় অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিয়ে নিরপরাধ মানুষের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার অর্থ কি? এটা নিশ্চিত যে, হযরত উমর হয়তো অপরাধটি ঠিক চুরির পর্যায়ে পড়ে বলে মনে করেননি। বরং বল প্রয়োগে অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করার পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন, যার ক্ষতিপূরণ তাদের মনিবের কাছ থেকে আদায় করেছেন। অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য যুক্তি পেশ করে বাধিত করবেন।

৮. তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ড ৩১৯ পৃ. : হযরত হাওয়ার জন্ম সম্পর্কে আপনি লিখেছেন যে, তিনি হযরত আদমের পাঁজরের হাড় থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। বুখারি শরীফের হাদিস خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ اٰدَمَ. "হাওয়া আদমের পাঁজরের হাড় থেকে সৃজিত হয়েছেন" এর জবাব কি হবে?

৯. তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ড ৮৩ পৃ. : তুর পর্বতকে শূন্যে তোলার ব্যাপারে আপনি অভিজ্ঞ তফসীরবেত্তাদের অভিমতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন কেন? তাদের বক্তব্যের দূষণীয় কি আছে?

إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. "যখন আমি পর্বতকে উপড়ে তাদের মাথার উপর রেখেছিলোম এমনভাবে যেনো তা একটা ছায়ার মতো"। এখানে "নাতাকা" শব্দটি কিসের দিকে ইংগিত করে? অনুরূপভাবে 'জুল্লাহ' শব্দটি আপনার তফসীরের সাথে কিভাবে সংগতিশীল হয়? বিশেষত: বাইবেল ও তালমুদ যখন একথারই সত্যতা প্রতিপন্ন করছে। তাছাড়া رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ. "তোমাদের উপর তুরকে তুলে ধরেছিলাম" এ বাক্যটির সুস্পষ্ট বক্তব্য আপনার ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করছে। যদি সত্যি সত্যি তুলে ধরা না বুঝানো হয়ে থাকে বরং তুলে ধরা হয়েছে এরূপ ধারণা দেয়া বুঝানো হয়ে থাকে তবে সেকথা খোলাখুলি বলতে অসুবিধা কি ছিলো? কুরআনের তো চিরাচরিত নিয়মই এই যে, তা এরূপ ক্ষেত্রে স্পষ্ট করেই বক্তব্য দিয়ে থাকে। যেমন বদর যুদ্ধের ঘটনায় বলেছে :

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ. "যখন তোমরা উভয় পক্ষ সামনাসামনি হয়েছিলে তখন আল্লাহ তোমাদের চোখে তাদেরকে অল্প দেখিয়েছেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে অল্প দেখিয়েছেন।" যেহেতু প্রকৃত কম বেশি বুঝানো উদ্দেশ্য ছিলনা, তাই সে কথা খোলাখুলি বলে দিয়েছে। অনুরূপভাবে যাদুকরদের মুকাবেলায় হযরত মূসার ঘটনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে :

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى "তাদের যাদুর ফলে তাঁর (মূসার) মনে হচ্ছিলো যেনো, (রশি ও লাঠিগুলো) দৌড়াচ্ছে।"

www.icsbook.info

যখন মুসলিম জাতির ইজমাও এর পক্ষে হয়েছে, তখন কোন কারণে একটি সর্বসম্মত ব্যাপারকে অস্পষ্ট আখ্যা দিয়ে সংশয়পূর্ণ করে দেয়া হবে?

তাছাড়া কুরআনের শব্দগুলোও এতো জোরদার যে, তা কুরআনের মূল ভাবধারার সাথে অধিকতর সংগতিশীল।

১০. "রাসায়েল ও মাসায়েল" প্রথম খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় ইমাম মাহদী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আপনি লিখেছেন যে, যে বিষয় ইসলামে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ, তা অবশ্যই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হওয়া চাই। শুধুমাত্র হাদিসের উপর এমন কোনো জিনিসের ভিত্তি স্থাপন করা যায়না, যার উপর ঈমান ও কুফর নির্ভরশীল বলে বিবেচিত হতে পারে। হাদিস সীমিত সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এর দ্বারা বড়জোর কোনো কিছুর সত্যতা সম্পর্কে ধারণা জন্মে, অকাট্য বিশ্বাস জন্মেনা। এখানে যে সাধারণ মূলনীতিটি আপনি লিখেছেন, তার দ্বারা কি আমরা ঝুঁকির মধ্যে পতিত হইনা? নামাযের রাকাতের সংখ্যা, রুকু, সাজদা এবং নামাযের সমগ্র প্রক্রিয়া– যার সম্পর্কে কুরআন সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেনি, এসব বিষয় অমান্য করলে কি কাফির হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠেনা?

১১. 'রজম' (বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি) সংক্রান্ত আয়াত নিয়ে আপনি মাসিক তরজুমানে যে আলোচনা করেছেন, তাতে আপনি উক্ত ঘটনার প্রামাণ্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অথচ বুখারি শরীফে রয়েছে যে, চাকর ও মহিলা মনিবের ব্যভিচারের ঘটনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উক্ত ছেলের পিতা বললো, اشدك بالله الا قضيت بيننا بكتاب الله. "আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমাদের মধ্যে কেনো কুরআন অনুসারে ফায়সালা করেননা? রসূল (সা.) জবাবে বললেন: والذى نفسى بيده لا قضين بينكما بكتاب الله. আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করবোই।" এই দুই শপথ বাণীর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে কোথায়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ বাণী কি আমাদের বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট নয়? বুখারির হাদিসকে কি ভুল সাব্যস্ত করা চলে? হযরত উমর (রা.) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

فكان مما انزل الله اية الرجم فقراناها وعقلنا ووعيناها.

"তখন আল্লাহ তায়ালা প্রস্তরাঘাতে ব্যভিচারীকে মৃত্যুদণ্ড দানের বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। আমরা তা পড়লাম, বুঝলাম ও হৃদয়ে বদ্ধমূল করলাম।"

www.icsbook.info

হযরত উমর (রা.) জুমার দিনে মসজিদে বসে ইসলামী আইন বিশারদ সাহাবিদের উপস্থিতিতে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করতে পারেন, এমন ধারণা করা চলে কি? আর যদি করে থাকেন, তাহলে নাউযুবিল্লাহ! উপস্থিত সাহাবিগণ কি ঈমানী জযবা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলেন যে, কেউ টু শব্দটিও করলেননা? যারা একটা জামার কাপড়ের টুকরার ব্যাপারে একই মেম্বারে হযরত উমরের কাছে কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, তারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে মিথ্যা রটনার ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করতে পারলেননা? কুরআনের চেয়ে কাপড়ের টুকরা কি তাদের কাছে বেশি মূল্যবান ছিলো? আপনি বলেছেন যে, হযরত উমরের এ উক্তির পক্ষে 'ইজমা' মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমত) হয়নি। কেননা সকল সাহাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায়না।

প্রশ্ন এই যে, সাহাবিগণ কি জুমার নামাযেও অনুপস্থিত থাকতেন? হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেছেন :

فانها دار الهجرة والسنة فتخلص باهل الفقه واشرف الناس.

"মদিনা হিজরতের স্থান এবং সুন্নতের স্থান। তাই তিনি ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ মানবদেরকে বেছে নিলেন।"

এ বক্তব্য কি অকাট্য প্রমাণ নয়? এই সময়ে আইনজ্ঞ সাহাবিগণ মদিনায় উপস্থিত ছিলেন। তবু যদি ধরে নেই যে, সকলে উপস্থিত ছিলেননা, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, অনুপস্থিত সাহাবিগণের কেউ কি উপস্থিত সাহাবিগণের কাছ থেকে এ বিষয়ে সত্যাসত্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করেননি? সত্যিই যদি সাহাবিগণের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে এমন ধরনের শৈথিল্য ও উদাসীনতা থাকতো এবং আল্লাহর কিতাবের তারতম্য করা তাদের রীতি হয়ে থাকতো তাহলে তো রাফেজীরা (কুরআনের যে অংশ নিজেদের দৃষ্টিতে যুক্তিসিদ্ধ মনে করেনা তা অগ্রাহ্যকারী শীয়া গোষ্ঠী) হকপন্থী বিবেচিত হবে। অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়টি কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুক্তিপ্রমাণ সহকারে বিশ্লেষণ করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কসম, উমর (রা.) এর জোরদার ভাষণ এবং বুখারির হাদিসের মোকাবিলায় যথার্থ সবল যুক্তিপ্রমাণ চাই। কোনো তফসীরকার বা মুজতাহিদের কথা বিপরীত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

১২. তরজুমানুল কুরআন রবিউল আওয়াল ৭৫ হি : আপনি হযরত আবু বকর কর্তৃক (স্বীয় ভৃত্য) মিসতাহর ভরণপোষণের ব্যয়ভার বন্ধের সিদ্ধান্তকে অনৈসলামিক ভাবাবেগ তাড়িত বলে আখ্যায়িত করেছেন। (উল্লেখ্য যে, মিসতাহ

www.icsbook.info

হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছিল– অনুবাদক)। প্রশ্ন এই যে, হযরত আবু বকরের (রা.) কি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কেবল কন্যার কারণেই সম্পর্ক ছিলো? হযরত আয়েশা (রা.) ছাড়া হযরতের অন্য কোনো স্ত্রীর উপর যদি এরূপ অপবাদ আরোপিত হতো, তাহলে কি হযরত আবু বকর (রা.) অভিমান বোধে উত্তেজিত হতেননা? "আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করার" নীতি কি সেখানে কার্যকর ছিলনা? সূরা নূরের আয়াতের এ অংশ–

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা মহানুভব এবং সচ্ছল, তারা যেন আত্মীয় স্বজন, নিঃস্ব ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে দান করার বিরুদ্ধে শপথ না করে, বরং তারা যেনো ক্ষমা করে ও ভুলে যায়। তোমরা কি পছন্দ করনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন" দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করা সঠিক মনে হয়না। কেননা এ উক্তিতে শুধুমাত্র অভিভাবকত্ব অব্যাহত রাখার লক্ষ্যই ব্যক্ত হয়েছে এবং তাও অত্যন্ত কোমল ভাষায় أُولُوا الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ (মহানুভব এবং সচ্ছল) অতপর أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (তোমরা কি পছন্দ করনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন) এসব উক্তি দ্বারা হযরত আবু বকরের মহৎ ভাবাবেগের কাছে ক্ষমার আবেদন জানানো হয়েছে। এখানে তিরস্কারের নামগন্ধও নেই। তথাপি একে ধিক্কার মনে করার যুক্তি কি থাকতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তাছাড়া এ আয়াতের বক্তব্য শুধুমাত্র অভিভাবকত্ব নিয়েই। অভিভাবকত্ব বন্ধ করার মূলে কি কারণ কার্যকর ছিলো, সেটা মোটেই এর আলোচ্য বিষয় নয়? যদিও আপনি একে অনৈসলামিক ভাবাবেগ বলে অভিহিত করেছেন। যদি এর কারণ অনৈসলামিক কিছু হতো, তাহলে "আত্মীয় স্বজনকে দান করা"র ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে ঐ কারণটার উপরই আঘাত করা হতো। হক কথা বলতে আল্লাহ সংকোচবোধ করবেন এমন তো হতে পারেনা। অন্যায়ের মূল উৎস বাদ দিয়ে তার শাখা প্রশাখা উচ্ছেদ করা কুরআনের বৈজ্ঞানিক রীতির বিরোধী। নচেৎ অভিভাবকত্ব এই উক্তি দ্বারা বহাল হলেও অন্যায়ের উৎস সেই অনৈসলামিক ভাবাবেগ তো যথারীতি বদ্ধমূলই থেকে যেতো। তরজুমানুল কুরআনের একই সংখ্যা, রবিউল আউয়াল, হি: ৭৫-এ আপনি হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে (হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের খবর শুনে বেশামাল হয়ে যাওয়া ও

www.icsbook.info

এ খবর কেউ উচ্চারণ করলে তাকে হত্যা করার হুমকি দান প্রসঙ্গে) আপনি লিখেছেন যে, সম্ভবত এই ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাই হযরত উমর (রা.) কে অনিবার্যভাবে ক্ষণিকের জন্য বেসামাল করে দিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, নবীর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করা কি ইসলামে নিষিদ্ধ?

তিনি যে বলেছেন–

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

"আল্লাহর কসম! পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চাইতে আমাকে বেশি ভাল না বাসলে তোমরা মুমিন হতে পারবেনা।" –এর তাৎপর্য কি? অবশ্য আল্লাহর আইনের পরিপন্থীভাবে নবীর নবীসত্তা বা ব্যক্তিসত্তার প্রতি মাত্রারিক্ত আসক্তি ও অনুরাগ নিঃসন্দেহে একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার। কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রতি এমন মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি ও অনুরাগ হযরত উমরের ছিলনা। ইন্তিকালের পর এ জিনিসটা তার ভেতরে কোত্থেকে এলো? বদরের যুদ্ধবন্দী, হুদাইবিয়ার সন্ধি, পর্দার বিধান, মুনাফিক সর্দারের জানাযা, ইত্যাকার বহু সংখ্যক ঘটনা তার সাক্ষী। সাহাবায়ে কেরাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে আমাদের কতখানি খারাপ ধারণা পোষণ করা বৈধ? [১] তাদের কর্মকাণ্ডের যেরূপ ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন, তা থেকে ভিন্নতর কোনো ব্যাখ্যা কি সম্ভব ছিলনা?

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِى اصحابى لاتتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم.

"আমার সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, আমার পরে তাদেরকে অপমানের লক্ষ্য বানিওনা। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে, সে আমার প্রতি ভালোবাসার মনোভাব নিয়েই তাদেরকে ভালোবাসবে। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের জন্যই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে" এবং

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم - اختلاف امتى رحمة اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

"আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রপুঞ্জের মতো। তাঁদের যে কোনো জনের অনুসরণ করলেই হেদায়াত লাভ করা যায়" এ দু'টি হাদিসের উদ্দেশ্য কি?

---

১. প্রশ্নকর্তার ভাষায় শুধু এতোটুকু যে, "তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর আইন লংঘন ও উপেক্ষা করতেন।"

www.icsbook.info

১৩. আপনি কি ত্রুটিমুক্ত? যদি না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার ইজতিহাদের (ইসলামী গবেষণালব্ধ ধ্যান ধারণার) সমালোচনা করা কি বৈধ?

আপনি যদি সমালোচনার উর্ধ্বে না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সমালোচনামুখর আলেমদের প্রতি দোষারোপ করা হয় কেন? ইসলামের নীতিমালার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অধিকার যদি শুধু জামায়াতের আলেমদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাহলে তা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে নাকি? একনায়কোচিত মনোভাব কি তাতে বৃদ্ধি পাবেনা? বর্তমান সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত মতভেদ কি (আমার উম্মতের মতভেদ কল্যাণকর) হবেনা? মতের এই বিভিন্নতার মধ্য দিয়েই কি বিভিন্ন রকমের প্রতিভার বিকাশ ঘটবেনা? যার দ্বারা মুসলিম উম্মত আবহমানকাল ধরে উপকৃত হয়ে আসছে এবং উপকৃত হতে থাকবে।

১৪. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা কি বৈধ? যদি বৈধ হয়, তাহলে أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ এবং اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ এই দু'টি হাদিসের জবাব কি হবে?

উত্তর : আপনার প্রশ্নমালার উত্তর দেয়ার আগে একথা বলা জরুরি মনে করছি যে, আমার লেখাগুলো সম্পর্কে কতোক লোক যে সন্দেহ সংশয় জেনে বুঝে মানুষের মনে ঢুকাচ্ছে, তা নিরসনের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করা তো নিঃসন্দেহে একটা সঠিক রীতি, তবে শিক্ষিত লোকদের জন্য প্রথমে নিজেই যথাসাধ্য তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করা কর্তব্য। এতে করে যে ভ্রান্তি অল্প একটু সময় ব্যয় করে নিজেরাই নিরসন করা যায়, তার জন্য খামাখা চিঠি লেখালেখির ঝামেলা পোহাতে হয়না। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই যাদের কাজ, তাদের কথা বাদ দিন। আমার লেখায় পোকা অনুসন্ধান করা এবং তা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে মানুষের মনমগজে ক্রমাগত খট্‌কা সৃষ্টি করা ছাড়া তাদের এখন আর কোনো কাজই নেই। কিন্তু আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধু এসব লোকের সৃষ্টি করা বিভ্রান্তি ও খটকা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করবো। আপনি অনুগ্রহপূর্বক একটু ভেবে দেখুন যে, এসব লোকের প্ররোচনায় ১৪টা প্রশ্ন তো আপনি একাই করেছেন। আর এ ধরনের প্রশ্ন করার লোক আপনি একা নন। পাকিস্তান ও ভারতের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে আমার কাছে এ ধরনের প্রশ্ন প্রতিনিয়তই এসে থাকে। কেননা সমগ্র উপমহাদেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের একটা গোষ্ঠী এ জাতীয় প্রশ্নাবলীর বীজ বপনের কাজ করেই চলেছে। এখন আপনারা কি চান যে, তারা যেমন জীবনের মূল্যবান সময় এই বেহুদা কাজে ব্যয়

www.icsbook.info

করছে, তেমনি আমিও আমার মূল্যবান জীবন তাদের সৃষ্টি করা বিভ্রান্তি নিরসনে ব্যয় করে দেই?

এবার আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছি

হজ্জ ফরয হওয়ার তারিখ

১. আমার নিবন্ধের এই অংশটুকু তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আপনাকে মোটেই বেগ পেতে হতোনা– যদি আপত্তিকারীরা আপনার মনে সন্দেহ সংশয়ের ব্যাধি ঢুকিয়ে না দিতো এবং আপনি নিজেও যদি একটু বুদ্ধি খাটাতেন। আমি লিখেছি, "মক্কা বিজয়ের পর প্রথম হজ্জ ৮ম হিজরীতে প্রাচীন রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়।" সাহাবাগণ এই হজ্জ প্রাচীন জাহেলী রীতি অনুসারে করেছিলেন– একথা এর কোথায় লেখা আছে? অতপর এই বাক্যটির উপর আপনি যেসব প্রশ্ন করেছেন, তা কিভাবে জন্ম নিলো? আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্বলিত যে কোনো একখানা কিতাব খুলে দেখলে জানতে পারতেন যে, ৮ম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা বিজিত হয়। এর পরের মাসেই হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধ বেধে গেলো। জিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'টি যুদ্ধ সমাপ্ত করলেন এবং উমরা করে হজ্জ না করেই সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় চলে গেলেন। হজ্জের প্রাচীন রীতি যা শত শত বছর ধরে জাহেলিয়াতের যুগে চালু হয়ে গিয়েছিল এবং যে রীতি অনুসারে হজ্জ করার জন্য হাজার হাজার লাখ লাখ মুশরিক মক্কায় সমবেত হয়েছে বা অতি শীঘ্রই সমবেত হতে যাচ্ছে, তা ঐ সময় হঠাৎ করে পাল্টে দেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। ঐ সময় যদি তা করা হতো, তাহলে, হুনাইনের যুদ্ধের চেয়ে কয়েক গুণ বড় যুদ্ধ মসজিদুল হারামের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হতো। এজন্য ঐ বৎসর জাহেলী রীতির হজ্জে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। হজ্জ যেভাবে হয়ে এসেছে সেভাবেই হতে দেয়া হয়েছিল।[১]

পরবর্তী বছর ৯ম হিজরীতে হজ্জের সময় তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত আলী (রা.)কে পাঠালেন এবং ঘোষণা করা হলো :

لايحجن بعد عامنا هذا مشرك ولايطوفن بالبيت عريان. "এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবেনা এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে পারবেনা।" এই ঘোষণা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছিলো :

---

১. ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে আন্দাজ অনুমান করে আমি একথা বলিনি। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাচীনতম জীবনী লেখক ইবনে হিশাম একথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ৮ম হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب بلا تحج عليه. "আরবদের চিরাচরিত রীতি অনুসারেই এ বৎসর হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪ পৃ:)

www.icsbook.info

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا.

"মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেনো আর মসজিদুল হারামের ধারে কাছে না আসতে পারে–" (সূরা তাওবা : ২৮)।

পরবর্তী বছর দশম হিজরীতে এ নির্দেশ কার্যকরী হলো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত হয়ে হজ্জের খাঁটি ইসলামী নিয়ম চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হজ্জ কোন্ বছর ফরয হয়েছে। এর জবাব এই যে, বিজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মতে তা নবম হিজরীর শেষের দিকে অথবা দশম হিজরীর প্রথম দিকে ফরয করা হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে বনু আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের আগমনের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রধান স্তম্ভের বর্ণনা দিতে গিয়ে শুধু চারটি স্তম্ভের বর্ণনা দিয়েছেন, হজ্জের কথা তিনি বলেননি। এই প্রতিনিধি দল যে নবম হিজরীতে তবুক অভিযানের পরে এসেছিলো, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই– (যাদুল মায়াদ, প্রথম খণ্ড পৃ: ২৪৬০, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ৩৪–৩৯)। কিন্তু যেহেতু সে বছর জাহেলী যুগের 'নাছি' প্রথা অনুসারে জিলকদ মাসে হজ্জ নির্ধারিত ছিলো, আর মুশরিকদের সাথে হজ্জ করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে শোভনীয় ছিলনা, তাই তিনি নিজে হজ্জে উপস্থিত না হয়ে হযরত আবু বকর ও আলী (রা.)কে পাঠালেন– জাহেলী রীতিনীতি বাতিল করার ঘোষণা দেয়ার জন্য। বস্তুত হজ্জের ইসলামী বিধির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বাস্তব প্রশিক্ষণ ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

রিসালাতের দায়িত্ব ও হযরত ইউনুস (আ.)

২. এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজে দেয়ার পরিবর্তে স্বয়ং কুরআন দ্বারাই দেয়া ভালো মনে করি। পবিত্র কুরআনে চার জায়গায় হযরত ইউনুসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক উক্ত চারটি বর্ণনাই পড়ে দেখুন। সূরা ইউনুসে আছে :

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ.

"সুতরাং এমন একটি জনপদও কেনো দেখা গেলোনা যা (আযাব আসতে দেখে) ঈমান আনলো এবং তার ঈমানে তার কোনো ফায়দা হলো? কেবল ইউনুসের জাতি ছাড়া। তারা যখন ঈমান আনলো, তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের অবমাননাকর শাস্তি হটিয়ে দিলাম এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে জীবন যাপনের সুযোগ দিলাম" (আয়াত ৯৮)।

www.icsbook.info

সূরা আম্বিয়াতে আছে :

وَذَالنُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"সেই মাছওয়ালার (ইউনুসের) কথা স্মরণ করো, যখন সে রাগ করে চলে গেলো এবং ভাবলো যে, আমি (তার যাওয়ার ব্যাপারে) পাকড়াও করবোনা।[১] অবশেষে সে অন্ধকারে ফরিয়াদ জানালো যে, তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নাই। তুমি নিষ্কলুষ। আমিই ভুল করেছি।" (আয়াত ৮৭)

সূরা সাফফাতে আছে :

وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

"নিশ্চয়ই ইউনুস ছিলো রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি যখন বোঝাই ভর্তি নৌকা অভিমুখে পালালেন, তখন (নৌকার আরোহীদের সাথে) তিনিও লটারীতে অংশ নিলেন এবং তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন। অতপর মাছ তাকে গিলে ফেললো। তখন তিনি অনুশোচনায় লিপ্ত হলেন। অতপর তিনি যদি আল্লাহর গুণকীর্তন না করতেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন।" (আয়াত ১৩৯-১৪৪)

সূরা কালামে আছে :

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ.

"সুতরাং হে মুহাম্মদ! ধৈর্যের সাথে স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা করো। তুমি মাছওয়ালার মতো হয়োনা।[২] সে যখন দুঃখের আতিশয্যে কাকুতি-মিনতি করেছিলো। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি তাকে সহায়তা না করতো তাহলে তাকে নিরস ময়দানে নিক্ষেপ করা হতো এবং সে ধিকৃত হতো।"[৩]

---

১. শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) সাহেব এভাবে অনুবাদ করেছেন : "সে ভাবলো যে, আমি তাকে পাকড়াও করতে পারবোনা।" মাওলানা আশরাফ আলী (রহ.) সাহেবের অনুবাদ এরূপ : "এবং তিনি মনে করলেন যে আমি (তার এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) কোনো কৈফিয়ত তলব করবোনা।"

২. মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব অনুবাদ করেছেন এভাবে : "এবং (দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে) মাছের উদরস্থ (নবী ইউনুসের) মতো হবেননা।"

৩. শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের অনুবাদ এরূপ : "এবং সে তিরস্কৃত হতো।"

www.icsbook.info

এ আয়াতগুলো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দ্বারা কিছু একটা ত্রুটি অবশ্যই সংঘটিত হয়েছিল, যার দরুন তাঁকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিল। সেই ত্রুটি ধৈর্য হারানোর ধরনেরই ছিলো এবং তা রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেই সংঘটিত হয়েছিল। এ আয়াতগুলো থেকে একথাও বুঝা যায় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আপন জাতির উপর রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়াই আপন রিসালাতের দায়িত্ব পালনের স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর জাতির প্রতি এমন অসাধারণ অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন, যা অন্য কোনো জাতির প্রতি কখনোই প্রদর্শন করেননি। অর্থাৎ আযাব আসতে দেখে তারা যখন ঈমান আনলো, তখন তাদেরকে ক্ষমা করা হলো। অথচ আল্লাহর চিরন্তন রীতি এই যে, আযাব আসতে দেখে ঈমান আনলে সে ঈমানে কাজ হয়না। এটা আল্লাহর নিজেরই বর্ণনা। এতে আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো হ্রাসবৃদ্ধি করিনি। এখন এতে যদি আপনার বা অন্য কারো কোনো আপত্তি থেকে থাকে, তবে সে আপত্তি আমার উপরে নয়, বরং কুরআন ও তার প্রেরণকারী আল্লাহর তায়ালার উপর বর্তায় এবং তার উত্তর দেয়াও তাঁরই দায়িত্ব। আপনি বলেছেন এ উক্তি কি নবীগণের অবমাননার শামিল নয়? আপনার একথা দ্বারা মনে হয় যেনো নবীগণের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে তাদের প্রেরণকারী আল্লাহ তায়ালার চেয়েও আপনি বেশি সচেতন। তাই যদি না হবে, তাহলে যে কথা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তাকে অবমাননার শামিল সাব্যস্ত করার আর কি ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারেন!

রহিতকৃত বিধি কার্যকরীকরণ প্রসঙ্গে

৩. এ বিষয়টির ব্যাপারে আপনি ভুল বরাত দিয়েছেন। প্রথমত: ১৯৫৫ সালের অক্টোবর- নভেম্বরের কোনো একত্রিত সংখ্যা প্রকাশিতই হয়নি। দ্বিতীয়ত এ বিষয়টি অক্টোবরের সংখ্যায়ও ছাপা হয়নি, নভেম্বরের সংখ্যায়ও নয়। মনে হয় যে ব্যক্তির কাছে এ আপত্তিটি শুনে আপনি নিজের তালিকাভুক্ত করেছেন, সে ব্যক্তির নিজেরই সঠিক বরাত জানা নেই। আসলে এ বিষয়টি "রাসায়েল ও মাসায়েল" দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহর বিধান রহিত হওয়া সংক্রান্ত কথা শুনে একজন সাধারণ মানুষের মনে যে সন্দেহ জাগে, সেই সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে ঐ জায়গাটিতে। সাধারণভাবে লোকেরা এরূপ প্রশ্ন তুলে থাকে যে, যেসব আয়াতে বর্ণিত বিধি রহিত হয়ে গেছে, সেসব আয়াত এখন কুরআনে থাকার কি দরকার? সেসব আয়াতের তেলাওয়াতও রহিত হলোনা কেন? এই প্রশ্ন নিরসনের জন্যই আমি কুরআনে এসব আয়াত অবশিষ্ট থাকার এই যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছি যে, সমাজে যদি আমরা আবার কখনো সেই ধরনের পরিস্থিতির

www.icsbook.info

সম্মুখীন হই, যে পরিস্থিতিতে ঐসব বিধি জারি করা হয়েছিল, তাহলে আমরা পুনরায় এগুলোকে কার্যকরী করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, মক্কী জীবনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ যেরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, কোনো দেশের মুসলমানরা যদি আবার সেই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তাহলে মক্কী যুগের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা কার্যকরী করতে হবে– মাদানী যুগের জিহাদ তথা সশস্ত্র সংগ্রামের শিক্ষা কার্যকরী করা হবেনা। অথচ অধিকাংশ তফসীরকার সশস্ত্র লড়াই এর শিক্ষা সম্বলিত আয়াতগুলো দ্বারা মক্কী যুগের আয়াতসমূহ রহিত হয়ে গেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে, উক্ত পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে মাদানী যুগে নাযিল হওয়া এমন বহু সংখ্যক আইন ও বিধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে যার বাস্তবায়ন ইসলামী সরকারের অবর্তমানে সম্ভব নয়। রহিত হয়ে যাওয়া বিধিসমূহকে পুনরায় বলবৎ করার কাজটি কোন আইন প্রণেতা প্রবর্তন করবেন? আপনার এ প্রশ্ন শুধু আমার উপর আরোপিত হয়না, বরং সেই সকল ওলামার উপরও আরোপিত হয়, যারা মাত্র কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্তও ইংরেজ আমলে জাতীয় কর্মকাণ্ডে মক্কী আয়াতসমূহ থেকে দিক নির্দেশনা লাভ করতেন এবং মাদানী যুগের যুদ্ধ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির বাস্তবায়নকে স্থগিত সাব্যস্ত করতেন।

বেহেশ্ত কোথায় অবস্থিত?

৪. আপনি এ প্রশ্নটির ব্যাপারে তরজমানুল কুরআনের যে সংখ্যার বরাত দিয়েছেন, সেই সংখ্যাটিতেই এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। ১৩৭৫ হি: রবিউল আওয়াল মাসের তরজমানুল কুরআন যদি আপনি নিজেই পড়ে থাকেন, যেমন আপনার প্রশ্ন থেকে মনে হয় তাহলে সেই উত্তর অবশ্যই আপনার চোখে পড়ার কথা। অতপর এ প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপনের কি দরকার ছিলো?

এ প্রসঙ্গে যেসব প্রশ্ন আপনি করেছেন, তার সবকটিরই উত্তর দেয়া সম্ভব। তবে আমি এ আলোচনাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাই স্বেচ্ছায় এটা উপেক্ষা করছি।[১] আদম আলাইহিস সালামকে যে বেহেশ্তে রাখা হয়েছিলো তা কোথায় অবস্থিত– এ প্রশ্নটি ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় তো নয়ই, এমনকি তার খুঁটিনাটি বিষয়ের পর্যায়েও পড়েনা। যদি কেউ নিছক কুরআন বুঝার চেষ্টায় এ সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করে তবে তা নিয়ে বড়জোর এতটুকু মাথা ঘামানো যেতে পারে যে, তার মতামত পছন্দনীয় হলে গ্রহণ নতুবা বর্জন করবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, আমাদের দেশে প্রতিটি বিষয় প্রথমে চুলচেরা

---

১. যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী, তারা নিজেরাই 'তফসীরে রুহুল মায়ানী (প্রথম খণ্ড, পৃ: ২১৪) এবং তফসীরে 'আলমানার' (প্রথম খণ্ড পৃ: ২৭৭) পড়ে দেখতে পারেন। এ বিষয়ে তফসীরকারদের কতো রকমের মতামত রয়েছে এবং প্রত্যেক মতের সপক্ষে যুক্তি কি তাও সেখান থেকে জানতে পারবেন।

www.icsbook.info

বিচার, আলাপ আলোচনা ও বির্তকের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। অতপর এই চুলচেরা বিচার ও তর্ক বিতর্ক এতদূর গড়ায় যে, বিষয়টাকে একটা মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপার বানিয়ে ফেলা হয় এবং তা নিয়ে দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। উভয় পক্ষের বিবি তালাক না হওয়া পর্যন্ত এই ঝগড়া থামেনা। এই মুছিবত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় এই যে, প্রথম স্তরেই প্রশ্নোত্তরের পালা সাঙ্গ করে দেয়া উচিত। যে বিষয়ে আপনার মনের তৃপ্তি হয়না, তা আপনি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে দিন। নিরর্থক আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার কি প্রয়োজন।

নবীগণের ত্রুটিমুক্ত (মাসূম) হওয়া সম্পর্কে

৫. নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) ত্রুটি ও পাপমুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে একটা মৌলিক বিষয়। আমার আপনার সকলের চেয়ে তাদের প্রেরণকারী আল্লাহ নিজে এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যেনো তাঁদের উপর পূর্ণ আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই আল্লাহই স্বীয় পবিত্র কিতাবে বিভিন্ন নবীর এমন কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেছেন, যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নবীকে পাকড়াও বা সতর্ক করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে আমাদেরকে এই বলে আশ্বস্তও করেছেন যে, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)-কে কখনো কোনো নগণ্যতম ত্রুটির উপরও স্থির থাকতে দেয়া হয়নি, বরঞ্চ তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে।[১] এই বাস্তব ব্যাপারটা যদি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, এ সব ত্রুটির কথা উল্লেখ করাতে নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) বিশ্বস্ততা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হয়না। তবে এর দ্বারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কি পার্থক্য তা উত্তমরূপে পরিস্ফুট হয় এবং আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাদেরকে কেউ যে আল্লাহর মতো গুণসম্পন্ন মনে করবে সে আশংকা আর থাকেনা।

৬. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের তরজমানুল কুরআনের ২৮০ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা

৭. এ বিষয়টি বুঝতে চাইলে আপনি আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহ.) এর কিতাব اعلام الموقعين এর নিম্নলিখিত অধ্যায়টি মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখবেন :

---

১. ইসলামী আইনের মৌলিক তত্ত্ব বিশারদগণও স্বীয় পুস্তকাদিতে একথাই বলেছেন যে, নবীর দ্বারা ছোটখাট ত্রুটি বা সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি সংঘটিত হতে পারে। তবে সেই ত্রুটি বা ভ্রান্তির উপর তার স্থির থাকা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তার সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। (দেখুন, উসূলুস সারাখসী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১৮, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫, ৮৬, ৯১)

www.icsbook.info

فصل فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الامنة والامكنه والاحوال والنيات والعوائل-

"স্থান, কাল, পরিবেশ ও পরিস্থিতি, উদ্দেশ্য ও ফলাফলের পরিবর্তন সাপেক্ষে ফতোয়ার পরিবর্তন ও বিভিন্নতা সংক্রান্ত অধ্যায়।" এতে তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও কার্যক্রম থেকে বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, বিভিন্ন ঘটনায় ইসলামের বিধান চোখ বন্ধ করে প্রয়োগ করা চলেনা। বরং সেজন্য স্থান, কাল ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত অবস্থা ও অন্য বহু রকমের জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। আপনি আমার উপস্থাপিত যে দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন, তার সব কয়টি সম্পর্কে এবং আরো বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হযরত হাওয়ার জন্ম বৃত্তান্ত

৮. পবিত্র কুরআনের কোথাও হযরত হাওয়াকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ মর্মে কোনো স্পষ্টোক্তি নেই। এ ধারণার সপক্ষে বড় জোর কুরআনের এ উক্তি উপস্থাপিত করা যায় :

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. "তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং একই ব্যক্তি থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন" (সূরা নিসা আয়াত-১) এবং جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. "একই ব্যক্তি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন" (সূরা আরাফ : আয়াত ৩৪)। কিন্তু এ উভয় আয়াতে যে 'মিনহা' শব্দটি রয়েছে, তার অর্থ এও হতে পারে যে, "একই ব্যক্তি থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন" আবার এও হতে পারে যে, "তারই শ্রেণী থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন।" সম্ভাব্য এ উভয় অর্থের কোন্‌টি অগ্রগণ্য হবে সে সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। বরং কুরআনের অন্য কয়েকটি আয়াত তো দ্বিতীয় অর্থেরই সমর্থক। যেমন সূরা রূমে বলা হয়েছে : وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. "আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, তিনি তোমাদের থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছে" (আয়াত ২১)।

সূরা শূরাতে বলা হয়েছে : جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. "তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য জুড়ি সৃষ্টি করেছেন" (আয়াত ১১)।

সূরা নহলের ৭২ নং আয়াতেও একই উক্তি করা হয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উক্ত তিনটি আয়াতেই "তোমার থেকে" কথাটি "তোমাদের গোত্র থেকে" অর্থেই গৃহীত হবে- এ অর্থে নয় যে, সকল মানুষের স্ত্রীকে তাদের স্ব স্ব

www.icsbook.info

পাজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম অর্থটা অগ্রগণ্য মনে করার কোনো ভিত্তি যদি থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে বুখারি ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-র বর্ণনা। তবে তার শব্দে কিছু হেরফের আছে। এক রেওয়ায়েতে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন :

المراة كالضلع ان اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.

"নারী পাঁজরের হাড়ের মতো (বক্র)। যদি তা সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা দ্বারা উপকৃত হতে চাও তবে ঐ বক্রতা বহাল থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে পারবে।"

অপর রেওয়ায়েতে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেছেন :

استوصوا بالنساء خير فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيئ فى الضلع اعلاه فان ذهبت ثقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا.

"নারীদের ব্যাপারে সদাচারের উপদেশ মেনে নাও। কেননা তাদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের সবচেয়ে বক্র অংশ হলো তার উপরের অংশ। তুমি যদি তাকে সোজা করতে চেষ্টা করো তাহলে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি রেখে দাও, তবে তা বক্রই থেকে যাবে। অতএব স্ত্রীদের ব্যাপারে সদাচারের উপদেশ মেনে চলো।"

উপরোক্ত দু'টি হাদিসের প্রথমটিতে তো স্ত্রীকে কেবল পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এতে স্ত্রীর পাঁজর থেকে সৃষ্টি হওয়ার উল্লেখ একেবারেই নেই। তবে দ্বিতীয় হাদিসে পাঁজর থেকে সৃষ্টির কথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। তবে লক্ষণীয় এই যে, এতে হযরত হাওয়া, কিংবা প্রথম নারী কিংবা অন্য কোনো বিশেষ নারীর কথা নয়, বরং সকল নারীর জন্য পাঁজর থেকে- একথা বলা হয়েছে।[১] এখন প্রশ্ন এই যে, বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার সকল নারী কি পাঁজর থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে? সবাই জানে যে, তা নেয়না। তাহলে একথা মানতেই হবে যে,

১. বুখারি শরীফের "কিতাবুন নিকাহ" (বিবাহ সংক্রান্ত অধ্যায়) থেকে এ হাদিস উদ্ধৃত। অপর যে রেওয়ায়েতটি ইমাম বুখারি "কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া" (নবীদের বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়)-তে উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভাষা হলো : فان المراة خلقت من ضلع "কেননা নারীকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" এ ক্ষেত্রে 'নারী' দুনিয়ার প্রতিটি স্ত্রীলোক এবং গোটা নারীজাতি। এর অর্থ পৃথিবীতে সৃজিত প্রথম নারী নয়। এ প্রসঙ্গে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, প্রশ্নকর্তা বুখারির বরাত দিয়ে [ا] خلقت من ضلع ا "আদমের পাঁজর থেকে নারী সৃজিত" - একথা উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এ উক্তিটি বুখারির কোথাও নেই।

www.icsbook.info

এখানে "পাঁজর থেকে সৃষ্টি হওয়ার" অর্থ পাঁজর থেকেই তৈরি হওয়া নয়, বরং এর অর্থ এই যে, তার সৃষ্টিতে পাঁজরের হাড়ের মতো বক্রতা বিদ্যমান। এর উদাহরণস্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত লক্ষণীয় خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. "মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।" এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, মানুষ বাস্তবিকপক্ষে তাড়াহুড়া থেকে জন্মলাভ করেছে। বরং এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতেই তাড়াহুড়া ও অস্থিরতার প্রবণতা নিহিত।

এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাঁজর থেকে হযরত হাওয়ার জন্মের ধারণাটা শুধু যে কুরআনের কোনো স্পষ্ট উক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়, তা নয়। বরং হাদিসেও তার সপক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। তবে একথা সত্য যে, বনী ইসরাঈল থেকে এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং বহু বড় বড় মনীষী একে শুধু গ্রহণই করেননি, বরং নিজ নিজ গ্রন্থাবলীতেও তা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সনদ ছাড়া কেবল বড় বড় মনীষীদের উক্তির বরাত দিয়ে একে একটি ইসলামী আকীদায় পরিণত করা এবং যে ব্যক্তি তা না মানবে তাকে গোমরাহ বলা কি সঙ্গত?

তূর পর্বত উত্তোলনের আরো ব্যাখ্যা

৯. তূর পর্বত উত্তোলন সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় (উর্দূ সংস্করণ) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি যা কিছু লিখেছি তা আর একবার মনোযোগ সহকারে পড়ুন। সেখানে কোথাও পর্বত উত্তোলনের কথা অস্বীকার করা হয়নি। শুধু একথাই বলেছি যে, কিভাবে উত্তোলন করা হয়েছিলো তা বিস্তারিতভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর। এর একটি পন্থা হলো পুরো পর্বতটা মাটি থেকে উপড়ে ফেলে শূন্যে উঠানো। দ্বিতীয় পন্থা হলো, পর্বতের মূল মাটি থেকে উপড়ে তাকে একদিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়ে দেয়া যে, পর্বতের আশপাশে দাঁড়ানো লোকদের উপর তা উবু হয়ে থাকে এবং তাদের মনে হয় যেন, তা এখন তাদের উপর আপতিত হবে। সূরা বাকারার رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ "তোমাদের উপর তুলে ধরলাম" বাক্যটি দ্বারা প্রথমোক্ত অর্থই সঠিক মনে হয়। পক্ষান্তরে সূরা আরাফের উক্তি كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ "পর্বতকে উপড়ে তাদের উপর তুলে ধরলাম, যেনো তা একটি মেঘখণ্ড এবং তারা ভাবলো যে, তা তাদের মাথার উপর এখনই পড়ে যাবে।" দ্বিতীয় অর্থটির প্রতি ইংগিত করে। 'নাতাকা' শব্দের অর্থ কোনো জিনিসকে উপড়ানো ও উত্তোলিত করা। কামুছ গ্রন্থে আছে نتقه زعزعه ونفضه, 'নাতাকা' অর্থ উপড়ানো ও শূন্যে উত্তোলন। ইমাম রাগেবের 'মুফরাদাত' গ্রন্থে আছে : نتق الشئ جذبه ونزعه حتى يسترخى 'নাতাকা' অর্থ কোনো

www.icsbook.info

জিনিসকে টান দেয়া ও উপড়ে ফেলা যাতে তা বন্ধনমুক্ত হয়। 'আছাছুল বালাগাহ' গ্রন্থে আছে : نتق البعير الرحل زعزعه ونتق الله الجبل رفعه فزعزعا فوقهم. নাতাকা শব্দটি উটের বেলায় ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হবে, তার পিঠের বোঝা ছিটকে ফেলে দিল। আর আল্লাহ কর্তৃক পাহাড়ের উপর প্রয়োগ করা হলে তার অর্থ হবে, তিনি পাহাড়কে টেনে উপড়ে ফেলে তাদের মাথার উপর উত্তোলন করলেন।" এ কারণে আমার মত এই যে, ঘটনার এ দুটো সম্ভাব্য প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো একটি সুনিশ্চিন্তভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি এ উভয় প্রক্রিয়াকে সমানভাবে সম্ভত মনে করে এবং কোনো একটি নির্ণয় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সে এমন কি অপরাধ করলো যে, তা নিয়ে এতো বাকবিতণ্ডা হবে? আরো দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, লোকেরা যে বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা করে, সে বিষয়টি আমার মূল বইতে খুঁজে দেখার কষ্টটুকুও করতে চায়না। কেবল লোকমুখে শুনেই হৈ চৈ শুরু করে দেয়। আপনার এই উক্তি যে, "একটি সর্ববাদীসম্মত বিষয়কে অস্পষ্ট আখ্যা দিয়ে তাকে সংশয়াপন্ন করে তোলার কি কারণ থাকতে পারে- বিশেষত ভাষা যখন এতো জোরদার যে, কুরআনের মূল ভাবধারার সাথে অধিকতর সংগতিশীল?" স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তাফহীমুল কুরআনের যে বক্তব্যটির উপর আপনি এতো কঠোর আপত্তি তুলেছেন, তা আপনি নিজে পড়েই দেখেননি। কেননা সেখানে আমি কোথাও একথা বলিনি যে, আমি যে অস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করছি তা কুরআনের মূল ভাবধারার সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। আপত্তি তুলতে গিয়ে আপনি যে মোটেই সাবধানতা অবলম্বন করেননি তার আরো একটা প্রমাণ এই যে, আপনি উত্তোলনের নিজস্ব ব্যাখ্যার সাফাই দিতে গিয়ে নির্দ্বিধায় বাইবেলের বরাত দিয়ে ফেলেছেন। অথচ এই ঘটনা সম্পর্কে বাইবেলের উক্তি আমি তাফহীমুল কুরআন দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় হুবহু উদ্ধৃত করেছি এবং তা আপনার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে তালমুদে যদি এ ধরনের কিছু আপনার চোখে পড়ে থাকে তবে অনুগ্রহপূর্বক তার উক্তিটির উদ্ধৃতি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

এক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস অথবা বিপুল সংখ্যক লোক কর্তৃক বর্ণিত নয় এমন হাদিস দ্বারা কি ঈমান ও কুফরীর ফায়সালা করা চলে?

১০. আপনি এ প্রশ্ন উত্থাপন করার বেলায়ও আমার পুরো কথা উদ্ধৃত করেননি। আমার বক্তব্যের একটি অংশ শুধু আলাদা করে নিয়েছেন। অনুগ্রহপূর্বক 'রাসায়েল ও মাসায়েল' প্রথম খণ্ডের ৬৬ থেকে ৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমি যে বক্তব্য পেশ করেছি, তা সম্পূর্ণ পড়ে দেখুন। অতপর হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম

www.icsbook.info

'শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সি' প্রণীত 'উসূলুস সারাখ্‌সি' গ্রন্থের নিম্নোক্ত বিবরণ অধ্যয়ন করুন, যা তিনি উক্ত বিষয়ে লিখেছেন। আশা করি, এতে করে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন যে, আমি যে মৌল তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছি, তা আমার মনগড়া নয়, বরং পূর্বতন মুসলিম চিন্তাবিদদের সময় থেকেই সর্বজন স্বীকৃত বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইমাম সাহেব 'খবরে ওয়াহেদ' (এক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস) সম্পর্কে লিখেছেন :

"খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অবগত হওয়া যায়না। কেননা সেক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে বর্ণনাকারী সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করার কারণে এবং বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত লোক বলে সুবিদিত হওয়ায় তার সত্যতার দিকটি প্রাধান্য লাভ করার কারণে এ ধরনের হাদিস এতোটা প্রামাণ্য সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তদনুসারে আমল করা অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ ধরনের হাদিস তার প্রামাণ্যতার শক্তি বলে এভাবে গৃহীত হয়ে থাকে যে, তাকে যে অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলে রায় দেয়া চলবেনা, কেননা তা দ্বারা অকাট্য বিশ্বাস জন্মেনা। তবে তদনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য। কেননা এ ধরনের হাদিস এতোটা প্রামাণ্য ও বিশ্বস্ত যে, তদনুসারে আমল করা জরুরি। এ ধরনের হাদিসকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে যদি কোনো কারণ না দর্শিয়ে স্বয়ং 'খবরে ওয়াহেদ'কেই মানতে অসম্মত হয়, তবে তাকে বিপথগামী বলে আখ্যায়িত করা হবে। কিন্তু সে যদি 'খবরে ওয়াহেদ' অনুসারে কাজ করা নীতিগতভাবে জরুরি মনে করা সত্ত্বেও কোনো হাদিসকে উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে অগ্রাহ্য করে তবে তাকে বিপথগামী বলা যাবেনা।"

অতপর তিনি 'খবরে মুতাওয়াতির' সম্পর্কে বলেন : 'খবরে মুতাওয়াতির'-এর সংজ্ঞা এই যে, এ ধরনের হাদিস এতো বিপুল সংখ্যক লোক কর্তৃক বর্ণিত হয় যে, এতো বিপুল সংখ্যক লোকের এবং বিভিন্ন এলাকার লোকের একটি মিথ্যা উক্তির ব্যাপারে একমত হওয়া অকল্পনীয়, আর বর্ণনাকারীদের এই সংখ্যাধিক্য আমাদের যুগ থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান। নামাযের সংখ্যা, নামাযের রাকাতের সংখ্যা, যাকাত ও নরহত্যার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী বর্ণনাকারীদের সংখ্যার এই বিপুলতার প্রেক্ষিতে উক্ত হাদিসকে মনগড়া বলে অভিযুক্ত করার কোনো অবকাশ থাকেনা, তখন এ ধরনের হাদিস এমন অকাট্য বিশ্বস্ত হাদিসে পরিণত হয় যেনো আমরা স্বয়ং তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনছি।

www.icsbook.info

এজন্য 'খবরে মুতাওয়াতির' বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিকাহ তত্ত্ববিদদের মতে নিশ্চিত ও অকাট্য তথ্য সম্বলিত বলে বিবেচিত (প্রথম খণ্ড পৃ. ২৮২-২৮৩)।

এরপর ইমাম সারাখ্সি এমন হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা মূলত খবরে ওয়াহেদের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বহুসংখ্যক রেওয়ায়েতে একটি অভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায় বলে সেই অভিন্ন বক্তব্য 'মুতাওয়াতির' এর পর্যায়ে উন্নীত হয়। পরিভাষায় এ ধরনের হাদিসকে 'খবরে মশহুর' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ উল্লেখ করার পর ইমাম সারাখ্সি যে মতকে অগ্রগণ্য মনে করেন তা নিম্নরূপ :

"ঈসা ইবনে আব্বাস (রহ.) বলেছেন যে, এ ধরনের হাদিস তিন প্রকারের। একটি হলো সেই হাদিস, যার অস্বীকারকারীকে বিপথগামী বলা যায়, কিন্তু কাফের বলা যায়না। উদাহরণস্বরূপ বিবাহিত ব্যভিচারীকে 'রজম' তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান সম্বলিত হাদিস। দ্বিতীয় প্রকারের হাদিস হলো, যার অস্বীকারকারীকে বিপথগামী বলা যায়না তবে ভ্রান্ত বলা যায় এবং সে গুনাহগার হবে বলে আশংকা ব্যক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ মোজার উপর মসেহ করার বৈধতা সংক্রান্ত হাদিস এবং একই জাতীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ লেনদেনে বাড়তি প্রদানের অবৈধতা সম্বলিত হাদিস। তৃতীয় প্রকার হলো সেই হাদিস, যার অস্বীকারকারীর গুনাহগার হওয়ার আশংকা না থাকলেও তার মতামতকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করা যায়। বিভিন্ন বিধিসম্বলিত বহুসংখ্যক হাদিসকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার গ্রাহ্যতা সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান" (প্রথম খণ্ড পৃ. ২৯৩)।

উপরোক্ত আলোচনা মনোনিবেশ সহকারে পড়লে আপনি অবহিত হবেন যে, ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে শুধু সেসব বর্ণনার উপর, যা অকাট্য ও সুনিশ্চিত প্রক্রিয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর এই প্রক্রিয়া হয় কুরআন, নচেৎ 'মুতাওয়াতের' হাদিস- যার শর্তাবলী ইমাম সারাখসি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 'খবরে ওয়াহেদ' ও 'খবরে মশহুর' শ্রেণীর যেসব হাদিস আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তার প্রত্যেকটি স্ব স্ব প্রামাণ্যতা সাপেক্ষে গুরুত্ববহ বটে। তবে তার কোনোটির গুরুত্ব এ পর্যায়ের নয় যে, তাকে ঈমানের অপরিহার্য অংগ বলে সাব্যস্ত করা চলে এবং তার অস্বীকারকারীকে কাফের আখ্যা দেয়া যায়। ইমাম মাহদী সম্পর্কে যেসব হাদিস বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাকে যদি হাদিস বিশেষজ্ঞীয় পদ্ধতিতে যাচাই করা হয়, তাহলে তার মর্যাদা এতোটুকুও দাঁড়ায়না, যতোটুকু মর্যাদার দাবিদার মোজার উপর মসেহ ও বাড়তি সুদী লেনদেন সংক্রান্ত হাদিস।

www.icsbook.info

'রজম' সংক্রান্ত আয়াত নিয়ে আরো আলোচনা

১১. আপনার এ প্রশ্নটি আমার কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসের মাসিক তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত আমার যে নিবন্ধটি নিয়ে আপনি আপত্তি তুলেছেন, সেটি আপনি আগাগোড়া পড়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন বলেও মনে হয়না। বুখারির যে হাদিসটি আপনি উল্লেখ করেছেন, তার ব্যাখ্যা আমি বিশদভাবে ৬নং প্যারাতে করেছি এবং তা উক্ত পত্রিকার ৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ওটা পড়ে দেখুন। তারপর বলুন, যে প্রশ্নটি আপনি তুলেছেন তার কোনো অবকাশ থাকে কিনা। এরপর প্রশ্ন থাকে হযরত উমর ফারুক (রা.) এর ভাষণ নিয়ে। এ সম্পর্কে আমি একটি শব্দও নিজের পক্ষ থেকে লিখিনি। আল্লামা আলুসী স্বীয় তফসীর গ্রন্থ রুহুল মায়ানীতে 'হেদায়া' গ্রন্থের প্রখ্যাত টীকাকার আল্লামা ইবনে হুমামের যে অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, তার অনুবাদ করেছি মাত্র। কিন্তু আপনার কাছে এ ক্ষেত্রেও আমিই দোষী সাব্যস্ত হলাম। উক্ত দুই মনীষীকে সম্বোধন করে আপনি কিছুই বললেননা। এ প্রসঙ্গে আপনার অধিকতর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মানোর খাতিরে নিবেদন করছি যে, সেই ভাষণে হযরত উমর (রা.) একথাও বলেছিলেন :

والرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف.

"পবিত্র কুরআনে প্রস্তরাঘাতে হত্যার দণ্ডটি সেই নারী ও পুরুষের জন্য অকাট্যভাবে নির্ধারিত, যে বিবাহিত হয়েও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, যখন তা সাক্ষ্য, গর্ভধারণ অথবা অপরাধির স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়।" উক্ত ভাষণে গর্ভধারণটাই প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। এ অংশটুকু অধিকাংশ ফিকাহবিদ মেনে নেননি। আল্লামা শওকানী 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"অধিকাংশ ফিকাহবিদের অভিমত এই যে, নিরেট গর্ভধারণ দ্বারা ব্যভিচারের শাস্তির যোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়না, বরং সেজন্য হয় ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রয়োজন, নচেৎ স্বীকারোক্তি প্রয়োজন। এ অভিমতের সপক্ষে তারা সেসব হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করান, যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকলে শাস্তি কার্যকরী করতে নিষেধ করে। মোটকথা, এটি হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি এবং এ থেকে এতোবড় বিধি প্রমাণিত হতে পারেনা, যা প্রাণ হননের কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে এ যুক্তি সঠিক নয় যে, হযরত উমর (রা.) একথাটা সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে

www.icsbook.info

বলেছিলেন এবং কেউ তাতে আপত্তি জানাননি। এ যুক্তি সঠিক নয় এজন্য যে, শ্রোতারা আপত্তি না তুললেই তা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমা) হবে, এটি কোনো ধরাবাধা কথা নয়।" (৭ম খণ্ড পৃ. ৮৮)

সুস্পষ্ট অপবাদের একটি দৃষ্টান্ত

১২. আপনার এ আপত্তি আসলে আপত্তি নয়, বরং সুস্পষ্ট অপবাদ। মনে হচ্ছে এ কথাটাও আপনি আমার আসল লেখা না পড়েই কেবল লোকমুখে শোনা অপপ্রচারে বিশ্বাস করেই নিজের আপত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক মিসতাহর ভরণপোষণের দায়িত্ব পরিত্যাগের ঘটনা আপনার বরাত দেয়া রবিউস সানী ৭৫ হি: তরজমানুল কুরআনে আদৌ প্রকাশিত হয়নি। এটি আসলে জমাদিউল আউয়াল, ৭৫ হি: তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আমি আভাস ইংগিতেও একথা বলিনি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর এ কাজটা অনৈসলামিক ভাবাবেগপ্রসূত ছিলো। আপনি উক্ত পত্রিকার ৩০৭ পৃষ্ঠার সমগ্র আলোচনাটি পড়ে বলুন যে, একথা কোথায় লেখা হয়েছে? আর তাতে একথাই বা কোথায় লেখা হয়েছে যে, এ কাজটি করার দরুন আল্লাহর তরফ থেকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে?

একই আপত্তি প্রসঙ্গে আপনি রবিউল আওয়াল ৭৫ হি. এর তরজমানের বরাত দিয়ে হযরত উমর (রাঃ) সংক্রান্ত আরো একটা উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ তরজমানুল কুরআনের রবিউল আওয়াল সংখ্যায় এ ধরনের কোনো কথাই ছাপা হয়নি। অনুগ্রহপূর্বক আপনি ঐ সংখ্যাটি পড়ে বলুন যে, আমার কোন্ লেখায় আপনি একথাটা পেলেন। আপনি তো সাহাবায়ে কেরামের মুহাব্বতের কথা বলেন। কিন্তু আমার মতে মানুষের মনে সর্বপ্রথম আল্লাহর ভয় থাকা উচিত।

অযৌক্তিক গোঁড়ামী

১৩. আমি কখনো নিজেকে ত্রুটিহীন মনে করিনি, তেমন দাবিও করিনি। নিজের উপর এবং নিজের প্রতিটি ব্যাপারে সমালোচনাকে আমি শুধু বৈধ মনে করি তা নয়, বরং আমি স্বয়ং তা আহ্বান করি ও স্বাগত জানাই। শুধু আমার কেন, জামায়াতে ইসলামীর কোনো ব্যক্তিরই একটি কথাও আপনি এই অভিযোগের সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করতে পারবেননা যে, ইসলামের ব্যাখ্যাদানকে আমরা শুধু নিজেদের একচেটিয়া অধিকার মনে করি অথবা নিজেদেরকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করি। কিন্তু আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে, আপনি ১৩ নং প্রশ্নে যা কিছু লিখেছেন, সম্পূর্ণ বিদ্বেষ ও হঠকারিতার ভিত্তিতেই লিখেছেন। যারা আমার বিরুদ্ধে হরেক রকমের মিথ্যা অপবাদ রটনা

www.icsbook.info

করেন, আমার বক্তব্যকে বিকৃত করে তার কদর্থ করেন এবং জঘন্য রকমের মিথ্যা অপবাদ রটনা করে শুধু গোমরাহ ও কাফের ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হননা, বরং জায়গায় জায়গায় বক্তৃতা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে আমার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে বেড়ান, তারা তো আপনার দৃষ্টিতে কেবল 'সমালোচক' এবং তাদের এসব কর্মকাণ্ড আপনার কাছে মোটেই আপত্তিকর বা দূষণীয় মনে হয়না। অথচ এ ধরনের হাজারো বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণের পর যদি কখনো জামায়াতে ইসলামীর কোনো ব্যক্তির মুখ দিয়ে বা কলম দিয়ে একটি কথাও উক্ত অপবাদ বা অপপ্রচারের জবাবে বেরিয়ে যায়, অমনি আপনি তাকে আক্রমণ বলে বিবেচনা করেন এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।

১৪. আপনার ১৩ নং প্রশ্নে 'সমালোচনা' শব্দটি আপনি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, সে অর্থে তো সাহাবায়ে কেরাম দূরে থাক, কোনো নগণ্যতম মানুষের সমালোচনা করাও আমার মতে মহাপাপ। তবে সমালোচনার যে অর্থ জ্ঞানীজনের কাছে সুবিদিত, সে অনুসারে আমি একমাত্র আল্লাহ ও নবীগণ ছাড়া আর কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করিনা। এমনকি কোনো সাহাবির কথা ও কাজ শুধুমাত্র বক্তা ও কর্তার ব্যক্তিত্বের নিরিখে, অর্থাৎ তিনি সাহাবি হওয়ার কারণেই প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া যায়না। বরং সেই কথা ও কাজের যুক্তি বা প্রমাণ দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, উক্ত কাজ ও কথা গ্রহণযোগ্য না প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে কোনো বিষয়কে যাচাই করার নামই সমালোচনা। আর এই সমালোচনা কোনো যুগে অবৈধ ছিলো বলে আমার জানা নেই। ইসলামী ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের আওতাভুক্ত বহু বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবির বিভিন্ন উক্তি ও কাজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পাই যে, তাবেঈন (সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণকারীগণ) তাবে তাবেঈন (সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শিক্ষা লাভকারীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীগণ) এবং মুজতাহিদ ইমামগণ (কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষার আলোকে স্বাধীন চিন্তা গবেষণাকারী মুসলিম মনীষীগণ) যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে তার মধ্য থেকে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি বর্জন করেছেন। আপনি ফিকাহ শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থরাজির মধ্য থেকে যে কোনোটি খুলে দেখুন, এ ধরনের সমালোচনার হাজারো দৃষ্টান্ত পাবেন। প্রশ্ন এই যে, এই সকল মনীষীবৃন্দ কি আপনার দৃষ্টিতে গুনাহগার ছিলেন? যারা সাহাবাদের বিভিন্ন কথা ও কাজের উপর এ ধরনের যুক্তি প্রমাণভিত্তিক যাচাই বাছাই করেছেন। 'আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রের মতো'[১] এই হাদিসের ব্যাখ্যা যদি আপনার কাছে এরূপ হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক সাহাবির প্রত্যেক কথা ও কাজ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, তাহলে প্রাচীন যুগের ও

১. উল্লেখ্য যে, এ হাদিসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

www.icsbook.info

পরবর্তী যুগের কোনো মুসলিম মনীষীকেই আমি এই অভিমত পোষণ করতে দেখিনি। আপনি যদি দেখে থাকেন তাহলে তাঁর নাম আমাকেও জানাবেন। তবে সামগ্রিকভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে কোনো না কোনো সাহাবীর কাছ থেকেই পথনির্দেশ লাভ করে এসেছেন এবং সম্ভবত: এই হাদিসটির এটিই বক্তব্য। (তরজমানুল কুরআন, রমযান ১৩৭৫ হি. মে ১৯৫৬)

দাসীর সংজ্ঞা এবং তার হালাল হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে দাসীর সংজ্ঞা কি দেয়া হয়েছে? বিবাহ ছাড়াই দাসীর সাথে সঙ্গম হালাল হওয়ার প্রমাণ কি?

উত্তর : কুরআনে দাসীর যে সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো : 'যে নারী শক্তি প্রয়োগে অর্জিত হয়।' যেহেতু কুরআন শক্তি প্রয়োগকে শুধু আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে সীমিত রেখেছে তাই কুরআনের সংজ্ঞার আলোকে দাসী শুধু সেই নারী, যে আল্লাহর পথে সংঘটিত যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের করায়ত্ত হয়।

এই সংজ্ঞা এবং এ ধরনের নারীর সঙ্গে সঙ্গম বৈধ হওয়ার প্রমাণ আমরা সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতে পাই :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের গর্ভধারিণীগণকে ------- এবং যে নারীরা বিবাহিতা, কেবল সেসব নারী ছাড়া, যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের ডান হাত।"

'ডান হাত' শব্দটি আরবি ভাষায় শক্তি, বিজয়, আধিপত্য, পরাক্রম ও বাহুবল অর্থে ব্যবহৃত হয়। দাসী সংক্রান্ত উপরোক্ত সংজ্ঞার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতই যথেষ্ট। এর সপক্ষে আরো যুক্তি এই যে, এ আয়াতে যে বিবাহিত নারীকে নিষিদ্ধ নারীর গণ্ডী বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধে জড়িত নয় এমন দেশের বিবাহিত নারী হতে পারেনা। কেননা আয়াতটির পটভূমি থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, এ ধরনের বিবাহিত নারী নিষিদ্ধ নারীর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং 'তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তারা ছাড়া' একথাটি দ্বারা অবশ্যই 'দারুল হরব' (যুদ্ধরত অমুসলিম দেশের) বিবাহিত নারীকেই বুঝানো হবে যারা যুদ্ধবন্দিনী হয়ে এসেছে।

তবে তাদের সাথে যে বিয়ে ব্যতিরেকেই সঙ্গম বৈধ তার প্রমাণ এই যে, যুদ্ধ বন্দিনীদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিবাহিত নারীদের গণ্ডী বহির্ভূত বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

www.icsbook.info

"এছাড়া অন্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা তাদেরকে আপন অর্থের বিনিময়ে বিয়ের মাধ্যমে অর্জন করবে – এভাবে নয় যে, যথেচ্ছ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে"। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, যুদ্ধবন্দিনী হয়ে দাসীত্ব বরণকারিণীদেরকে মোহর দিয়ে বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। মোহর দিয়ে বিয়ে করা ছাড়াই তারা বৈধ।

সূরা মুমিনুনের নিম্নোক্ত আয়াত কয়টিও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থক :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

"সেই মুমিনগণ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নামাযে একাগ্র ও বিনয়ী ----- এবং যারা আপন লজ্জাস্থানগুলো সংরক্ষণ করে – কেবল আপন স্ত্রী ও দাসীরা ব্যতীত। কেননা স্ত্রী ও দাসীদের থেকে লজ্জাস্থানকে যারা সংরক্ষণ করেনা, তারা তিরস্কার যোগ্য নয়"

এ আয়াতে মুমিনদের দুই ধরনের নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ করা হয়েছে। প্রথমত: তাদের স্ত্রীগণ। দ্বিতীয়ত: দাসীগণ। স্ত্রী বলতে যে বিবাহিত স্ত্রীই বুঝা যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এখন 'দাসী' শব্দ দ্বারাও যদি বিবাহিত স্ত্রীই বুঝায় তাহলে তাদেরকে স্ত্রীদের থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কাজেই এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হচ্ছে যে, দাসীদের সাথে শুধুমাত্র মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতেই সঙ্গম করা জায়েয। (তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৭৫ হি., জুন ১৯৫৬)

বহু বিবাহ এবং দাসীর প্রশ্ন

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"এতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবেনা বলে যদি আশংকা করো, তাহলে যে নারীকে ভালো লাগে বিয়ে করো, দুইজন, তিনজন অথবা চারজন করে। আর যদি আশংকা করো যে, ন্যায়বিচার করতে সমর্থ হবেনা, তাহলে একজন নারীকেই বিয়ে কর অথবা দাসীবাঁদী যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো।" (সূরা নিসা : আয়াত ৩)

জিজ্ঞাস্য এই যে, এই আয়াতে যে চার বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হলো তা কি শুধু সেই ব্যক্তির জন্য যে এতীম বালিকাদের অভিভাবক এবং এই বালিকাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারবেনা বলে আংশকা অনুভব করে?

www.icsbook.info

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, স্ত্রীদের বেলায় তো সংখ্যা নির্দিষ্ট রয়েছে এবং তা হলো সর্বোচ্চ চার স্ত্রী গ্রহণ করা চলে। কিন্তু দাসীদের সাথে স্বামী স্ত্রীর মতো সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তাদের কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এর কারণ কি? এর জবাব যদি এই হয়ে থাকে যে, যুদ্ধের সময় যেসব নারী বন্দিনী হয়ে আসবে তার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তাই দাসীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাহলে আমার বক্তব্য এই যে, নি:সন্দেহে একথা সত্য এবং এ দিকটি বিবেচনা করলে একজন মুসলমানের ভাগে কয়জন দাসী পড়বে, তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। একজনের অংশে দশজন আর একজনের অংশে বিশজনও পড়তে পারে। কিন্তু এসব দাসী বাঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তা সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যেতো। এক ব্যক্তির মালিকানায় দাসী যতোই থাকুক, সে তার মধ্য থেকে একজন বা দুইজনের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, যেমন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই স্বাধীনতা থাকার কারণে এক ব্যক্তি শুধু যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ হিসেবে বহুসংখ্যক দাসী লাভ করতে পারে তা নয়, বরং সে যতো সংখ্যক দাসী ইচ্ছা কিনতেও পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একজন ভোগবিলাসী পুঁজিবাদী যতোখুশি দাসী কিনবার এবং তাদের দ্বারা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। দাসীদের সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই তাদের সাথে যৌনাচারের অবাধ ও সাধারণ অনুমতি দেয়ার কারণে সমাজে ঠিক সেই অনাচারই ঢুকে পড়ে, যাকে ইসলাম ব্যভিচার আখ্যা দিয়ে কঠিন শাস্তির যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। আমার ধারণা এই যে, এ কারণেই মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সমাজে ব্যভিচারের দায়ে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড চালু থাকা সত্ত্বেও ভোগবিলাসের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। এই অনাচার রোধ করার মতো কোনো আইন ছিলনা। এ কারণে আমরা উমাইয়া ও আব্বাসী শাসকদের হেরেমে অগণিত দাসদাসীর সমাবেশ দেখতে পাই এবং এসব দাসদাসীর দ্বারা সংঘটিত বহু কুটিল ষড়যন্ত্রের কাহিনী ইতিহাসে পড়ি। সুতরাং আমার মতে, দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের অনুমতিও যদি সংখ্যা নির্ধারণ সহকারে দেয়া হতো তাহলে মুসলমানদের সমাজে অনাচার ও ভোগবিলাসের এমন ব্যাপক প্রচলন ঘটতোনা। যাই হোক, অনুগ্রহপূর্বক ব্যাখ্যা করুন যে, কোন্ কারণে ও কোন্ কল্যাণের স্বার্থে শরিয়ত দাসীদের উপভোগ করার অনুমতি দিতে গিয়ে সংখ্যা নির্ধারণ করেনি?

এই সাথে আরো একটা জিজ্ঞাসা এই যে, দাসী যদি মুশরিক হয় তাহলে তার সাথে যৌন সম্ভোগ কি জায়েয আছে?

www.icsbook.info

উত্তর[১] সূরা নিসার আয়াত وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى (তোমরা এতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা এরূপ আশংকা যদি বোধ করো) সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে বিস্তারিত টীকা লিখেছি। সেটার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আপনি বরঞ্চ উক্ত টীকা পড়ে দেখুন। তবে আয়াতটির তফসীর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এর কয়েকটা অর্থ হতে পারে এবং তা সাহাবা ও তাবেঈনদের থেকে বর্ণিত। একটি অর্থ এই যে, তোমরা যদি এতীমদের সাথে ন্যায়বিচার করতে সমর্থ না হও, তাহলে এমন নারীদেরকে বিয়ে করো, যাদের স্বামী মারা গেছে এবং ছোট ছোট এতীম শিশু রেখে গেছে। এ অর্থটা অধিকতর মানানসই বলে মনে হয়। কারণ এ সূরা ওহোদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয় এবং সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মুসলমান শহীদ হন। তবে ইসলামে যে চার বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে, একই সাথে চারটার বেশি স্ত্রী রাখা যে চলেনা, আর এই ঘোষণার সাথে যে এতীমদের কোনো সম্পর্ক নেই, সেকথা শুধু আলোচ্য আয়াত থেকেই জানা যায় না, বরং এ আয়াত নাযিল হওয়ার অব্যবহিত পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বাস্তব ও বাচনিক ব্যাখ্যা দেন তা থেকেও তা বুঝা যায়। এ আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন তিনি চারটের বেশি স্ত্রী যাদের ছিলো তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, চারের অতিরিক্ত যে কয়জন স্ত্রী আছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে এবং শুধুমাত্র চারজন স্ত্রী বহাল রাখতে। অথচ এখন এতীমদের কোনো সমস্যা নিয়ে

---

১. এ ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তর দ্বারা লোকেরা অনেক সময় এরূপ ধারণা করে বসে যে, এসব সমস্যা বোধ হয় বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য আলোচিত হচ্ছে। অথচ মূলত: এ ধরনের সমস্যা এমন একটি যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট, যখন পৃথিবীতে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের রীতি প্রচলিত হয়নি। এমনকি পণের বিনিময়ে আপোষ রফা করাও শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর পক্ষে দু:সাধ্য ছিলো। বর্তমান সময়ে এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা একন দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার খুলতে চাই। এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যে যুগে যুদ্ধবন্দী বিনিময় ও পণের মাধ্যমে আপোষ রফা করা সম্ভব ছিলনা, সে যুগে ইসলাম এই জটিল সমস্যার সমাধান কিভাবে করেছিল তা বিশ্লেষণ করতে চাই। তাছাড়া ইসলামের প্রবর্তিত এই সমাধানগুলো নিয়ে অজ্ঞ লোকেরা যেসব আপত্তি উত্থাপন করে থাকে তা নিরসন করাও এর একটি অন্যতম লক্ষ্য। আমরা যখনই এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি এ উদ্দেশ্যেই করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে তৎপর এক শ্রেণীর লোক জেনেবুঝে এর এরূপ কদর্থ করে থাকে যে, আমরা আজকাল এ যুগেও দাসদাসী প্রথা চালু রাখতে ইচ্ছুক, চাই বন্দী বিনিময় এবং পণের আদান প্রদান সম্ভব হোক বা না হোক। আমরা জানি, এই শ্রেণীর লোকেরা কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে একথা বলেনা। আমরা তাদের কাছে এতটা লজ্জাশরমেরও আশা করিনা যে, আমাদের পক্ষ থেকে এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার পর তারা তাদের অপপ্রচারে ক্ষান্ত হবে। তা সত্ত্বেও এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এজন্য করা হচ্ছে যে, যেসব সরলপ্রাণ মানুষ তাদের অপপ্রচারে কোনো বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন, তাদের বিভ্রান্তি অপনোদিত হোক।

www.icsbook.info

আলোচনা হচ্ছিলনা। তাছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বহু সাহাবি উক্ত চারের সীমার ভেতরে একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তিনি তাদের কাউকে একথা বলেননি যে, তোমার যখন এতীম শিশু লালন পালনের দায়িত্ব নেই, তখন তোমার এই অনুমতি কাজে লাগানোর অধিকার নেই। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে নিয়ে পরবর্তী সময় পর্যন্ত সকল মুসলিম আইনবেত্তা একথাই বুঝেছেন যে, এ আয়াত এক সাথে চারটি বিয়ে করার অনুমতি দেয়। চারটির বেশি বিয়ে কোনোক্রমেই বৈধ নয়। তাঁরা এটাও বুঝেছেন যে, চারটি বিয়ের অনুমতি শর্তহীন। এতীমদের কোনো দায়দায়িত্ব এর জন্য শর্ত নয়। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক বিয়ে করেছেন এবং তার কোনোটির সাথেই এতীমদের বিষয় জড়িত ছিলনা।

দাসীদের ব্যাপারে আপনি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, দাসী রাখার ব্যাপারে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা না থাকুক, তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সংখ্যা নির্ধারণ করা উচিত ছিলো। এ প্রস্তাবে আপনি শুধু একটি দিক লক্ষ্য রেখেছেন, অন্যান্য দিক আপনি ভেবে দেখেননি। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সংখ্যা নির্ধারণ করা হতো, তারা বাদে অবশিষ্ট নারীদের সমস্যার কি সমাধান দেয়া যেতো? পুরুষের সংসর্গ লাভের সুযোগ থেকে কি তাদেরকে চিরতরে বঞ্চিত রাখা হতো? না তাদেরকে গৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরে আপন যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য অবৈধ উপায় অনুসন্ধানের স্বাধীনতা দেয়া হতো? অথবা তাদেরকে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে মালিকদেরকে আইনত: বাধ্য করা হতো এবং বন্দিনী নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব ছাড়াও তাদের উপর বাড়তি এ দায়িত্বটাও অর্পণ করা হতো যে, দাসীদেরকে বিয়ে করতে রাজী হয় এমন স্বামীও তারা খুঁজে বেড়াবে?

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের জন্য তাদের আহলে কিতাব হওয়া শর্ত নয়। যুক্তির নিরিখেও এরূপ শর্ত আরোপ করা বাঞ্ছনীয় ছিলনা। তা যদি হতো তাহলে যুদ্ধবন্দীদেরকে (বন্দী বিনিময়ের সম্ভাবনা না থাকা অবস্থায়) ব্যক্তি মালিকানায় সমর্পণ করা ও মালিকদেরকে তাদের সাথে যৌন সম্ভোগের অনুমতি প্রদানের পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, তার অর্ধেকের বেশি ব্যর্থ হয়ে যেতো। কেননা সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেসব নারীকেই মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতো, যারা আহলে কিতাব তথা ইহূদী বা খৃষ্টানদের মধ্য থেকে বন্দিনী হয়ে এসেছিলো। যারা আহলে কিতাব নয় তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হলে মুসলমানদের অন্য আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। সেটি

www.icsbook.info

এই যে, বন্দিনী নারীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটা অতিরিক্ত সমস্যায় পরিণত হওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? (তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৭৫ হি:, জুন ১৯৫৬)

'সপ্ত আকাশ' এবং 'তূর পাহাড় উত্তোলণ' এর সঠিক ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : সূরা আল বাকারার ৩৪ টীকায় আপনি লিখেছেন : "সপ্তাকাশ" (সাবআ সামাওয়াত) শব্দের সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন।' এতে মনে হচ্ছে, আপনি সাত আকাশের কথা অস্বীকার করছেন। কিংবা এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপনি তেমনি ভুল করেছেন, যেমনি ভুল বর্তমান রয়েছে অন্যান্য তফসীরে। অথবা ভুল যদি আপনার নাই হয়ে থাকে তবে আপনি কেন লিখেছেন : এর অর্থ হয়তো এরূপ, নয়তো ঐরূপ হবে। আপনি সুস্পষ্টভাবে কোনো একটি অর্থকে স্বীকৃতি দেননি কিংবা কোনো একটি অর্থকে অস্বীকার করেননি।

একইভাবে সূরা আল বাকারার ৮১ টীকায় যে বাক্য আপনি লিখেছেন তা থেকে বুঝতে পারছি যে, আপনি তূর পাহাড় উত্তোলনকে অস্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারেও স্পষ্টভাবে বলুন এ বিষয়টি আপনি স্বীকার করেন নাকি অস্বীকার করেন?

উত্তর : আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, সপ্তাকাশের সঠিক তাৎপর্য যদি কারো জানা থাকে, তবে মেহেরবানী করে তিনি যেনো তা বলে দেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এটাই যে, এর সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন। কোনো এক নির্দিষ্ট যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কেউ যদি একথা দাবি করে যে, বর্তমান যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞান যা বলছে, 'সপ্তাকাশ' বলতে কুরআন তাই বুঝাচ্ছে, তবে সে মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও মতবাদ বারবার পাল্টে যাচ্ছে। তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ও মতবাদকে কুরআনের প্রতি আরোপ করা কিছুতেই সঠিক কাজ হতে পারেনা। আপনারা আপনাদের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিজেরা এবং ছাত্রদের পড়ান এবং যার ভিত্তিতে প্রাচীন মুফাস্সিরদের অনেকেই 'আকাশের' হাকিকত বর্ণনা করেছেন, তা এখন দীর্ঘকালের ব্যবধানে বস্তাপঁচা মতবাদে পরিণত হয়েছে। নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সেকালের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জগতই পাল্টে দিয়েছে। বর্তমান যুগে যদি আপনারা সেগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন তবে মারাত্মক ভুল করবেন। আর সেগুলোকে যদি কুরআনের প্রতি আরোপ করেন তাহলে মানুষের ঈমান বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

সূরা আল বাকারার ৮১ টীকা এবং ৮৩ আয়াতের তরজমা পড়ে যদি আপনি এরূপই বুঝে থাকেন যে, আমি তূর পাহাড় উত্তোলনের কথা অস্বীকার করেছি,

www.icsbook.info

তবে আল্লাহ্ আপনার বুঝ জ্ঞানের প্রতি রহম করুন এবং আমার অবস্থার প্রতিও। মেহেরবানী করে সে বাক্যগুলো পুনরায় পড়ে দেখুন যেগুলো দ্বারা আমি তূর উত্তোলনের কথা অস্বীকার করেছি বলে আপনার মনে হচ্ছে। আমি তো শুধু একথাই বলেছি যে, এর বিস্তারিত ধরন পদ্ধতি জানা কঠিন। এর কারণ হচ্ছে, কুরআন এই ঘটনাকে দুই জায়গায় দু'টি ভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় 'রফে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ উত্তোলন করা। আর অপর স্থানে 'নতক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ উপড়ে ফেলা এবং এক দিকে কাত করে দেয়া। এ কারণে একথা নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না যে, পাহাড়কে সম্পূর্ণ উপরে উঠানো হয়েছিলো নাকি একদিকে ঝুঁকিয়ে তাদের মাথার উপর পড়ে পড়ে মতো কাত করে দেয়া হয়েছিলো। (তরজমানুল কুরআন : শাওয়াল ১৩৭৫ হি: জুন ১৯৫৬ ইং)

বরযখের জীবন ও মৃতেরা শুনতে পায় কিনা

প্রশ্ন : আমি তাফহীমুল কুরআন পড়ছি। আলহামদুলিল্লাহ্ কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু বেশ চমৎকারভাবে বোধগম্য হয়। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় বেশ জটিলতা অনুভব করছি। সেগুলো পেশ করে দিচ্ছি। মেহেরবানী করে এই জটিল গ্রন্থিগুলোর রহস্য উন্মোচন করে আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবেন। এই বিষয় ক'টি আরজ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আমি আপনার রচনা রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম ও ২য় খণ্ড এবং তাফহীমাত ১ম ও ২য় খণ্ড গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছি। এ বইগুলোয় আপনি যে সমস্ত আয়াত ও হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন দলীল প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে সেগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট করেছেন। তাই আমি আশা করি আমার উপস্থাপিত বিষয়গুলোও আপনি প্রমাণ সহকারে বুঝাবার চেষ্টা করবেন।

১. আপনি সূরা ইউনুসের فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ. আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন : "অর্থাৎ যেসব ফেরেশতা, জিন ও রূহ, পূর্ববর্তী মনীষী ও পূর্বপুরুষগণ এবং আম্বিয়া, আওলিয়া ও শহীদগণ ইত্যাদিকে আল্লাহর গুণাবলীর অংশীদার করে নেয়া হয়েছে এবং যাদের এমন সব অধিকার আদায় করা হয়েছে যা আসলে আল্লাহর অধিকার ছিলো, তারা সেখানে তাদের পূজারীদের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দেবে[১]: তোমরা যে আমাদের ইবাদত করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোনো আহ্বান, আকুতি, দোয়া, ফরিয়াদ ও নযর নিয়ায, কোনো প্রসাদ, প্রশংসা ও গুণকীর্তন এবং

১ তখন তাদের সেই মাবুদরা তাদের সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দেবে : "তোমরা মিথ্যাবাদী।"

www.icsbook.info

আমাদের নামের জপতপ, আমাদের উদ্দেশ্যে কোনো সাজদা, আস্তানা চুম্বন ও মাজারে ধর্ণা দেয়া আমাদের কাছে আসেনি।

এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, আওলিয়ায়ে কেরাম ইত্যাদি যতো লোক ইতিপূর্বে মারা গেছেন তাদের কবরে ও মাজারে গিয়ে লোকেরা যতোই কান্নাকাটি করুক এবং নিজেদের অভাব অভিযোগ নিয়ে যতোই বিলাপ ও হাহুতাশ করতে এবং মিনতি জানাতে থাকুক না কেন তারা এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারেননা, তারা এসবের কিছুই শুনতে পাননা। কুরআনেরই বহু আয়াতে এই বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেমন সূরা নাহলের وَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُوْنَ. আয়াতের ব্যাখ্যায় আপনি সুস্পষ্ট করেছেন। এছাড়াও اِنَّكَ لاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ. আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদিস আলোচনা করলে স্পষ্ট জানা যায়, মৃতেরা শুনতে পায় এবং যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে ও সালামের জওয়াব দেয়। এখানে এসে মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং চিন্তা খেই হারিয়ে ফেলে। কোনো সঠিক অর্থ বের করা সম্ভব হয়না এবং কোনো সঠিক ব্যাখ্যাও বোধগম্য হয়না। তাই এই বিষয়বস্তু সম্বলিত কয়েকটি হাদিস পেশ করছি। মেহেরবানী করে এ হাদিসগুলোর অর্থ বর্ণনা করে জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে সাহায্য করবেন।

১. বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের اَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ. مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا. (অর্থাৎ তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা যথার্থ পাওনি?) বলা এবং সে প্রসঙ্গে হযরত উমর রাদি আল্লাহু আনহুর একথা জিজ্ঞেস করা يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَكَلَّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لِلْاَرْوَاحَ لَهَا- (হে আল্লাহর রসূল! এমন দেহাবয়বের অধিকারীদের সাথে আপনি কথা বলছেন যাদের প্রাণ নেই), আবার তার জবাবে রসূলের একথা বলা مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ. (যখন আমি তাদের সাথে কথা বলি তখন কি তোমরা শোনোনা?) সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মৃতেরা শুনতে পায়। হযরত আয়েশা (রা.) এ হাদিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে হযরত উমরের সওয়াল ও রসূলের জওয়াবের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়না।

২. ইবনে আবদুল বার হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল হক বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই যে হাদিসটি 'মরফূ' বর্ণনা করা হয়েছে, এর সনদ সহীহ: "কোনো ব্যক্তি যখন তার মুমিন ভাইয়ের কবরের কাছে যায়, যাকে সে

www.icsbook.info

দুনিয়ায় চিনতো, তাকে সালাম করলে সে তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের জবাব দেয়।"[১]

৩. বুখারি ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী : "যখন কোনো বান্দাকে তার কবরে রেখে আসা হয় এবং তার সাথীরা তাকে ছেড়ে চলে আসতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।"

অন্য যে বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে- সূরা নাহলের

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ مِنْ شَيْءٍ وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন এখানে যেসব কৃত্রিম মাবুদদের নাকচ করা হচ্ছে তারা ফেরেশতা, জিন, শয়তান বা কাঠপাথরের তৈরি মূর্তি নয়, বরং তারা হচ্ছে কবরের বাসিন্দা। আবার কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে বলেছেন : নি:সন্দেহে এই আয়াতে উদ্ধৃত "আল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি" বাক্যাংশে নবী, ওলী, শহীদ ও সালেহীন তথা সৎ লোকদের এবং অসাধারণ মনীষীদের কথা বুঝানো হয়েছে ....।" এখন সমস্যা হচ্ছে সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা শহীদদের মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। বলা হয়েছে :

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ.

"আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারছোনা"। ঐ একই সূরায় আবার আল্লাহ কেন শহীদদের "আমওয়াতুন গায়রু আহইয়া" (তারা মৃত, জীবিত নয়) বললেন? আপাত দৃষ্টিতে আপনার ব্যাখ্যার আলোকে এই দু'টি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে।

'তারা মৃত, জীবিত নয়'- এ বাক্যের আওতায় আপনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদেরও ফেলেছেন। অথচ অনেক হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবীগণ কবরের মধ্যে এই মরদেহসহ জীবিত রয়েছেন। তাঁরা নামাযও পড়েন, সালাম

---

১. وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ.

"অবশ্যি তুমি মৃতদের তোমার কথা শুনাতে পারবেনা, আর যারা কবরে শায়িত রয়েছে তাদের তুমি শুনাতে পারবেনা। যদি তোমরা তাদের ডাকো তাহলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পাবেনা। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকের জবাব দিতে পারবেনা এবং তাদের ডাক সম্পর্কে বেখবর, তাদের চাইতে বেশি বিভ্রান্ত ও গোমরাহ আর কে হতে পারে?"

www.icsbook.info

শুনেন এবং এর জবাবও দেন। اَلْاَنْبِيَاءُ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ (নবীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে নামায পড়ছেন)। مَرَرْتُ بِمُوْسٰى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهٖ আমি মূসার কাছ দিয়ে গেলাম তখন তিনি তাঁর কবরের মধ্যে নামায পড়ছিলেন।

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهٗ (যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি তা শুনতে পাই এবং যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়)।

এমনকি কোনো কোনো বুজর্গ এমন কথাও বলেছেন যে, ওফাতের পর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠোঁট নড়েছিল এবং জানাযার সময় তিনি কথা বলে উঠেছিলেন : بيراريس وما بيراريس سوف تعلمون এবং কবরের মধ্যেও তিনি কথা বলেন। কোনো কোনো সাহাবা একথা শোনেন। এতো ছিলো ওফাতের পর তাৎক্ষণিক কথাবার্তা তখনো রূহ দেহকে পুরোপুরি ত্যাগ করেনি। কিন্তু এর পরে হাশরের ময়দানে উপস্থিতি পর্যন্ত দেহের সাথে রূহের ঐ একই সম্পর্ক কায়েম থাকবে। যাক বুজর্গদের কথা ছেড়ে দিন। উপরে বর্ণিত তিনটি হাদিস আপনার ব্যাখ্যার বিরোধী। মেহেরবানী করে এর ব্যাখ্যা করবেন।

উত্তর : আপনি যে সমস্যার উল্লেখ করেছেন আপাত দৃষ্টিতে তা বেশ জটিল মনে হয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা ভাবনা করলে সমস্ত জটিল গ্রন্থি খুলে যায়। মৃত্যু সম্পর্কে তো সাধারণ বুদ্ধি জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ থেকে একথা সবাই জানে যে, দেহ ও প্রাণের মধ্যকার সেই সম্পর্ক বিচ্ছেদকেই মৃত্যু বলা হয় যাকে সাধারণ পরিভাষায় বলা হয় জীবন। এই অর্থে বলতে গেলে নবী, ওলী ও শহীদ সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। শরিয়ত তাদের মাটির মধ্যে দাফন করার অনুমতি দেয়। তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করে (অথবা নবীদের সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করতে নিষেধ করে)। তাদের বিধবা স্ত্রীদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দেয় (অথবা নবীদের স্ত্রীদের জন্য এটা হারাম করেছে– এজন্য হারাম করেনি যে, তাঁদের স্বামীরা জীবিত রয়েছেন। বরং হারাম করার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁরা উম্মতের মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত)। এছাড়াও শরিয়ত তাঁদের জন্য মৃত্যু, ওফাত বা হত্যা ও নিহত হওয়ার শব্দ ব্যবহার করে। এখন নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁদের জন্য যে জীবন প্রমাণিত তা জীবন বলতে সাধারণ অর্থে যা বুঝায় তা থেকে আলাদা। এই সত্যটি সামনে রেখে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য বিষয় চিন্তা করলে সহজে বুঝা যাবে যে, এখানে উল্লেখিত জীবন অর্থ বরযখের জীবন। বিভিন্ন দলের জন্য এর পর্যায়ভেদ হতে পারে। আর এখানে যে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করা হয়েছে তা হচ্ছে ধ্বংস ও অস্তিত্বহীনতা। প্রচলিত অর্থে মৃত্যুর অর্থে মৃত্যুর কথা এখানে অস্বীকার করা হয়নি।

www.icsbook.info

আমি আগেই বলেছি, এই বরযখী জীবনের ধরন প্রত্যেক দলের জন্য আলাদা। এখানে কাফির ও ফাসিক ফাজেরদের জীবন আলাদা। তারা এখানে আটক কয়েদীদের জীবন যাপন করবে। এখানে তাদের সমগ্র জীবনকাল কেবল আযাবে পরিপূর্ণ। পুরস্কার, অনুগ্রহ ও দয়া দাক্ষিণ্যের কোনো অবকাশই সেখানে নেই। আল্লাহ তাদেরও শুনান, কিন্তু কোনো সুখবর নয়। এমন সব কথা তাদের শুনান যেমন বদরের যুদ্ধে নিহতদের রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুবারক কণ্ঠ থেকে শুনিয়েছেন, যাতে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যায়। তাদের মধ্য থেকে কোনো লোক যদি দুনিয়ায় পূজিত হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তাদের তা শুনার কোনো সুযোগ দেননা কারণ এতে তারা আরাম পাবে। বিপরীত পক্ষে আম্বিয়া, আওলিয়া, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের জীবন হবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানদের মতো। আখেরাতের ফায়সালার পূর্বেই তাঁরা আতিথ্য লাভের মহান পুরস্কারে ভূষিত হবেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য আরাম ও আনন্দ লাভের যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন এবং কষ্টদায়ক প্রত্যেকটা জিনিস থেকে তাদের সংরক্ষিত রাখবেন। তাদের যা কিছু শুনার সুযোগ দেয়া হয় তা হচ্ছে দুনিয়াবাসীদের সালাম ও দরুদ। জাহেল ও মূর্খ লোকেরা তাদের সম্পর্কে যেসব শিরকী কথাবার্তা বলে ও কাজ কারবার করে সেগুলো শুনার সুযোগ তাদের দেয়া হয়না। কারণ এগুলো তাদের আনন্দ দেবেনা, বরং তাদের মনোকষ্টের কারণ হবে। একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে যেসব বুজর্গ তাঁদের সারা জীবন শিরক খতম করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তাঁরা যদি একথা শুনেন যে, তাঁদেরকেই আজ অভাব পূরণ করা ও সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য ডাকা হচ্ছে, তাহলে দুনিয়ার আর কোনো জিনিস তাদের কাছে এর চাইতে বেশি কষ্টদায়ক মনে হবেনা। তাই এসব কথা তাদের শুনিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের আরাম ও আনন্দ কখনোই নষ্ট করবেননা।

আশা করি এ ব্যাখ্যার পর কুরআনের আয়াত ও হাদিসের মধ্যে আপনি আর কোনো বিরোধ অনুভব করবেননা। উভয় স্থানে একই সত্যের দু'টি বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু কোথাও কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের মধ্যখানের সংযোগ লাইনটি উল্লেখিত হয়নি তাই আপাত দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত আলোচনাগুলো একত্র করে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়া হলে মাঝখানের এই সংযোগ সূত্রটি তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে পড়ে এবং এভাবে বাহ্যিক বিরোধেরও অবসান ঘটে। (তরজমানুল কুরআন : রজব ১৩৭৫ হি:, মার্চ ১৯৫৬ ঈসায়ী)

www.icsbook.info

পবিত্র কুরআনের পঠন রীতিতে পার্থক্য

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধানে আপনার পথনির্দেশ চাই। আশা করি বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিশ্লেষণ করবেন।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে একদিকে তো বলা হয় যে, কুরআন যে আকারে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছিল, অবিকল সেই আকারেই বর্তমান রয়েছে। তাতে একটি জের জবরেরও পরিবর্তন ঘটেনি। অপরদিকে বিভিন্ন প্রামাণ্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো আয়াত বিভিন্ন প্রকারে পঠিত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে জের, জবর ও পেশের পার্থক্য ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। এমনকি কোথাও কোথাও বাচনিক পার্থক্যের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত বক্তব্যই যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে পঠন রীতির পার্থক্য একটা অর্থহীন ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আলেম সমাজ কর্তৃক কুরআন পঠনের পার্থক্য সমর্থন করাটা আমার বুঝে আসেনা। আর যদি দ্বিতীয় বক্তব্য সঠিক ধরে নেয়া হয়, তাহলে কুরআনের বিশুদ্ধতা ব্যাহত হয় বলে প্রতীয়মান হয়। জের, জবর, পেশের পার্থক্য দ্বারা আরবির কতো পার্থক্য হয়ে যায়, সে তো আপনার জানাই আছে।

এখানে আমি একথাও বলে দিতে চাই যে, হাদিস অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ নেই। আমি শুধু বিষয়টা বুঝবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

উত্তর : একথা সম্পূর্ণ ও অকাট্য সত্য যে, পবিত্র কুরআন যে আকারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাযিল হয়েছিল, অবিকল সে আকারেই তা আজও বিদ্যমান। এতে বিন্দু পরিমাণও কোনো পরিবর্তন ও রদবদল হয়নি। তবে সেই সাথে এ কথাও সত্য যে, কুরআনের পঠন রীতিতে মতভেদ ও পার্থক্য ছিলো এবং এখনও আছে। যারা এ ব্যাপারটা যথারীতি তাত্ত্বিকভাবে অধ্যয়ন করেননি তারা কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেই বেধড়ক রায় দিয়ে ফেলেন যে, এই দুটো কথা পরস্পর বিরোধী এবং এটা অনিবার্য যে, এর যে কোনো একটাই সঠিক হতে পারে– উভয়টি নয়।

অর্থাৎ তাদের মতে, কুরআন যদি সঠিক ও যথাযথভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকেই পৌঁছে থাকে, তাহলে পঠন রীতিতে বিভিন্নতা থাকার কথা ভুল। আর যদি পঠন রীতির বিভিন্নতার কথা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ মাফ করুন, কুরআন আমাদের কাছে সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে পৌঁছেনি।

www.icsbook.info

অথচ মতামত প্রকাশের আগে তারা যদি কিছু জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেন তাহলে নিজেরাও ভুল বুঝাবুঝি থেকে বেঁচে যেতে পারেন, আর অন্যদেরকেও বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করার দায় থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, যে লিখন রীতি অনুসারে সর্বপ্রথম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন অতপর হযরত আবু বকর প্রথম কুরআন শরীফকে পুস্তকাকারে সংকলিত করেছিলেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হযরত উসমান (রা.) পুস্তকাকারে পুন:সংকলিত করে প্রকাশ করেছিলেন, তাতে জের, জবর, পেশ তো ছিলইনা, এমনকি নুকতাও ছিলনা। কেননা তখন পর্যন্ত এসব সাংকেতিক চিহ্ন উদ্ভাবিতই হয়নি। সেই লিখন রীতি অনুসারে সমগ্র কুরআনের বাক্যগুলো এভাবে লেখা হয়েছিল :

كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

আরবি ভাষাভাষীরা এ ধরনের লিখন রীতিতে লেখা বাক্যগুলো আন্দাজ করে পড়ে নিতো এবং অর্থপূর্ণ বানিয়েই পড়তো। তবে যেখানে সমার্থবোধক শব্দ আসতো অথবা আরবি ব্যাকরণ ও চলতি বাকধারা অনুসারে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ ও জের জবর ব্যবহার সম্ভব হতো, সেখানে স্বয়ং আরবি ভাষাভাষীরাও প্রায়ই বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতো। ফলে লেখকের মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্য কি সেটা উদ্ধার করাই কষ্টকর হয়ে যেতো। উদাহরণস্বরূপ কোনো বাক্য যদি এভাবে লেখা হতো : ربنا بعلس اسفاريا -

তাহলে তাকে এভাবেও পড়া যেতো : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا

আবার এভাবেও পড়া যেতে পারতো : رَبَّنَا بَعَّدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا

অনুরূপভাবে একটি বাক্য যদি এভাবে লেখা হয় : انظر الى العظام كيف ننشرها

তাহলে তা এভাবেও পড়া যেতো : اُنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا

আবার এভাবেও পড়া যেতো : كَيْفَ نُنْشِرُهَا.

এই বিভিন্নতা তো হতে পারতো স্বয়ং আরবি ভাষাভাষীদের মধ্যে। কিন্তু এভাবে লিখিত একটি আরবি বাক্য যদি অনারব ভাষাভাষীদের পড়তে হতো, তাহলে তারা তাতে এমন মারাত্মক ভুল করে বসতো, যা বক্তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করতো। উদাহরণস্বরূপ একবার কোনো এক অনারব اِنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ এ আয়াতটিতে وَرَسُوْلُهٗ শব্দটি رَسُوْلِهٖ পড়লো। এর অর্থ দাঁড়ালো :

www.icsbook.info

'আল্লাহ মুশরিকদেরও ধার ধারেন না, স্বীয় রসূলেরও ধার ধারেন না' (নাউযুবিল্লাহ)।

তাছাড়া এও একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, কুরআনে জের, জবর ও পেশ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব করেন বসরার গভর্নর জিয়াদ। ইনি ৪৫ হি: থেকে ৫৩ হি: পর্যন্ত সেখানকার গভর্নর ছিলেন। তিনি আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে জের, জবর ও পেশের সাংকেতিক চিহ্ন উদ্ভাবনের অনুরোধ করেন। আবুল আসওয়াদ জবরের জন্য অক্ষরের উপরে, জেরের জন্য অক্ষরের নীচে এবং পেশের জন্য অক্ষরের মাঝখানে একটি করে নুকতা বসানোর প্রস্তাব করেন। অত:পর আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের আমলে (৬৫ হি: – ৮৬ হি:) ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনের পরস্পর–সদৃশ অক্ষরগুলোকে চিহ্নিত করার উপায় বের করার জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন। এই বিশেষজ্ঞদ্বয় সর্বপ্রথম আরবি ভাষার অক্ষরগুলোতে কোনোটিকে নুকতাবিশিষ্ট, কোনোটিকে নোকতাবিহীন এবং নুকতাবিশিষ্ট অক্ষরগুলোর উপরে বা নীচে একটি থেকে তিনটি পর্যন্ত নুকতা সংযুক্ত করে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। তাঁরা আবুল আসওয়াদ প্রবর্তিত নিয়মকে পাল্টে দিয়ে বর্তমানে প্রচলিত জের, জবর ও পেশ প্রবর্তন করেন।

উল্লিখিত দুটো ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে বিবেচনা করে দেখুন যে, কুরআনের প্রচার ও প্রসার যদি শুধু লেখার উপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে যে লিখন রীতিতে এ কিতাব মুসলিম জাতি লাভ করেছিল, তা পড়তে গিয়ে শুধু উচ্চারণে ও হরকতেই নয়, বরং পরস্পর সদৃশ অক্ষরগুলোতেও কতো অগুনতি মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যেতো। কেবল ভাষা ও তার ব্যাকরণের আলোকে স্বয়ং আরবরাও যদি নুকতা ও হরকত লাগাতে আরম্ভ করতো, তাহলে কুরআনের এক একটি ছত্রে বহু সংখ্যক মতভেদ সৃষ্টি হতো। ফলে কোনো উপায়েই নির্ণয় করা সম্ভব হতোনা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রকৃত যে বাক্যাবলী নাযিল হয়েছিল তা কি ছিলো। ব্যাপারটা আপনি নিজেই এভাবে বুঝে নিতে পারেন যে, উর্দু ভাষায় যে কোনো একটি বাক্য নুকতাবিহীন অক্ষর দ্বারা লিখে দশ বিশ জন ভাষাবিদকে পড়তে দিন। দেখবেন, তাদের কোনো একজনেরও পড়া অপর জনের পড়ার সাথে মিলবেনা। এ থেকে বুঝা গেল যে, কুরআনে নুকতা ও জের জবর পেশ প্রবর্তনের কাজটা নিছক ভাষা ও ব্যাকরণের দক্ষতার উপর নির্ভর করে করা সম্ভব ছিলনা। কেননা এভাবে এক কুরআন নয়, অসংখ্য কুরআন প্রস্তুত হয়ে যেতো এবং তাতে শব্দ ও জের, জবর, পেশের অগণিত পার্থক্য বিদ্যমান থাকতো। ফলে কোনো কপি সম্পর্কেই দাবি করা যেতনা যে, এটাই হুবহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া অহির প্রতিলিপি।

www.icsbook.info

এখন ভেবে দেখতে হবে যে, আজ যে আমরা সারা দুনিয়ায় কুরআনের একটি মাত্র সর্বসম্মত কপি পাচ্ছি এবং এর পঠন রীতিতে যতখানি ব্যাপক মতবিরোধ থাকতে পারতো, তা না থেকে কেবল গুটিকয়েক বহুল বর্ণিত মতভেদের মধ্যে সীমিত রয়েছে, তা কিভাবে সম্ভব হলো? বস্তুতঃ এটা একটা অমূল্য নেয়ামতের ফল- যার মর্যাদা খাট করার জন্য এবং যার উপর থেকে আস্থা উঠিয়ে দেয়ার জন্য হাদিস অমান্যকারী গোষ্ঠী আদাপানি খেয়ে লেগেছে। সেই অমূল্য নেয়ামতটি হলো ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন মৌখিক বর্ণনার প্রক্রিয়া তথা রেওয়ায়াত।

উপরে যে দুটো ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তাছাড়া তৃতীয় আরেকটি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যও রয়েছে। সেটি এই যে, শুরুতে কুরআনের প্রচার ও প্রসার লিখিত আকারে নয়, বরং মৌখিক শিক্ষাদানের আকারেই সম্পন্ন হয়েছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহি লেখকদের দ্বারা কুরআন তাৎক্ষণিকভাবে লিখিয়ে সংরক্ষণ করেছিলেন একথা সত্য। তবে জনগণের মধ্যে তার প্রচার ও প্রসারের মূল পদ্ধতি এই ছিলো যে, লোকেরা সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে কুরআন শুনে তা মুখস্থ করে ফেলতো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এভাবে মুখস্থকারীরা পরবর্তী সময়ে অন্য লোকদেরকে শিখাতো ও মুখস্থ করাতো। এভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বিশুদ্ধ হরকত যা অবিকল নাযিলকৃত অহি মোতাবেক ছিলো- হাজার হাজার মানুষ স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে জানতে পেরেছিল এবং তারপর লক্ষ লক্ষ মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের কাছ থেকে মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করেছিল। সাহাবায়ে কেরামের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সমগ্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন এবং হুবহু মুখস্থ করেছেন। আর কুরআনের বিভিন্ন অংশ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করেছিলেন এমন সাহাবিও ছিলেন হাজার হাজার। আর বিপুল সংখ্যক সাহাবি এরূপ ছিলেন যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে কুরআনের অংশবিশেষ শিখলেও পরবর্তীকালে তাঁর কাছ থেকে শেখা অন্যান্য সাহাবির কাছ থেকে সমগ্র কুরআন শব্দে শব্দে শিখে নিয়েছিলেন। এই সকল সাহাবির কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানগণ কুরআনের বিশুদ্ধ পঠন পদ্ধতি শিখেছিলেন। এই বিশুদ্ধ পঠন শুধু লিখিত কুরআন থেকে শেখা সম্ভব ছিলনা। লিখিত কুরআনকে এই সব জীবন্ত কুরআনের কাছ থেকে পড়েই তার আসল পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব ছিলো।

www.icsbook.info

একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু যে কুরআনের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়ে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে সংরক্ষণ করিয়েছিলেন তা নয়, বরং সেই সাথে উক্ত কুরআনের যথাযথ পাঠ জনগণকে শিখানোর জন্য একেকজন অভিজ্ঞ কারীও প্রত্যেক জায়গায় নিয়োগ করেছিলেন। মদিনায় হযরত যায়েদ বিন সাবেত, মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ বিন সায়েব, সিরিয়ায় হযরত মুগীরা বিন শিহাব, কুফায় হযরত আবু আবদুর রহমান সুলামী এবং বসরায় হযরত আমের বিন আবদুল কায়েস এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া যেখানেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট কারী সাহাবিদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা কোনো সাহাবিকে পাওয়া যেতো, হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে কুরআনের প্রতিটি শব্দ বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখতে যেতো।

কুরআনের বিশুদ্ধ পঠনের এসব সাধারণ শিক্ষার্থী ছাড়াও তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের আমলে এমন একদল মনীষীও জন্মলাভ করেন, যাঁরা বিশেষভাবে কুরআন পাঠে বিশেষজ্ঞসুলভ দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁরা এক একটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ, পঠন রীতি ও হরকত আয়ত্ত করার জন্য সফর করে করে এমন সব উস্তাদের কাছে হাজির হন, যাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঘনিষ্ঠতর সাহাবির সম্পর্ক রাখতেন। তারা প্রতিটি শব্দের পঠন সম্পর্কে একথাও জেনে নেন যে, তিনি ওটা কার কাছ থেকে শিখেছেন এবং তাঁর উস্তাদই বা কার কাছ থেকে শিখেছেন। এই পর্যায়ে এ কথাও নির্ভুলভাবে জানা যায় যে, বিভিন্ন সাহাবি ও তাদের শিষ্যদের কিরাতে কোথায় কোথায় কি কি পার্থক্য রয়েছে এবং ঐসব পার্থক্যের মধ্যে কোন্‌টি অপ্রসিদ্ধ, কোন্‌টি প্রসিদ্ধ এবং কোন্‌টি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ[১] এবং প্রত্যেকটির পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ কি?

প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এ ধরনের কিরাত বিশেষজ্ঞের এক বিরাট গোষ্ঠী মুসলিম জাহানে বিদ্যমান ছিলেন। তবে তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে যে সাতজনের সর্বোচ্চ জ্ঞান গরিমা সমগ্র উম্মতের কাছে স্বীকৃতি লাভ করে তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. কিরাত শাস্ত্রের পরিভাষায় প্রথমটিকে 'শাজ' দ্বিতীয়টিকে 'মশহুর' এবং তৃতীয়টিকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়। শাজ হলো সেই কিরাত, যা মাত্র একটি সূত্র থেকে বর্ণিত এবং মাশহুর একাধিক সূত্র থেকে বর্ণিত। আর মুতাওয়াতির হলো সেই কিরাত, যা বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি বিপুল সংখ্যক লোকের কাছ থেকে শুনেছে এবং স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকেও বিপুল সংখ্যক লোক শ্রবণ করেছেন।

www.icsbook.info

ইতিহাসে এরা 'কুররায়ে সাবয়া' অর্থাৎ ইলমে কিরাতের শ্রেষ্ঠ সাত ইমাম নামে খ্যাত।

১. নাফে বিন আবদুর রহমান, ওফাত ১৬৯ হি:। ইনি সমসাময়িক যুগে মদিনার শ্রেষ্ঠ কারী হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁর সর্বাধিক প্রামাণ্য শিষ্যত্বের সূত্র ছিলো এই যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর কাছে সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। আর ঐ দুই সাহাবি কুরআন পড়া শিখেছিলেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে। আর উবাই ইবনে কা'ব শিখেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে।

২. আবদুল্লাহ ইবনে কাছীর- ইনি মক্কার শ্রেষ্ঠ কারী ছিলেন। ৪৫ হি: তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ওফাত পান ১২০ হি:। তাঁর বিশেষ উস্তাদ ছিলেন আবদুল্লাহ বিন সায়েব মাখযুমী (রা.)। হযরত উসমান (রা.) তাঁকে কুরআনের সরকারি কপির সাথে মৌখিক শিক্ষা দানের জন্য মক্কা পাঠিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ বিন সায়েব হযরত উমর (রা.) ও হযরত উবাই ইবনে কা'বের কাছে সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন করেন।

৩. আবু আমর বিন আলা আল বসরী- ইনি ৬৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মক্কা, মদিনা, কুফা ও বসরার বহু সংখ্যক কিরাত বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর শিক্ষার উৎস ছিলো দুটো। প্রথমত: মুজাহিদ এবং সাঈদ বিন জুবাইরের ধারা। এই ধারাটি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের মাধ্যমে উবাই বিন কা'ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। দ্বিতীয়ত: হাসান বসরীর ধারা। এই ধারার উস্তাদ ছিলেন আবুল আলিয়া। আবুল আলিয়া ছিলেন হযরত উমর বিন খাত্তাবের শিষ্য।

৪. আবদুল্লাহ বিন আমের- ইনি সিরিয়ায় কিরাতের ইমামরূপে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর জন্ম ৮ম হিজরীতে এবং ইন্তিকাল করেন ১১৮ হিজরীতে। তিনি বড় বড় সাহাবীর কাছ থেকে কিরাত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছ থেকে কিরাত সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনকারী মুগীরা বিন শিহাব মাখযুমী। তাছাড়া হযরত উসমানের শাসনকালে কুরআনের যে সরকারি কপি সিরিয়াতে পাঠানো হয়েছিল, তার সাথে এই মুগীরা বিন শিহাবকেই কুরআন পড়া শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

৫. হামযা বিন হাবীব আল কুফী- ইনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৭ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। আমাশ, ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব, যির বিন হুবাইশ, আলী (রা.), উসমান (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) এর ধারা থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। সমসাময়িককালে তিনি কুফার কারীদের ইমামরূপে স্বীকৃত ছিলেন।

www.icsbook.info

৬. আলী আল কিসায়ী- হামযার পরবর্তীকালে ইনি কুফার কিরাতের ইমামরূপে স্বীকৃত ছিলেন। ইনি একই সাথে আরবি ব্যাকরণের 'নাহু' শাখারও ইমাম ছিলেন, কিরাতেরও ইমাম ছিলেন। তার মজলিসে বহু সংখ্যক লোক নিজ নিজ কুরআনের কপি নিয়ে বসতেন, আর তিনি প্রতিটি শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, পঠন রীতি ও হরকত বলে দিতেন। তিনি ১৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭. আসেম বিন আবুন নাজুদ- ইনি কুফার শ্রেষ্ঠ কারী ছিলেন। ১২৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি দুইটি বিশুদ্ধতম ধারা থেকে কিরাতের শিক্ষা লাভ করেন। একটি ধারা হলো যির বিন হুবাইশের, যিনি হযরত আলী, হযরত উসমান ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছ থেকে কিরাতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। অপরটি আবদুল্লাহ বিন হাবীব সুলামীর ধারা, যিনি একাধারে হযরত আলী, হযরত উসমান হযরত যায়েদ বিন সাবেত এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) থেকে কুরআনের শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে হযরত আলী (রা.) তাকে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের কুরআন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বর্তমানে আমরা কুরআনের যে কপি পড়ি, তা এই আসেম বিন আবুন নাজুদেরই প্রখ্যাততম শিষ্য হাফসের বর্ণনার প্রতিরূপ। হাফসের জন্ম ৯০ হিজরীতে এবং ওফাত ১৮০ হিজরীতে।

উপরোক্ত সাতজন ইমাম ছাড়া অপরাপর যেসব ব্যক্তির কিরাত প্রসিদ্ধি লাভ করে তাঁরা হলেন আবূ জাফর, ইয়াকুব, খালাফ, হাসান বসরী, ইবনি মুহাইমেন, ইয়াহইয়া আল ইয়াজিদী এবং শানবুযী।

এসব বিশিষ্ট কারী যে সকল সূত্র ও বর্ণনা ধারা থেকে কিরাতের শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সেই একই সূত্র ও ধারা থেকে কুরআনের শিক্ষালাভকারী শত শত ও হাজার হাজার লোক তাদের জীবদ্দশায় বর্তমান ছিলেন। তারা যেসব উস্তাদের শিষ্য ছিলেন এরাও তাদেরই শিষ্য ছিলেন। এঁদের সকলের কাছে প্রত্যেক কিরাতের জন্য পূর্ণ বর্ণনা পরম্পরা বিদ্যমান ছিলো, যা কোনো না কোনো সাহাবীর মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তাই কিরাতের এসব ইমামের মধ্য থেকে কোনো একজন সম্পর্কেও একথা বলা চলেনা যে, তিনি একাই স্বীয় কিরাতের বর্ণনাকারী। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কিরাতের পক্ষেই অসংখ্য সাক্ষী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান ছিলো। এজন্য এই ইমামদের বর্ণিত সকল কিরাতই মুসলিম উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত ছিলো।

বিভিন্ন কিরাতকে গ্রহণ বা বর্জন করার জন্য কিরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে কয়টি শর্ত সম্পর্কে প্রায় পূর্ণ মতৈক্য বিরাজমান তা নিম্নরূপ :

প্রথম শর্ত এই যে, কিরাতের যেটাই হোক না কেনো, তাকে হযরত উসমান

www.icsbook.info

(রা.) কর্তৃক সরকারিভাবে প্রচারিত কপির লিখন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। এই লিখন পদ্ধতি বা 'রসমুল খত' এর সাথে যে পঠন পদ্ধতির সামঞ্জস্য নেই তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। উদাহরণস্বরূপ, উসমানী কপিতে যদি কোনো শব্দকে بَعْلَ লেখা হয়ে থাকে, তাহলে তার পঠন بَعلْ অথবা بَعّلْتَ তো গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু بَعّلَ গ্রাহ্য হতে পারেনা। কেননা ওটা প্রামাণ্য সরকারি কপির সাথে সামঞ্জস্যহীন।

দ্বিতীয় শর্ত এই যে, কিরাত এরূপ হওয়া চাই, যা ভাষা, প্রচলিত বাকধারা ও ব্যাকরণের বিরুদ্ধে না যায় এবং পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে আলোচ্য বাক্য বা বাক্যাংশের মিল থাকে।

এই দুটো শর্তের সাথে তৃতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই যে, একটি কিরাত কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তার সনদ (বর্ণনাধারা) বিশ্বস্ত ও পরস্পর সংযুক্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়। নচেত নিছক প্রামাণ্য কপির লিখন পদ্ধতিতে একটি কিরাতের অবকাশ আছে বলেই এবং ব্যাকরণের দিক দিয়ে পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে মিল রেখে কোনো শব্দকে এভাবে পড়া চলে বলেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। প্রত্যেক কিরাতের জন্য এটা প্রমাণিত হওয়া জরুরি যে, এই শব্দ বা বাক্যকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই পড়েছিলেন বা কোনো সাহাবিকে এভাবে পড়িয়েছিলেন। এই শেষ শর্তটিই হচ্ছে সেই আসল নিয়ামত, যার কল্যাণে কিরাতের সম্ভাব্য বহু সংখ্যক পার্থক্য কমে গিয়ে মাত্র কয়েকটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। উসমানী 'রসমুল খত' এবং ভাষা ও বাকধারার আওতায় যতো রকমের বিবিধ পঠন রীতি প্রচলিত হতে পারতো তা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় আমরা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি যে, কুরআনকে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পড়িয়েছিলেন, আজ আমরা ঠিক তদ্রূপই পড়তে পারছি।

এবার একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া বাকি রয়েছে। সেটি এই যে, বিশ্বস্ত কারীগণের মাধ্যমে অগণিত সংখ্যক (মুতাওয়াতির) অথবা সীমিত সংখ্যক (মশহুর) বরাত বা বর্ণনা সূত্রে যেসব বিবিধ কিরাত আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তার পারস্পরিক পার্থক্য কি ধরনের? স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই কি কিছু কিছু শব্দ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়েছেন এবং শিখিয়েছেন? অথবা তার কোনো কোনোটি সম্পর্কে কি ভ্রান্তভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দেয়া হয়েছে? আর এই রকমারি কিরাতগুলো কি অর্থের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরস্পর

www.icsbook.info

বিরোধী, না সেসবের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য রয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আসলে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় শব্দ বিভিন্ন ভঙ্গিতে পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন আর এসব রকমারি কিরাতে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ ও বৈপরিত্য নেই, বরং চিন্তা করলে এতে অত্যন্ত গভীর মর্মগত সামঞ্জস্য ও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সূরা ফাতেহার مالك يوم الدين আয়াত সম্পর্কে দুটো মুতাওয়াতির কিরাত রয়েছে। আসেম, কিসায়ী, খালাফ ও ইয়াকুব বহু সংখ্যক সাহাবির বরাত দিয়ে একে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য কারীগণ বহু সংখ্যক সাহাবির বরাত দিয়ে একে مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম কিরাতের আলোকে আয়াতের অনুবাদ হবে প্রতিফল দিবসের মালিক। আর দ্বিতীয় কিরাত অনুসারে প্রতিফল দিবসের সম্রাট। ভেবে দেখুন তো এ দুটো কি পরস্পর বিরোধী! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই উভয় কিরাতের সমন্বয়ে আয়াতের মর্ম আরো ব্যাপক ও বিস্তৃতরূপ লাভ করেছে এবং এর বক্তব্য পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্ণনাধারা থেকে যাই উদ্ভূত হয়ে থাকুক না কেনো, বিবেকের সাক্ষ্য এই যে, জিবরীল (আ.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ শব্দটি উভয় প্রকারেই শিক্ষা দিয়েছেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দটি বিভিন্ন সময়ে উভয় রকমেই পড়েছেন।

ওযু সংক্রান্ত আয়াত এর আরেকটি উদাহরণ। এ আয়াতে ارجلكم শব্দটি বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনাক্রমে (মুতাওয়াতির) দুইভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। নাফে, আবদুল্লাহ ইবনে আমের, হাফ্স, কিসায়ী এবং ইয়াকুব اَرْجُلَكُمْ পড়েছেন এবং এর যে অর্থ দাঁড়ায়, তাতে পা ধোয়ার নির্দেশই প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে কাছীর, হামজা বিন হাবীব, আবু আমর বিন আল আলা ও আছেম اَرْجُلِكُمْ পড়েছেন এবং এর অর্থ অনুসারে পা মসেহ করার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। বাহ্যত একজন পাঠকের কাছে এ উভয় কিরাত পরস্পর বিরোধী মনে হবে। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব কার্যধারা থেকে বুঝা গেছে যে, আসলে এ দুটো কিরাত মোটেই পরস্পর বিরোধী নয়। বরঞ্চ এতে দুটো ভিন্ন রকমের অবস্থার জন্য ভিন্ন রকমের নির্দেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে ব্যক্তির ওযু নেই তার ওযু করার সময় পা ধোয়া উচিত। আর যার ওযু আছে সে যদি নতুন ওযু করতে ইচ্ছুক হয় তবে সে পায়ের উপর মসেহ করতে পারে, আর ওযু করে যদি কেউ পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করে, তাহলে প্রবাসকালে ৭২ ঘণ্টা এবং অপ্রবাসকালে ২৪ ঘণ্টা যাবত মোজার উপর মসেহ করে ওযু সম্পন্ন করতে পারে। পা ধোয়া

www.icsbook.info

সংক্রান্ত নির্দেশের এই প্রশস্ততা শব্দটির এই দ্বিবিধ পঠন দ্বারাই বোধগম্য হওয়া সম্ভব।

অনুরূপভাবে অন্য যে যে স্থানে কুরআনের বহুল প্রচলিত (মুতাওয়াতির) ও অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত (মশহুর) পঠন রীতিতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তার কোথাও আপনি স্ববিরোধিতা ও সংঘাত দেখতে পাবেননা। প্রত্যেক পঠন রীতি অপর পঠন রীতির পাশাপাশি একটা অভিনব তাৎপর্য বহন করে। সামান্য একটু চিন্তা ভাবনা ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারাই সে তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

কুরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে মতবিরোধ

প্রশ্ন : কুরআন মজীদের বিভিন্ন তফসীর কেনো? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তফসীর করেছেন সেটিই হুবহু লিখে নেয়া হয়নি কেনো? লোকদের নিজেদের বিদ্যা ও জ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন তফসীর বর্ণনা করার ও মতবিরোধের পাহাড় সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিলো?

উত্তর : দীনের তাৎপর্য ও তার বিধানসমূহ জানার জন্য কুরআনের যে পরিমাণ জ্ঞান অপরিহার্য ছিলো তা অর্জন করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বাণী ও কর্মের মাধ্যমে তার তফসীর করে গেছেন। কিন্তু লোকদের চিন্তা, গবেষণা ও জ্ঞানালোচনা করার জন্যও একটি অংশ রেখে গেছেন। এর ফলে তারা নিজেরাও চিন্তা করতে অভ্যস্ত হবে। এ অংশে মতবিরোধ দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। দুনিয়ায় আদতে কোনো মতবিরোধ সৃষ্টি না করাটাই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি নিজেই সকল মানুষকে সমান বুদ্ধি-জ্ঞান দান করতেন। বরং বুদ্ধি, জ্ঞান ও স্বতন্ত্র ক্ষমতা দান করার প্রয়োজনই হতোনা। এ অবস্থায় মানুষের প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে না কোনো ক্ষেত্রই থাকতো আর না থাকতো উন্নতি ও অবনতির কোনো সম্ভাবনা। (তরজমানুল কুরআন আগস্ট ১৯৫৯ ঈসায়ী)

জিনেরাও কি এক শ্রেণীর মানুষ?

প্রশ্ন আমার বিশ্বাস আপনি কুরআনের কোনো কোনো আধুনিক মুফাস্‌সিরের এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন যে : কুরআন মজীদে উল্লেখিত 'জিন' ও 'ইনসান'-এর অর্থ দু'টি পৃথক পৃথক সৃষ্টি (মাখলুক) নয়। বরঞ্চ জিন মানে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এবং 'ইনসান' অর্থ শহরের মানুষ। 'ইবলীস ও আদম' শিরোনামের একটি গ্রন্থ এখন আমি অধ্যয়ন করছি। এর অন্যান্য বাক্য অবাস্তব বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ হলেও একটি স্থানে এর যুক্তি প্রমাণ বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হয়েছে। গ্রন্থকার লিখেছেন : "সূরা আল আ'রাফে বনী আদমকে লক্ষ্য করে বলা

www.icsbook.info

হয়েছে যে, রসূল তোমাদের মধ্য থেকেই (মিনকুম) আসবে। সূরা আল আনআমে জিন ও ইনসান সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : তোমাদের মধ্য থেকে (মিনকুম) রসূল এসেছিল। কুরআন মজীদে জিনদের (আগুন দ্বারা তৈরি মাখলুক) কোনো রসূলের কথা উল্লেখ নেই। সমস্ত রসূল সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে বলা হয়েছে তারা আদমের সন্তান ইনসান ছিলেন এবং ইনসানের মধ্যে তারা ছিলেন পুরুষ শ্রেণীর। সুতরাং যেহেতু জিন ও ইনসান সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে রসূল এসেছিলেন, সেহেতু একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, জিন ও ইনসান সম্প্রদায় বলতে বনী আদমের দু'টি শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ থেকে পৃথক কোনো সৃষ্টি জগতকে বুঝানো হয়নি।

এসব দলিল প্রমাণ কতোটা সঠিক মেহেরবানীপূর্বক স্পষ্ট করে জানাবেন। আর জিনরা পৃথক কোনো সৃষ্টিই (মাখলুক) যদি হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো রসূলই যদি প্রেরিত না হয়ে থাকেন, তবে তারা কুরআনে উল্লেখিত "তোমাদের মধ্য থেকে" (মিনকুম) সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত কী করে হতে পারে?

উত্তর : জিনদের সম্পর্কে "তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেনি?" আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়ে যে তফসীর করা হয়েছে, তাদ্বারা আপনার মধ্যে যে পেরেশানী সৃষ্টি হয়েছে, দু'টি কথার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে আপনি নিজেই তার সমাধান করতে পারেন।

প্রথমত: দু'টি সম্প্রদায়কে যদি একটি সমষ্টি হিসেবে সম্বোধন করা হয় এবং কোনো একটি জিনিস যদি তাদের একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবে উভয়ের প্রতি সমষ্টিগত সম্বোধনের ক্ষেত্রে সেই জিনিসকে সমষ্টির প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা কি ভুল? কোনো বাক্যে যদি সেই জিনিসকে সমষ্টির প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়ে থাকে, তবে তাদ্বারা এরূপ যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ করা কি সঠিক হবে যে, মূলত এরা দু'টি সম্প্রদায়ের সমষ্টিই নয়, বরং একটি মাত্র সম্প্রদায়? মনে করুন, কোনো স্কুলে অনেকগুলো ক্লাস আছে এবং একটি ক্লাস অপরাধ করেছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক যদি সৎ পথের উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে সকল ক্লাসকে একত্র করে সম্বোধন করে বলেন যে, "হে বিদ্যালয়ের বালকগণ! তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছেলে এই অপরাধ করেছে।" এখন তার এই সম্বোধন থেকে কি এরূপ যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এই বিদ্যালয়ে অনেকগুলো ক্লাসই নেই, ক্লাস মূলত একটিই?

এরূপ যুক্তি প্রমাণ যদি সঠিক না হয়ে থাকে, তবে উদ্ধৃত উক্ত যুক্তি প্রমাণও সঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা জিন ও ইনসানের সমষ্টিকে সম্বোধন করেছেন। এই সমষ্টির

www.icsbook.info

একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীগণ এসেছেন। কিন্তু তাঁরা দীন প্রচার করেছেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং উভয় সম্প্রদায়ের জন্যে তাঁদের প্রতি ঈমান আনা জরুরি করে দেয়া হয়েছে। এ কারণে উভয় সম্প্রদায়ের সমষ্টির প্রতি সম্বোধন করে একথা বলা বিলকুল সহীহ যে, তোমাদের মধ্যে নবীগণ এসেছিলেন। শুধুমাত্র এই বাচনভঙ্গি দ্বারা একথা প্রমাণ করা যেতে পারেনা যে, এরা উভয় পৃথক পৃথক সম্প্রদায় নয়, বরং একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: স্বয়ং কুরআন মজীদই যখন বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার ভাষায় একথা বলে দিয়েছে যে, জিন ও ইনসান সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক দু'টি সৃষ্টি, তখন কেবলমাত্র আলাম ইয়াতিকুম..... আয়াত থেকে এ অর্থ বের করা কিছুতেই সঠিক হতে পারেনা যে, জিনও এক শ্রেণীর মানুষ। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন : "আমি মানুষকে পচা মাটির শুষ্ক গাড়া থেকে বানিয়েছি। এর পূর্বে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি আগুনের লেলিহান শিখা থেকে।" (আল হিজ্‌র ২৬-২৭)

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটির ঢিলের ন্যায় শুষ্ক গাড়া থেকে আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে।" (আর-রহমান : ১৪-১৫)

"লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বানিয়ে নেয়।" (আল-আন্‌আম : ১০০)

"আরো এই যে, মানুষের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক কিছু সংখ্যক জিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিল।" (আল-জিন : ৬)

"আর আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা করো, তখন তারা তো সিজদা করলো, কিন্তু, ইবলীস তা করলনা। সে ছিলো জিনদের মধ্য থেকে। সে নিজের রবের নির্দেশ লংঘন করে বসলো।" (আল-কাহ্‌ফ : ৫০)

"সে (ইবলীস) বললো : আমি তার অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।" (আল-আ'রাফ : ১২)

"হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের তেমন করে আবার ফিতনায় ফেলতে না পারে, যেমন করে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। ...... সে এবং তার সাথি তোমাদেরকে এমন এক স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাওনা।" (আল-আ'রাফ : ২৭)

"হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি একটি 'প্রাণ' থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তার থেকে তৈরি করেছেন তার জুড়ি এবং তাদের উভয় থেকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী।" (আন-নিসা ১)

www.icsbook.info

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন : আমি পচা মৃত্তিকার শুষ্ক গাড়া থেকে মানুষ তৈরি করছি। অত:পর যখন তাকে পূর্ণ মাত্রায় তৈরি করে নেবো এবং তাতে নিজের 'রূহ' থেকে কিছু ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার সম্মুখে সাজদায় অবনত হবে। ফলে সব ফেরেশতাই সাজদা করলো, ইবলীস ব্যতীত। সে সাজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করলো।" (আল-হিজর : ২৮-৩১)

এসব আয়াত থেকে কয়েকটি কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হয়ে যায় : প্রথমত: কুরআন মজীদে উল্লেখিত 'ইনসান', 'বাশার', 'আন্-নাস' এবং 'বনী আদম' একই অর্থবোধক শব্দ। আদম সন্তানদের ছাড়া কুরআন মজীদে আর কোনো মানব গোষ্ঠীর কোনো প্রকার উল্লেখ নেই। কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী আদমের পূর্বে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা এবং তার সন্তানদের ছাড়া পৃথিবীতে কখনো কোনো মানুষ ছিলনা, আর না বর্তমানে আছে। এই মানব গোষ্ঠী আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী 'হাওয়া' থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি দ্বারা।

দ্বিতীয়ত: জিন অপর একটি সম্প্রদায়। তার মূল সৃষ্টিই মানব সৃষ্টি থেকে ভিন্নতর। মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। পক্ষান্তরে জিন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে আগুন বা আগুনের শিখা থেকে।

তৃতীয়ত: জিন সম্প্রদায় মানব সৃষ্টির পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিলো। এই (জিন) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে একজনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল মানব সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তিকে সাজদা করার জন্য। কিন্তু সে সাজদা করতে অস্বীকার করে। এই অস্বীকৃতির পেছনে তার যুক্তি ছিলো এই যে সম্প্রদায় হিসেবে আমি মানব সম্প্রদায় থেকে উত্তম। কেননা আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নি দ্বারা আর তাকে বানানো হয়েছে মাটি দ্বারা।

চতুর্থত: জিন এমন একটি সৃষ্টি (মাখলুক) যে মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ তাকে দেখতে পায়না।

পঞ্চমত: মুশরিকরা তাদের জাহিলী ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে এই (জিন) সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র সাথে শরীক করতো এবং তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো।

এবার বলুন দেখি, এই সুস্পষ্ট আলোচনা ও বিশ্লেষণের পরও কি 'আলাম ইয়াতিকুম মিনকুম ' আয়াতটি জিন ও ইনসানকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করার জন্য দলিল হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে? বলুন তো, আদম সন্তানের বাইরে সেই গ্রাম্য, জংলী কিংবা পাহাড়ী মানুষগুলো কারা, যাদেরকে মাটি দ্বারা নয়- আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে? যারা আদম আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিলো? যাদেরকে মানুষ দেখতে পায়না, অথচ তারা

www.icsbook.info

মানুষকে দেখতে পায়? যাদেরকে মুশরিক মানুষরা কখনো নিজেদের মা'বুদ বানিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছে?

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের এরূপ অসংগত ও আজগুবী বিশ্লেষণ কেবল সেই সমস্ত লোকই করতে পারে যারা কুরআনের অনুসরণ করার পরিবর্তে কুরআনকে নিজেদের ধারণা কল্পনার অনুসারী বানাতে চায়। (তরজমানুল কুরআন ফেব্রুয়ারি ১৯৬২)

সূরা আনকাবুতের দু'টি আয়াতের বিশ্লেষণ

প্রশ্ন : সূরা আল আন্‌কাবুতের দু'টি আয়াতের তাৎপর্য আমার বুঝে আসেনা। আমার নিকট কুরআনের যে তফসীর রয়েছে তাতেও এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই। তাই আশা করি আপনার দীনি দূরদৃষ্টি দিয়ে আয়াত দু'টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

১. সূরা আল-আন্‌কাবুতের পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

"(অস্বীকারকারীরা) বলে এই ব্যক্তির নিকট তার খোদার নিকট থেকে নিদর্শন নাযিল করা হলো না কেন? তুমি বলো নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আর আমি তো কেবল সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী ও সাবধানকারী।"

কুরআনের এ আয়াতটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো মু'জিযা প্রদান করা হয়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা প্রদান না করার যেসব কারণ কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো স্বস্থানে যথার্থ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে- এতে করে নবী পাকের পবিত্র রিসালাতের মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়নি? যেখানে স্বয়ং কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, মূসা আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বহু মু'জিযা প্রদান করা হয়েছিল, অথচ আমাদের নবী আলাইহিস্ সালাম এ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছেন?

সীরাত গ্রন্থসমূহে নবী পাকের বহু মু'জিযার কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন : চাঁদকে দু'টুকরা করা, সামান্য খাদ্য দ্বারা বড় জনসমষ্টিকে পরিতৃপ্ত করা, পাথরের কলেমা শাহাদাত পড়া প্রভৃতি। কুরআনের উক্ত আয়াতটির সাক্ষ্য অনুযায়ী এসব মু'জিযা ভ্রান্ত বলে মনে হয়।

২. দ্বিতীয়ত সূরা আল-আন্‌কাবুতের সাতাশ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

"আর আমরা তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছি আর তার বংশে নবুয়্যত ও কিতাব দিয়েছি......।"

www.icsbook.info

এখানে ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের কথা বিলকুল বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বড় ছেলে। সুতরাং তাঁর নামটা তো প্রথমে আসা প্রয়োজন ছিলো। পরবর্তীতে তাঁর বংশই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যত দ্বারা সম্মানিত হয়।

উত্তর ১ : কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, কাফিররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মু'জিযা দাবি করছিল এবং কুরআনের কয়েক জায়গায় তাদের এ দাবির জবাবও দেয়া হয়েছে। এরূপ সবগুলো স্থানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বুঝা যায় যে, নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন ছাড়া আর কোনো মু'জিযা দেয়া হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ অর্থেও তাঁকে কোনো মু'জিযা দেয়া হয়নি। বরঞ্চ এর অর্থ হলো- তাঁকে (কুরআন ছাড়া) আর এমন কোনো মু'জিযা দেয়া হয়নি যা নবুয়্যতর প্রমাণ দলিলের মর্যাদা রাখে এবং যা প্রত্যক্ষ করার পর অস্বীকারকারীরা শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়ে।

২. ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করার কথা কুরআন মজীদে কয়েক স্থানে উল্লেখ হয়েছে। যেমন : সূরা আল আনআম : ৮৫, মরিয়ম : ৫০, আম্বিয়া : ৭২ এর কোনো স্থানেই ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, এসব স্থানে সীমাহীন ও অস্বাভাবিক পুরস্কারের মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে। আর এ মর্যাদা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশের সেই শাখায়ই পাওয়া যায়- যা ইসহাক আলাইহিস্ সালামের সূত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম থেকে যে শাখা চলে এসেছে, তা আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত বেদুঈন যিন্দেগী অতিবাহিত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ব পর্যন্ত এ শাখায় উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়নি। অথচ ইসহাক আলাইহিস্ সালাম থেকে আগত শাখায় অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্ম হয় এবং ইতিহাসে তাদের বিরাট কৃতিত্বের কথা উল্লেখ আছে। (তরজমানুল কুরআন : মার্চ ১৯৫৬ইং)

কতিপয় প্রশ্ন

প্রশ্ন : ১. কুরআন মজীদে 'হক' পরিভাষাটি কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? বিভিন্ন আয়াতে ঐ অর্থগুলোর প্রয়োগ কিভাবে হতে পারে যা বিশ্বজাহানের সৃষ্টির ব্যাপারে বিল্হক, কিতাব বিল্হক, রিসালাত বিল্হক এবং 'ইউহিক্কাল হাক্কা ওয়া ইউবতিলাল বাতিলা'-এর মধ্যে হক শব্দটি সমন্বয়, পারস্পর্য ও অভিব্যক্তির উপর আলোকপাত করে?

www.icsbook.info

২. কুরআন মজীদে কিতাবের সাথে মীযান অবতীর্ণ করার যে দাবি করা হয়েছে তার অর্থ কি? প্রত্যাদিষ্ট আইনের সাথে এমন কি তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের সমাজের অতি মূল্যবান ও কম মূল্যবান বস্তুগুলোর পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হবো? মুফাস্সিরগণের একথা যথার্থ হতে পারেনা যে, মানব জাতির নৈতিক ভারসাম্যতার নামই হচ্ছে মীযান। প্রথমত: ব্যক্তিগত বিবেকের নৈতিক অনুভূতি সত্যতার নির্ভুল পরিমাপ ও মূল্য নির্ণয় করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত: মীযানের সাথে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে আর মানবিক বিবেকের মীযান পয়গম্বর ও কিতাবের সাথে অবতীর্ণ করা যেতে পারেনা, তা পূর্বে ছিলো এবং পরেও থাকবে।

৩. ধর্মীয় কার্যসূচির মধ্যে যদি মানব প্রকৃতির জন্য কোনো প্রকার আকর্ষণ থাকতো তাহলে মুত্তাকী লোকেরা কোনো দেশে ও কোনো একটি জাতির মধ্যে উন্নততর সমাজ গঠনে সফল হয়নি কেন? মানবতার সমগ্র ইতিহাসে যদি ধর্ম সফল না হয়ে থাকে তাহলে আজ কেমন করে তার সাহায্যে শান্তি ও প্রগতির আশা করা যেতে পারে? মানব প্রকৃতির মধ্যেই দুষ্কৃতি প্রচ্ছন্ন ছিলো, শুধু একথা বলে দেয়ায় কোনো ফায়দা নেই। ধর্মসমূহ হককে জীবিত করার ও বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু মাত্র মাঝে মাঝে কিছু কিছু সময়ের কথা বাদ দিলে দেখা যায়, ফল হামেশা বিপরীতই হয়েছে এবং ইতিহাসের সয়লাবের গতি পরিবর্তিত হয়নি অথবা অন্য কথায় বলা যায়, শয়তানের শক্তিকে পরাজিত করা যায়নি।

৪. পয়গম্বরগণের আগমনের সিলসিলা বন্ধ হলো কেন? মানবিক চেতনা কি আজ তাদের প্রয়োজনমুক্ত হয়েছে?

হকের অর্থ ও তার ব্যবহার

উত্তর ১. হক শব্দটি কুরআন মজীদে তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও সত্য (reality) অর্থে, কোথাও অধিকার (right) অর্থে, আবার কোথাও উদ্দেশ্যমূলকতা (purposiveness) অর্থে।

বিশ্বজাহানের সৃষ্টির ব্যাপারে কোথাও যদি একথা বলা হয়ে থাকে, আমি জমিন ও আসমানকে 'বিলহক্' পয়দা করেছি, তাহলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একদিকে একথা বলা যে, এ বিশ্বজাহান নিছক খেলার ছলে উদ্দেশ্যহীনভাবে পয়দা করা হয়নি। কিছুদিন আমোদ ফুর্তি করার পর একে এমনিই অনর্থক খতম করে দেয়া হবেনা। আর অন্যদিকে একথা বলাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, এই বিশ্বজাহান এবং এর যাবতীয় কাজ কারবার বৃথা নয়, যেমন অনেক দার্শনিক ও ধর্মীয় জ্ঞানীজন ধারণা

www.icsbook.info

করে থাকেন, বরং এটি একটি গভীর সত্য এবং এর কোনো একটি দিককেও নিছক খেলতামাসা মনে করা উচিত নয়। উপরন্তু কোনো কোনো স্থানে এ উক্তির মাধ্যমে একথা বলাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, এই বিশ্বজাহান ও এর সমগ্র ব্যবস্থা 'হকের' উপর প্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে বাতিলের কোনো স্থায়িত্ব ও ওজন নেই।

মীযান অবতরণের অর্থ

২. মীযান অর্থ হচ্ছে এমন মানসিক ভারসাম্য, যাচাই ও ওজন করার এমন যোগ্যতা এবং ভুল নির্ভুল বাছাই করার এমন শক্তি, যা কেবল নবীগণ, আল্লাহর কিতাব এবং নবীগণের পদ্ধতি থেকে হিকমত ও হেদায়াত লাভকারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। নিছক জন্মগত চিন্তার ভারসাম্য বা দার্শনিকসুলভ চিন্তা গবেষণা এবং ধর্মহীন নৈতিক শিক্ষা থেকে বাহ্যত যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় তা সত্যিকার ভারসাম্য নয়, বরং তা বহুলাংশে প্রান্তিকতা দোষে দুষ্ট থেকে যায়। এ বস্তুটি কেবল তারাই লাভ করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের মধ্যে চিন্তা গবেষণা করে এবং গভীরভাবে নবী জীবন অধ্যয়ন করে সেখান থেকে তত্ত্বের আলোক ও জ্ঞানের প্রখর দৃষ্টি লাভ করে।

সত্য দীন কি ব্যর্থ?

৩. আপনার এ প্রশ্নটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যতোটা সংক্ষিপ্ত এর জবাব ততোটা সংক্ষেপে দেয়া যেতে পারেনা। তবুও যদি নিছক কিছুটা ইশারা ইঙ্গিতই আপনার নিকট সন্তোষজনক হয় তাহলে এর জবাব হচ্ছে এই যে, প্রথমত 'ধর্ম' শব্দটির সাহায্যে আপনি যেসব বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেন সেগুলো নির্ধারণ করুন। যদি ধর্ম শব্দটি আপনি জাতি অর্থে ব্যবহার করেন যার মধ্যে সকল জাতীয় ধর্ম শামিল আছে, তাহলে তার পক্ষ থেকে জবাবদিহি করা আমার কাজ নয়। আর যদি ধর্ম বলতে আপনি সত্য দীনকে বুঝিয়ে থাকেন অর্থাৎ মানব সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীনের শিক্ষা দেয়া হয় এবং আরবি ভাষায় যাকে ইসলাম নামে অভিহিত করা হয়, সেই দীনই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে সেই সমস্ত নীতির সমষ্টি যেগুলো বিশ্বজাহানের যথার্থ সত্যসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষ স্বীকার করুক বা না করুক সেগুলো অবশ্যি নির্ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন স্বাস্থ্য রক্ষার নীতি। এ নীতি মানবদেহের গঠনাকৃতি, তার অঙ্গ প্রতঙ্গসমূহের যথার্থ কর্মপ্রবণতা ও তার প্রকৃতিগত পরিবেশের যথার্থ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পানাহার করা, শ্বাস প্রশ্বাস নেয়া, বিশ্রাম করা প্রভৃতি মানুষকে সুস্থ সবল রাখার জন্য অপরিহার্য। যদি কোনো ব্যক্তি বা সমগ্র দুনিয়া সম্মিলিতভাবে ঐ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে একথা বলা যায়না যে, স্বাস্থ্য রক্ষার নীতিসমূহ বাতিল,

www.icsbook.info

মানব প্রকৃতি সেগুলো পালন করার দাবি জানায় না। সেগুলো ভঙ্গ ও পরাজিত হয়ে গেছে এবং মানুষের বিরুদ্ধাচরণের ফলে সেগুলোর ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বরং ঐ নীতিগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করলে সে ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও ক্ষতি মানুষের, ঐ নীতিগুলোর নয়। কাজেই আপনি যে বস্তুটিকে ধর্মের ব্যর্থতা বলছেন সেটি ধর্মের ব্যর্থতা নয়, বরং মানুষের ব্যর্থতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ধর্ম আমাদের আমানতদারী শিক্ষা দেয়। এখন যদি সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মিলেও আত্মসাৎ করতে থাকে এবং আমানতসমূহকে নষ্ট করতে শুরু করে, তাহলে কি আপনি বলবেন ধর্ম ব্যর্থ হয়েছে? ধর্মের ব্যর্থতা তখন হতে পারে যখন একথা প্রমাণ হয় যে, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি আমানতের নয়, আত্মসাতের দাবি করে অথবা একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, মানব জীবনের সত্যিকার শান্তি ও মানবিক তমদ্দুনের নির্ভরযোগ্য শৌর্য এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতা আমানতের মাধ্যমে নয়, আত্মসাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যদি একথা প্রমাণিত না হয় এবং প্রমাণিত হতে পারেনা, তাহলে মানুষের আমানতদারী ত্যাগ করে আত্মসাতের নীতি অবলম্বন করা এবং এর মাধ্যমে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তমদ্দুনিক ক্ষতি বরদাশ্‌ত করা মানুষের ব্যর্থতার প্রমাণ, 'ধর্ম' বা দীনের ব্যর্থতা নয়। অনুরূপভাবে 'দীন' আর যে সমস্ত নীতি পেশ করেছে অথবা অন্য কথায় যে সমস্ত নীতির সমষ্টিকে 'সত্য দীন' বলা হয় সেগুলো সত্য কি না যাচাই করে দেখুন। যদি তা সত্য হয় তাহলে মানুষ তার আনুগত্য করছে কিনা এর ভিত্তিতে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মানুষ যখন তার আনুগত্য করেছে তখন সফলকাম হয়েছে আর যখন আনুগত্য করেনি তখন ব্যর্থ হয়েছে।

খতমে নবুয়্যতের যথার্থ ব্যাখ্যা

৪. যারা খতমে নবুয়্যতের ব্যাখ্যা এভাবে করে যে, মানবিক চেতনায় এর প্রয়োজন, তারা আসলে নবুয়্যতের অপমান ও তার উপর হামলা করে। এ ব্যাখ্যার অর্থ হচ্ছে এই যে, নবীগণ যে হেদায়াত আনেন, তা মাত্র মানবিক চেতনার একটি বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তারপর মানুষ আর নবীগণের পথ প্রদর্শনের মুখাপেক্ষী নয়।

যতোদিন পর্যন্ত মানব সভ্যতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়নি যার ফলে কোনো নবীর পয়গাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারতো এবং মানুষের এমন কোনো একটি দল তৈরি হতে পারেনি যে নবীর পয়গাম, তাঁর শিক্ষা ও চারিত্রিক আদর্শ সংরক্ষণ করতে পারতো এবং দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় তাকে বিস্তৃত করতে সক্ষম হতো ততোদিন পর্যন্ত নবুয়্যত জারি ছিলো এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে নবী পাঠানো হয়েছে। কিন্তু যখন মানব সভ্যতা এতদূর উন্নতি লাভ করলো যার ফলে

www.icsbook.info

একজন নবীর পয়গাম বিশ্বজনীনতা লাভ করতে সক্ষম হলো এবং অন্যদিকে হকের হেদায়াত গ্রহণকারীদের এমন একটি দলও গঠিত হলো, যারা আল্লাহর কিতাবকে এবং কিতাব আনয়নকারীর চরিত্র ও তার পরিপূর্ণ ব্যবহারিক পথনির্দেশকে হুবহু সংরক্ষিত করে রাখতে পারলো, তখন নবুয়্যতের কার্যসম্পাদন করার জন্যে নতুন কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার প্রয়োজন রইলোনা। (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৪)

খতমে নবুয়্যতের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের দলিল

প্রশ্ন কাদিয়ানীরা কুরআনের কোনো কোনো আয়াত এবং কোনো কোনো হাদিসকে খতমে নবুয়্যতের দলিল হিসেবে চালাবার চেষ্টা করছে। যেমন তারা يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ সূরা আ'রাফের এ আয়াতটির অর্থ এভাবে করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যত লাভ এবং কুরআন অবতীর্ণের পর এ আয়াতের সম্বোধন কেবল উম্মতে মুহাম্মদীই হতে পারে। এখানে "বনী আদম" দ্বারা এ উম্মতকেই বুঝানো হয়েছে। এদেরকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছে, যদি "কখনো তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেন।" এখানে কাদিয়ানীদের বক্তব্য অনুযায়ী কেবল উম্মতী নবীই নয়, বরঞ্চ উম্মতী রসূলের আগমনই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল মুমিনুনের সেই আয়াত যার সূচনা হয়েছে يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ দিয়ে। তাদের মতে এ আয়াতটিও রসূল আগমন প্রমাণ করে। একইভাবে তারা لَوْعَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ نَبِيًّا (যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম বেঁচে থাকতেন তবে তিনি নবী হতেন) হাদিসটির দ্বারা নবী আগমনের সম্ভাবনার পক্ষে দলিল গ্রহণ করে। মেহেরবানী করে এসব দলিলের হাকীকত উন্মোচন করবেন।

উত্তর কাদিয়ানীদের যেসব দলিল আপনি উল্লেখ করলেন সেগুলো তাদের অন্যান্য অধিকাংশ দলিলের মতোই বিভ্রান্তিকর প্রতারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

এই আয়াতটিকে তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে অর্থ বের করে থাকে তা থেকে তাকে যথাস্থানে রেখে বিচার করলে যে অর্থ বের হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে যে বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তা সূরা আ'রাফের দ্বিতীয় রুকূ থেকে চতুর্থ রুকূর মাঝামাঝি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে দ্বিতীয় রুকূতে আদম ও হাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ রুকূতে এ কাহিনীর ফলাফলের উপর মন্তব্য করা হয়েছে। এ পূর্বাপর আলোচনা সামনে রেখে ৩৫ নম্বর আয়াতটি পড়লে পরিষ্কার জানা যায় যে....... এর মাধ্যমে সম্বোধন করে যেকথা বলা হয়েছে তা সৃষ্টির সূচনাপর্বের সাথে সম্পর্কিত, কুরআন অবতরণকালের সাথে সম্পর্কিত নয়। অন্যকথায় বলা যায়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাপর্বেই আদম সন্তানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে যে হেদায়াত পাঠানো হবে তার আনুগত্যের উপর তোমাদের নাজাত নির্ভর করবে।

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত কুরআনের তিনটি স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি স্থানে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ.) এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এর অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি এসেছে সূরা বাকারায় (৩৮ নম্বর আয়াত), দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আ'রাফের (৩৫ নম্বর আয়াত) এবং তৃতীয় আয়াতটি সূরা ত্বহার (১২৩ নম্বর আয়াত)। এ তিনটি আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর সাদৃশ্যের সাথে সাথে তাদের স্থান কালের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

কুরআনের মুফাস্‌সিরগণ অন্যান্য আয়াতের ন্যায় সূরা আ'রাফের এ আয়াতটিকেও হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এর কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত গণ্য করেন। আল্লামা ইবনে জারির (রহ.) তাঁর তফসীর গ্রন্থে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবু সাইয়ার আস্-সুলামীর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন 'আল্লাহ তায়ালা এখানে হযরত আদম (আ.) ও তাঁর পরিজনদেরকে এক সঙ্গে ও একই সময়ে সম্বোধন করেছেন।' ইমাম রাযী (রহ.) তাঁর তফসীরে কবীর গ্রন্থে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন 'যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, অথচ তিনি শেষ নবী, তাহলে এর অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা এখানে উম্মতদের ব্যাপারে নিজের নীতি বর্ণনা করেছেন।' আল্লামা আলুসী তাঁর তফসীরে রুহুল মাআনী গ্রন্থে বলেছেন 'প্রত্যেক জাতির সাথে যে ব্যাপারটি ঘটে গেছে সেটাই এখানে কাহিনী আকারে বর্ণনা হয়েছে। এখানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে বনী আদম অর্থে গ্রহণ করলে মারাত্মক ভুল ও সুস্পষ্ট অর্থের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কারণ রসূল শব্দটি এক বচনে না বলে বহু বচনে 'রুসুলুহু' وَرُسُلُهُ বলা হয়েছে।' আল্লামা আলুসীর বক্তব্যের শেষাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি এখানে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সম্বোধন করা হতো, তাহলে তাদেরকে কখনো একথা বলা যেতোনা যে, 'তোমাদের মধ্যে কখনো রসূলগণ আসবেন।' কারণ এ উম্মতের মধ্যে একজন রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো রসূল আসার প্রশ্নই ওঠেনা।

www.icsbook.info

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ এ আয়াতটিকে এর পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন না করলে, কাদিয়ানীরা এর যে অর্থ করেছে তা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে বক্তব্য প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা দ্বিতীয় রুকূ থেকে শুরু হয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। এসব আয়াতে হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত সমস্ত নবী ও তাঁদের জাতির কথা আলোচনা করে বলা হয়েছে 'প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক যুগে নবীগণ মানুষদেরকে একটি শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন, তাঁদের পদ্ধতিও ছিলো এক ও অভিন্ন এবং তাঁদের উপর আল্লাহ তায়ালা একই ধরনের অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। বিপরীতপক্ষে পথভ্রষ্ট জাতিরা হামেশা আল্লাহর পথ ত্যাগ করে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে।' এ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি কোনোক্রমেই নিম্নোক্ত অর্থে নাযিল হয়নি : 'হে রসূলগণ! তোমরা যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আসবে, তোমরা পাক পবিত্র খাদ্য খাও এবং ভালো কাজ করো।' বরং এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, নূহ (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যতো নবী এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা এই একই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা পাক পবিত্র খাদ্য ও ভালো কাজ করো।*

এ আয়াতটি থেকেও মুফাস্‌সিরগণ কখনো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুয়্যতের দরজা খুলে যাওয়ার অর্থ নেননি। আরো বেশি অনুসন্ধান ও মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাইলে বিভিন্ন তফসীর গ্রন্থে এ স্থানটির আলোচনা পাঠ করতে পারেন।

لوعاش ابراهيم لكان نبيا অর্থাৎ ইবরাহীম (রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র) বেঁচে থাকলে অবশ্যি নবী হতো।-এ হাদিসটি থেকেও কাদিয়ানীগণ যে প্রমাণ উপস্থাপন করেন তা চারটি কারণে ভুল।

এক. যে রেওয়ায়েতে এটিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তার সনদ দুর্বল এবং কোনো মুহাদ্দিসও এই সনদকে শক্তিশালী বলেননি।

দুই. নববী ও ইবনে আবদুল বারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ এ হাদিসের বিষয়বস্তুকে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। ইমাম নববী তাঁর "তাহযীবুল আস্‌মা ওয়াল্ লুগাত' গ্রন্থে লিখেছেন :

---

* অর্থাৎ 'হে রসূলগণ! পাক পবিত্র খাদ্য খাও এবং ভালো কাজ করো, অবশ্যি তোমরা যাকিছু করো আমি তা সব জানি।' (সূরা মুমিনুন : আয়াত ৫১)

www.icsbook.info

اما ما روى عن بعض المتقدمين لو عاش ابراهيم لكان نبيا فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوا على عظيم

অর্থাৎ 'আর কোনো কোনো পূর্ববর্তী আলেম যে কথা লিখে গেছেন, যদি ইবরাহীম (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র) জীবিত থাকতো, তাহলে সে নবী হতো- একথাটি সত্য নয়। কারণ এটি গায়েব সম্পর্কে কথা বলার দুঃসাহস এবং না ভেবে-চিন্তে মুখ থেকে একটি কথা বলে ফেলার মতো।'

আল্লামা ইবনে আবদুল বার 'তামহীদ' গ্রন্থে লিখেছেন :

لاادرى ما هذا فقد ولد نوح عليه السلام غير نبى ولو لم يلد النبى الانبياء لكان كل احد نبيا لانهم من نوح عليه السلام.

অর্থাৎ 'আমি জানিনা এটি কেমন বিষয়বস্তু। নূহ (আ.) এর পরিবারে এমন সন্তান জন্ম নিয়েছে যে নবী ছিলনা। অথচ যদি নবীর পুত্রের জন্যে নবী হওয়া অপরিহার্য হতো, তাহলে আজ দুনিয়াতে সবাই নবী হতো। কারণ সবাই নূহ (আ.) এর আওলাদ।'

তিন. অধিকাংশ রেওয়ায়েতে এ হাদিসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তির পরিবর্তে সাহাবাগণের উক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার তাঁরা এই সঙ্গে একথাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী নেই তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর পুত্রকে উঠিয়ে নিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুখারির রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে :

عن اسمعيل بن ابى خالد قال قلت لعبد الله بن ابى اوفى ارايت ابراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضى ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبى عاش ابنه ولكن لانبى بعده - (بخارى كتاب الادب باب من سمى باسماء الانبياء)

"ইসমাইল ইবনে আবী খালেদ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছিলেন? তিনি বলেন, সে শৈশবেই মারা যায়। যদি আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো নবী পাঠাবার ফায়সালা করতেন তাহলে তাঁর পুত্রকে জীবিত রাখতেন। কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী নেই।"

হযরত আনাস (রা.) প্রায় এরই সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : ولو بقى لكان نبيا لكن لم يبق لان نبيكم اخر الانبياء

"যদি সে জীবিত থাকতো তাহলে নবী হতো। কিন্তু সে জীবিত থাকেনি। কারণ

www.icsbook.info

তোমাদের নবী হচ্ছেন শেষ নবী।" (তফসীরে রুহুল মাআনী : ২২ খণ্ড, পৃ : ৩)

চার. যে রেওয়ায়েতে এ উক্তিটিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি বলা হয়েছে এবং যাকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়েছে যদি তাতে সাহাবায়ে কেরামের এ ব্যাখ্যা না থাকতো এবং মুহাদ্দিসগণের এ উক্তিগুলো সেখানে সংযুক্ত নাও হতো তবুও তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতোনা। কারণ হাদিস শাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হচ্ছে, কোনো একটি রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু যদি বহুসংখ্যক নির্ভুল হাদিসের সাথে সংঘর্ষশীল হয়, তাহলে তাকে কোনোক্রমেই গ্রহণ করা যেতে পারেনা। তাহলে এখন দেখা যাক, একদিকে অসংখ্য নির্ভুল ও শক্তিশালী সনদসম্বলিত হাদিস, যাতে পরিষ্কারভাবে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুয়্যতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আর অন্যদিকে এই একটিমাত্র রেওয়ায়েত, যা নবুয়্যতের দরজা খোলা থাকার সম্ভাবনা প্রকাশ করে- এই দুটি অবস্থা পর্যালোচনা করলে এই একটি মাত্র রেওয়ায়েতের মুকাবিলায় অসংখ্য রেওয়ায়েতকে কেমন করে প্রত্যাখ্যান করা যায়? (তরজমানুল কুরআন : নভেম্বর ১৯৫৪ ঈসায়ী)

খতমে নবুয়্যত প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : এতে সন্দেহ নেই, মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে নতুন কোনো নবী আসবেনা। তা সত্ত্বেও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে এবং কাদিয়ানী জামাতের কোনো কোনো বক্তব্য আমার কাছে ভালো মনে হয়।

যেমন, মির্জা সাহেবের মুখমণ্ডল আমার দৃষ্টিতে নিষ্পাপ এবং শিশুদের মতো দেখায়। একজন মিথ্যাবাদী প্রতারক ব্যক্তির মুখমণ্ডল কি এমনটি হতে পারে? আসমানী বিয়ে ব্যতিত তার প্রায় সকল ভবিষ্যত বাণীই বাস্তবে রূপলাভ করেছে। তাঁর দলও দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তাদের মধ্যে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিরাট জযবা এবং ত্যাগ ও কুরবানী পরিলক্ষিত হয়।

এসব জিনিস আমাকে ভাবনায় ফেলেছে। আমি চাই আমার হৃদয় মনকে আশ্বস্ত করার জন্য এ বিষয়ে আপনি আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলুন, যাতে করে আমার ভাবনা ও পেরেশানি দূর হয় এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য উন্মোচিত হয়ে যায়।

উত্তর মির্জা গোলাম আহমদের ব্যাপারে যে কারণগুলো আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর মৌলিক কোনো গুরুত্ব নেই। আর একজন নবী হবার দাবিদারের দাবিকেও এসব জিনিসের ভিত্তিতে কখনো যাচাই বাছাই করা যেতে পারেনা। কিন্তু তার দাবিকে চিন্তাযোগ্য মনে করার জন্যে এর চাইতে মজবুত কারণ বর্তমান থাকলেও তা ভ্রূক্ষেপযোগ্য ছিলনা। এর কারণ হলো,

www.icsbook.info

কুরআন মজীদ ও হাদিস শরীফ উভয়ের দৃষ্টিতে নবুয়্যত দীনের একটি মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ মানুষের ঈমান ও কুফরীর ভিত্তি এরই উপর স্থাপিত এবং এরই ভিত্তিতে তার আখেরাতে সাফল্য ও ব্যর্থতার ফায়সালা হবে কোনো সাচ্চা নবীকে না মানলে মানুষ কাফির হয়ে যাবে।

আবার মিথ্যা নবীকে মেনে নিলেও কাফির হয়ে যাবে। এই ধরনের মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী কোনো বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অস্পষ্ট, জটিল ও সন্দেহযুক্ত করে রাখেননি। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে পথ দেখিয়েছেন। মানুষের দীন ও ঈমান যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় এবং তার গোমরাহীর জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়ী না হন এর ব্যবস্থা তাঁরা আগেই করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে কখনো কোনো নবীর যুগে একথা বলা হয়নি যে, নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর কোনো নবী আসবেননা। এর অর্থ হচ্ছে, নবীদের আসার দরজা তখন খোলা ছিলো এবং তখন আর কোনো নবী আসবেননা একথা বলে কোনো ব্যক্তি কোনো নবুয়্যতের দাবিদারের দাবি অস্বীকার করার অধিকার রাখতোনা। আবার সে যুগে নবীগণ তাঁদের পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকতেন। তাঁরা নিজেদের অনুসারীদের নিকট থেকে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের আনুগত্য করার শপথ নিতেন। এসব কার্যক্রমও কথাটিকে আরো শক্তিশালী করতো যে, কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করলে কোনো প্রকার ভাবনা চিন্তা না করে এক কথায় তাকে নাকচ করা চলতোনা। বরং তার দাওয়াত, ব্যক্তিত্ব, কার্যাবলী ও অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি যথার্থ আল্লাহর নবী না মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদার তা জানার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। এখন ব্যাপারটি শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরে আর কোনো নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেননি এবং উম্মতের নিকট থেকে তার প্রতি আনুগত্যের শপথও নেননি, বরং বিপরীত পক্ষে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী এবং তিনি একটা দু'টা নয়, অসংখ্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদিসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে নবুয়্যতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর কোনো নবী আসবেননা। এখন যে

www.icsbook.info

নবুয়্যতের দাবি নিয়ে দাঁড়াবে সে হবে দাজ্জাল। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর নবীর দৃষ্টিতে কি বর্তমানে মানুষের ইসলাম ও কুফরীর ব্যাপারটি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ নয়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী মুমিনগণই কি শুধুমাত্র কুফরীর ফিতনা থেকে বাঁচার অধিকারী ছিলো? এজন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণ কি শুধু তাদেরকেই নবুয়্যতের দরজা খোলা থাকার এবং নবীদের আগমনের সিলসিলা জারি থাকার কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানার ব্যবস্থা করেছিলেন? কিন্তু এখন তাঁরা জেনে বুঝেই কি আমাদেরকে এ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন? অর্থাৎ একদিকে থাকছে নবী আসার সম্ভাবনা, যাকে মানা না মানার কারণে আমরা ঈমানদার বা কাফির হয়ে যেতে পারি। আবার অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণ কেবল নবীর আগমনের খবর থেকে আমাদেরকে অনবহিত রেখেই ক্ষান্ত হননি, বরং এর থেকেও এগিয়ে এসে তাঁরা অনবরত এমন সব কথা বলে যাচ্ছেন যার ফলে আমরা মনে করছি নবুয়্যতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং এজন্যে নবুয়্যতের দাবিদারকে মেনে নিতে পারছিনা। আপনাদের বিবেক বুদ্ধি সত্যিই কি একথা বলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে এ ধরনের প্রতারণা করতে পারেন?

কাদিয়ানীরা 'খাতামান নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্যা যা খুশি করতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে এতোটুকু কথা তো তারা অস্বীকার করতে পারবেনা যে, নবুয়্যতের সিলসিলা খতম করাও এর অর্থ হতে পারে এবং উম্মতের উলামা ও জনগণের কোটির মধ্যে নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়"শ নিরানব্বই জন এ শব্দের এই অর্থই করে। প্রশ্ন হচ্ছে, নবুয়্যতের মতো এমন একটি নাজুক বিষয়ে, যার উপর মুসলমানদের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে, আল্লাহর কি এমন একটি ভাষা ব্যবহার করা উচিত ছিলো, যা থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাদিয়ানী ছাড়া সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী এই মনে করেছে যে, এখন আর কোনো নবী আসবেননা? আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিগুলো তো এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ভিন্নতর ব্যাখ্যার অবকাশই রাখেনা। এ উক্তিগুলোতে দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেননা। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর নবীর কি আমাদের সাথে এমন কোনো শত্রুতা ছিলো যার জন্যে তাঁর পরে নবী আসবেন অথচ তিনি উল্টো আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে গেলেন যাতে করে আমরা তাকে না মানি এবং কাফির হয়ে জাহান্নামে চলে যাই?

এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যতোই আকর্ষণীয় চেহারা সুরাতের অধিকারী হোক না কেন, তার ভবিষ্যদ্বাণী শতকরা একশো ভাগ সত্য প্রমাণিত হলেও এবং তার হাজারো কৃতিত্ব সত্ত্বেও আমরা তার নবুয়্যতের দাবিকে বিবেচনাযোগ্যই মনে

www.icsbook.info

করিনা। কারণ নবী আসার সম্ভাবনা থাকলে তবেই তো এটা বিবেচনাযোগ্য হতো। আমরা তো প্রত্যেক নবুয়্যতের দাবিদারের কথা শুনামাত্রই পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে তাকে মিথ্যুক অভিহিত করবো এবং নবুয়্যতের সপক্ষে আনা তার যুক্তি-প্রমাণের উপর কোনোই গুরুত্বারোপ করবোনা। এটা যদি কুফরী হয়ে থাকে তাহলে এর কোনো দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবেনা। কারণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সাফাই পেশ করার জন্যে আমাদের কাছে কুরআন ও রসূলের হাদিস রয়ে গেছে।[১] (তরজমানুল কুরআন : ডিসেম্বর ১৯৫৯ ঈসায়ী)

কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ঃ কাদিয়ানী মুবাল্লিগরা তাদের সকল শক্তি দিয়ে নবুয়্যতের দরজা খোলা রয়েছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতকে তারা বিশেষভাবে দলিল হিসেবে পেশ করে এবং এগুলোর দাবির বুনিয়াদ স্থাপন করে :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে সেসব লোকের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা নিয়ামত দান করেছেন। তারা হচ্ছেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোকগণ। এরা যার সঙ্গী সাথি হবেন, তাদের পক্ষে এরা কতোই না উত্তম সাথী।" (সূরা নিসা : আয়াত ৬৯)

তারা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে, এখানে ধারাবাহিকভাবে চারটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে : নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎ লোকগণ। তাদের জানামতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের লোকেরা এর মধ্য থেকে তিনটি মর্যাদা লাভ করেছে। একটি মর্যাদা লাভ করা বাকি রয়েছে– আর সেটি হলো নবুয়্যত। সেটিই লাভ করেছেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। তারা বলে, সঙ্গী সাথি হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত কেবল কিয়ামতের দিনই উপরোক্ত কয়েক শ্রেণীর লোকদের সঙ্গী হবে তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে কোনো সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎলোক নেই। আর যদি এরূপ না হয়ে থাকে তবে যেহেতু আয়াতে

১. উদাহরণস্বরূপ নবী পাকের সেই বাণীটি দেখুন, যাতে তিনি নবুয়্যতের ধারাবাহিকতাকে একটা অট্টালিকার সাথে তুলনা করেছেন। প্রত্যেক নবীকে সেই অট্টালিকার একটি ইট বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশেষে বলেছেন, অট্টালিকায় এখন একটি মাত্র ইট স্থাপনের জায়গা বাকি ছিলো আর 'সেই সর্বশেষ ইটটি হলাম আমি।'

www.icsbook.info

মর্যাদার চারটি স্তরের কথা উল্লেখ রয়েছে সেহেতু 'আম্বিয়া' শ্রেণীকে উম্মতের মধ্যে বর্তমান থাকার ব্যাপারটাকে কোন দলিলের ভিত্তিতে বাদ রাখা যেতে পারে?

يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِي ۙ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

"হে আদম সন্তান! স্মরণ রেখো, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে যদি এমন রসূল আসে যাঁরা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাবে, তখন যে কেউ নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের আচার আচরণকে সংশোধন করে নেবে তার জন্য কোনো দুঃখ ও ভয়ের কারণ ঘটবেনা।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৯)

তারা এই আয়াত দ্বারা এই দলিল নিয়ে থাকে যে, এই আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর আয়াতটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো নবী আগমনের অবকাশই যদি না থাকতো তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল হবে কেন? তাছাড়া এখানে يَأْتِيَنَّكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো– 'অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার নবী আসবে'। সুতরাং এই আয়াত থেকে প্রমাণ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের অধীনে নবী আসতে পারে।

আপনার কাছে দাবি হলো, আপনার পত্রিকায় যুক্তি প্রমাণসহ এই বিষয়ে আলোকপাত করুন। যাতে করে সকলেই এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

উত্তর : আল্লাহ ও তাঁর রসূল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধানের মাধ্যমে যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসা করে দেন তখন সেই সুস্পষ্ট বিধানকে দূরে সরিয়ে রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অসম্পর্কিত আয়াত ও হাদিস থেকে নিজের প্রয়োজন মতো অর্থ বের করা এবং কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত আকীদা পোষণ করা আর সেই অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া চরম গোমরাহী, বরং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর বিধানের পরিপন্থী কোনো পথ অবলম্বন করে, সে অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের বিদ্রোহ করে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁদেরই ঘোষণা ও বিধান বিকৃত করে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা কোনো ছোটখাটো বিদ্রোহ নয়। এ কাজ যারা করে তাদের সম্পর্কে আমরা কোনোক্রমেই একথা ভাবতে পারিনা যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চলে। সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী কিনা এবং তাঁর পরে আর

www.icsbook.info

কোনো নবী আসবেন কিনা – এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে আমরা وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ (النساء ٦٩) এবং يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ প্রভৃতি আয়াতের দিকে মনোসংযোগ করতে পারতাম যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল বিশেষ করে ঐ প্রশ্নের জবাব কুরআন ও হাদিসের কোথাও না দিয়ে দিতেন। কিন্তু যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে 'খাতামান নাবিয়্যীন' আয়াতে এবং রসূলের পক্ষ থেকে অসংখ্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদিসে আমরা বিশেষ করে এ প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাব পেয়ে গেছি তখন ومن يطع الله এবং يبنى ادم প্রভৃতি আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং সেগুলো থেকে কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী অর্থ গ্রহণ করা একমাত্র সেই ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে, যার দিলে বিন্দুমাত্র আল্লাহর ভয় নেই এবং যে ব্যক্তি একথা বিশ্বাসই করেনা যে, মরার পরে একদিন তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন দেশের দণ্ডবিধি আইনের একটি ধারায় একটি কাজকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এক ব্যক্তি এ অপরাধটিকে বৈধ কর্ম প্রমাণ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এ উদ্দেশ্যে সে ঐ বিশেষ ধারাটিকে বাদ দিয়ে আইনের অন্যান্য অসম্পর্কিত ধারার মধ্যে সামান্যতম কোনো ইঙ্গিত বা ছোটখাটো কোনো অস্পষ্ট বক্তব্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। তারপর এগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে আইনের সুস্পষ্ট ধারা যে কাজটিকে অপরাধ গণ্য করেছে তাকে একটি বৈধ কর্ম প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছে। এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ যদি দুনিয়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও আদালত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে তা কেমন করে গৃহীত হবার আশা করা যেতে পারে?

তারপর যে আয়াতগুলো থেকে কাদিয়ানীরা তাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে চায় সেগুলো পড়ার পর অবাক হতে হয় তাদের প্রমাণ কৌশল দেখে। দেখা যায় ঐ আয়াতগুলোর ঐ অর্থই নয়, যা তারা গায়ের জোরে টেনে হেঁচড়ে করতে চায়। যেসব আয়াতের উপর তারা কসরত চালিয়েছে সেগুলোর আসল অর্থ কি দেখা যাক।

সূরা নিসার ৪৯ নম্বর আয়াতে যেকথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কেবল এতোটুকু যে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকারীরা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের (সৎ ব্যক্তিবর্গের) সহযোগী হবে। এ থেকে যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে তারা হয় নবী হয়ে যাবে, নয়তো সিদ্দীক অথবা শহীদ বা সালেহীন হবে– একথা কেমন করে বের হলো? তারপর সূরা হাদিদের ১৯ নম্বর আয়াতটি একবার অনুধাবন করুন। সেখানে বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاۤءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ 'আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের উপর, তারাই হচ্ছে

www.icsbook.info

তাদের রবের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ।' এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান লাভ করার ফলে এক ব্যক্তি কেবলমাত্র সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর নবীদের ব্যাপারে বলা যায়, নবীদের সহযোগী হওয়াই ঈমানদারদের জন্যে যথেষ্ট। কোনো কাজের পুরস্কারস্বরূপ কোনো ব্যক্তির নবী হয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই সূরা নিসার আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকারীরা নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে অবস্থান করবে। আর সূরা হাদিদের আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ ও রসূলের উপর যারা ঈমান আনবে তারা নিজেরাই সিদ্দীক ও শহীদে পরিণত হবে।

আর সূরা আ'রাফের ৩৫ নম্বর আয়াত يبنى ادم اما ياتينكم সম্পর্কে বলা যায়, এটি একটি বর্ণনাধারার সাথে সম্পর্কিত। সূরা আ'রাফের ১১ থেকে ৩৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ বর্ণনা চলেছে। এ বর্ণনার পূর্বাপর বিষয়বস্তুর মধ্যে রেখে একে বিচার করলে পরিষ্কার জানা যায়, মানব জাতির সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে বনী আদমকে এ সম্বোধন করা হয়েছিল। এ আয়াতগুলো পড়ে কেমন করে এ ধারণা লাভ করা যেতে পারে যে, এগুলোর মধ্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবীদের আগমনের কথা বলা হয়েছে? এখানে তো হযরত আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রীকে যখন বেহেশত থেকে বহিষ্কার করে দুনিয়ায় আনা হয় সে সময়কার কথা বলা হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন : মে ১৯৬২ ঈসায়ী)

মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরাম "রুহামাউ বাইনাহুম" ছিলেন

প্রশ্ন : কয়েক দিন পূর্বে আমার 'সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা' বিষয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়। বক্তৃতা প্রসংগে আমি নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করি :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ

(মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর যেসব লোক তাঁর সঙ্গী সাথি, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল)

বক্তৃতা শেষ করার পর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, কুরআন তো সাহাবায়ে কিরামের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলীর চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সিফফীন ও জামালের যুদ্ধে উভয়পক্ষেই বড় বড় সাহাবিরা বর্তমান ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) পর্যন্ত এক পক্ষে ছিলেন। এসব ঘটনাবলীর আলোকে رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ (তারা পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল) আয়াতাংশটির তাৎপর্য কি হতে পারে?

এ বিষয়ে আমার সাধ্যানুযায়ী চিন্তা করেছি। কিছু কিছু দীনি কিতাব অধ্যয়ন করে দেখেছি। আলেম বন্ধুদের নিকট জানতে চেয়েছি। কিন্তু কিছুতেই পূর্ণ আশ্বস্ত হতে

www.icsbook.info

পারিনি, তাই আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। মেহেরবানী করে উক্ত ঘটনাবলী সম্মুখে রেখে আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জানাবেন– যাতে করে এ বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ সংশয় বিদূরিত হয়ে যায়।

উত্তর : আমি দুঃখিত যে, অনেক দেরি করে আপনার পত্রের জবাব দিচ্ছি। এ মাসে দারুণ ব্যস্ততা ছিলো, যার কারণে প্রাপ্ত চিঠিপত্র পড়ারই সময় হয়নি, জবাব দেওয়া তো দূরের কথা। আশা করি আমার সমস্যা ও অপরাগতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেরি হবার জন্যে মনে কিছু নেবেননা।

"أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" আয়াতটি সম্পর্কে সম্মানিত প্রশ্নকর্তা যে সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করেছেন তার ভিত্তি দু'টি অনুমান ও কল্পনার উপর। আর উভয়টিই প্রকৃত সত্যের বিপরীত অবাস্তব। প্রথম অনুমানটি হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির প্রশংসা করে কোনো কথা বলা হলেই সেকথার এই অপরিহার্য অর্থ ধরে নেয়া যে, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে কখনো উক্ত প্রশংসার বিপরীত সামান্য আংশিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও পাওয়া যেতে পারবেনা। অথচ যখনই মানুষের প্রশংসা করা হয়, তখন তা করা হয়ে থাকে তার ভূমিকার প্রভাবশালী অবস্থার ভিত্তিতে। কখনো কখনো এর বিপরীত কোনো কিছু তার মধ্যে পরিলক্ষিত হলে তা তার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে বাতিল করে দেয়না। আমরা সাহাবায়ে কিরামকে পৃথিবীর সর্বাধিক পরহেযগার ও নেককার লোক সমষ্টি বলে আখ্যায়িত করি। তাঁদের জীবন চরিতের সামগ্রিক বিচারে তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ হিসেবে কখনো তাঁদের মধ্যে কোনো প্রকার মানবিক দুর্বলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতোনা।

সে যুগেও তো কারো ব্যভিচারের, কারো চুরির, কারো মিথ্যা দোষারোপের শাস্তি হয়েছিল। আর এই সাজাপ্রাপ্ত লোকেরা সাহাবিত্বের মর্যাদায়ই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেননা ঈমান আনার পর যে ব্যক্তিই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তিনি সর্বাবস্থায়ই সাহাবি ছিলেন। আর এ ধরনের অপরাধী হয়ে যাবার ফলে না তাদের ঈমান চলে গিয়েছিল আর না বাতিল হয়েছিল তাঁদের সাহাবি হবার মর্যাদা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের সমাজে ব্যভিচার, চুরি ও অপরাধের প্রকাশ ঘটেনি। এগুলো ছিলো নিতান্তই বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি ঘটনা। সংস্কার সংশোধন এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিক থেকে তাঁরা উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর কোনো মানব সমাজ কখনো সে স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। এখন বলুন তো উক্ত দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তাঁদের এই সামগ্রিক গুণ বৈশিষ্ট্যকে মসিলিপ্ত করতে পারে কি?

www.icsbook.info

এমনি করে 'রুহামাউ বাইনাহুম' বৈশিষ্ট্যটি তাঁদের সামগ্রিক চরিত্র ও বিজয়ী স্বভাবের ভিত্তিতে নিরূপিত। এ ব্যাপারেও প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কখনো কোনো মানব সমাজকে পারস্পরিক মায়া মুহাব্বাত, দয়া অনুগ্রহ এবং সহমর্মিতা ও কল্যাণ কামনার দিক থেকে আর পরস্পরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিক থেকে এতোটা উচ্চ স্তরের পাওয়া যায়নি, যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন সাহাবায়ে কিরামের সমাজ। সমষ্টিগত দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ গুণটি তাঁদের মধ্যে সম্ভাব্য পরিপূর্ণতা লাভ করে, যতোটা অন্য কোনো মানব সমাজের ব্যাপারে কল্পনাই করা যেতে পারেনা। কিন্তু মানুষ যতোক্ষণ মানুষই থাকছে ততোক্ষণ তাদের মধ্যে অবশ্যি মতপার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। মতপার্থক্য ঝগড়া বিবাদের রূপও ধারণ করতে পারে। সাহাবায়ে কিরামও মানুষই ছিলেন। উর্ধ্বজগত হতে কোনো অতি মানবগোষ্ঠী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্যে নাযিল হয়ে আসেনি। একে অপরের সঙ্গে উঠা-বসা, লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে অবশ্যি মানুষ হিসেবে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো এবং এই মতপার্থক্য কখনো কখনো শক্ত আকারও ধারণ করতো। কিন্তু এসব খুঁটিনাটি ঘটনা দ্বারা তাঁদের সেই সামষ্টিক সোনালী বৈশিষ্ট্য 'রুহামাউ বাইনাহুম'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হতোনা। কেননা এটা ছিলো তাঁদের শক্তিশালী বিজয়ী বৈশিষ্ট্য।

এই সন্দেহ সংশয়ের পিছনে দ্বিতীয় যে অনুমানটি কাজ করছে তা হচ্ছে- সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কখনো কোনো মতপার্থক্য প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার গুরুত্ব এতোই বেশি যে, তাঁদের 'রুহামাউ বাইনাহুম' বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। অথচ তাঁদের মতপার্থক্যের যে ইতিহাস আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, এই পবিত্রাত্মা লোকদের পরস্পরের মধ্যে যখন লড়াই পর্যন্ত সংঘটিত হতো, তখন লড়াই ক্ষেত্রে পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে 'রুহামাউ বাইনাহুম' এর অনুপম বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতো। জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে অবশ্যি তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর কোনো যুদ্ধের ইতিহাসে কি আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের কাউকেও পরস্পরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করতে দেখেছেন- যেমনটি দেখা গেছে এই বুযুর্গ সাহাবিগণের মধ্যে? তাঁরা একান্তই নেক নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে নিজেকে হকের পক্ষে মনে করে লড়াই করেছেন। ব্যক্তিগত শত্রুতা ও ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য কেউ লড়াই করেননি। অপরপক্ষ তাদের পজিশনকে ভুল মনে করেছে এবং স্বীয় ভুল পজিশনকে ভুল বলে অনুভব করতে পারছেনা বলে তাঁরা আফসোস করতেন।

www.icsbook.info

তাঁরা একপক্ষ অপরপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যুদ্ধ করেননি। বরঞ্চ নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী অপরপক্ষকে সঠিক পথে আনতে চাইতেন। তাঁদের কেউ অপরের ঈমানকে অস্বীকার করতেননা। অপরের ইসলামী অধিকারসমূহ অস্বীকার করতেননা। এমনকি অপরের মর্যাদা এবং ইসলামের জন্যে কৃত সেবাসমূহকেও অস্বীকার করতেননা। তাঁরা একে অপরকে হীন লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেননি। যুদ্ধের সময় অবশ্যি তাঁরা যুদ্ধের হক আদায় করেছেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও নিহতদের প্রতি তাঁদের ছিলো প্রাণভরা মুহাব্বাত। যুদ্ধ বন্দীদের বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা দায়ের করা, তাদের শাস্তি প্রদান করা বিংবা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা তো দূরের কথা, তাদেরকে বন্দী করে ফেলে রাখা এবং তাদের উপর কোনো প্রকার জিদ উঠানো পর্যন্ত ছিলো তাঁদের নীতিবিরুদ্ধ। লক্ষ্য করে দেখুন, জংগে জামালে উভয়পক্ষ যখন মুখোমুখি দণ্ডায়মান, হযরত আলী (রা.) অপরপক্ষের হযরত যুবাইরকে (রা.) কাছে ডাকেন।

তিনিই নির্দ্বিধায় তাঁর নিকট চলে আসেন। তাঁদের উভয়ের কারোই অপরের সম্পর্কে এ আশংকা ছিলনা যে, তিনি হঠাৎ করে তাঁকে আক্রমণ করবেন। উভয় ফৌজের মাঝখানে তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। উভয় পক্ষের সৈন্যরা তাঁদের অবস্থা দেখে হয়রান হয়ে যান, যেখানে তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছেন, সেখানে একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। একান্তে কথাবার্তা বলে তাঁরা নিজ নিজ ফৌজের দিকে ফিরে যান। হযরত আলীর ফৌজের লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, আমীরুল মুমিনীন।! কেন আপনি উক্ত যুদ্ধের ময়দানে বিরুদ্ধ পক্ষের এক উন্মুক্ত তরবারিধারী ব্যক্তির সংগে একা একা সাক্ষাত করতে গেলেন? এর জবাবে তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন : জানো তিনি কে? তিনি রসূলের ফুফু সাফিয়ার (রা.) পুত্র। আমি রসূলুল্লাহর একটি কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেছেন কতোই না ভালো হতো আরো পূর্বে যদি আমার একথা স্মরণ হতো। তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে আসতামনা। একথা শুনে লোকেরা বলেন : আলহামদু লিল্লাহ! আমীরুল মুমিনীন, তিনি তো রসূলুল্লাহর হাওয়ারী। তিনি তো রসূলে খোদার শাহসওয়ার। তাঁর জন্যেই আমরা বেশি ভয় পাচ্ছিলাম।' অপরদিকে হযরত যুবাইর স্বীয় বাহিনীর নিকট ফিরে গিয়ে বলেন– শিরক এবং ইসলামের মধ্যে সংঘটিত কোনো লড়াইয়ে যখনই আমি অংশগ্রহণ করেছি, তাতে আমি বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধে না আমার মন সাড়া দেয় আর না বিচক্ষণতা। একথা বলে তিনি ফৌজ থেকে বের হয়ে চলে যান।

www.icsbook.info

একইভাবে হযরত আলী এবং হযরত তালহার (রা.) মধ্যে উভয় বাহিনীর মাঝখানে একান্তে সাক্ষাত হয়। তাঁরা একে অপরকে নিজ মত মানাতে চেষ্টা করেন। লড়াই আরম্ভ হলে হযরত আলী নিজ বাহিনীকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন : সাবধান! কাউকেও শাস্তি দিয়ে হত্যা করবেনা। আহতদের গায়ে হাত উঠাবেনা। বিরুদ্ধ পক্ষের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে যাওয়া মাল তোমরা গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু তাদের শহীদদের ঘরে যে মাল সম্পদ রয়েছে, সেগুলো তাদের উত্তরাধিকারীদের হক। তাঁদের স্ত্রীদের জন্যে ইদ্দত পালন করতে হবে।' এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন : যেহেতু তাদের মাল সামান আমাদের জন্য বৈধ, তবে তাদের স্ত্রীরা বৈধ হবেনা কেন? হযরত আলী (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার মাতা আয়েশাকে (রা.) গ্রহণ করতে প্রস্তুত?' লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো আস্তাগফিরুল্লাহ! যুদ্ধশেষে হযরত আলী নিহতদের মধ্যদিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত তালহার পুত্র মুহাম্মদের লাশ দেখতেই অবলিলাক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে :

رحمك الله يامحمد لقد كنت فى العبادة مجتهدا اناء الليل قواما فى الحر صواما -

"হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! তুমি ছিলে বড় ইবাদতগুজার! নিশি রাতে জেগে নামায আদায়কারী। কঠিন গরমের সময় রোযাদার।'

হযরত যুবাইরের হত্যাকারী পুরস্কারের আশায় হাযির হলে তিনি তাঁকে জাহান্নামের সুসংবাদ (!) প্রদান করেন। হযরত আয়েশার তাঁবুর নিকট পৌঁছলে কেবল এতোটুকুই বলেন : "হে তাঁবুবাসিনী! আল্লাহ আপনাকে ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আপনি যুদ্ধ করার জন্যে বেরিয়ে এসেছেন।" অতপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তিনি তাঁকে মদিনা পাঠিয়ে দেন।[১] অন্যদিকে হযরত আয়েশাও এই সদাচরণের জন্যে তাকে দিল খুলে দোয়া করেন :

جزى الله ابن ابى طالب الجنة .

"আল্লাহ আবু তালিবের পুত্রকে জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করুন।"

হযরত তালহার[২] (রা.) পুত্র মূসা (রা.) হযরত আলীর সংগে সাক্ষাত করতে আসলে তিনি তাকে বসতে দিয়ে বলেন : আমি আশা করি তোমার পিতা সেসব লোকদের মধ্যে হবেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

"আমরা তাদের অন্তরের সমস্ত কালিমা বিদূরিত করে দেবো আর তারা জান্নাতে মুখোমুখি আসনসমূহে ভাই ভাই হিসেবে উপবেশন করবে।"

---

১. হযরত আয়েশা বিরুদ্ধ পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন –অনুবাদক

২. প্রকাশ থাকে যে, হযরত তালহা (রা.) জামাল যুদ্ধে হযরত আলীর বিপক্ষে থেকে শহীদ হন। –অনুবাদক

www.icsbook.info

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে : এ কে আপনার নিকট এসেছিল? তিনি বলেন : সে আমার ভাতিজা। লোকটি বললো : সে যদি আপনার ভাতিজাই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তো বদবখত হয়ে যাই। হযরত আলী লোকটির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন: তোমার ধ্বংস হোক! আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বলে দিয়েছেন : আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি। তোমরা যেরূপ ইচ্ছা আমল করো।"

এবার চিন্তা করে দেখুন, তাঁদের পারস্পরিক লড়াইর প্রকৃতি কিরূপ ছিলো। তাঁরা পরস্পরের প্রতি তলোয়ার উত্তোলন করেও রুহামাউ বাইনাহুম ছিলেন। কঠিন যুদ্ধাবস্থায়ও তাঁদের পরস্পরের মর্যাদা, সম্মান, মুহাব্বাত, ইসলামী অধিকারসমূহ পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন ছিলো। পূর্বের তুলনায় তাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তী লোকেরা তাঁদের কারো প্রতি দরদী হয়ে যদি অপরকে গালি দিয়ে থাকে, তবে তা এ লোকদেরই বদতমিজী। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম শত্রুতার বশবর্তী হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতেননা। আর লড়াই করেও তাঁরা পরস্পরের শত্রু হতেননা। (তরজমানুল কুরআন যুলহজ্জ ১৩৭৬ হিজরী, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী)

মুশরিকদের সন্তানরা কি জান্নাতে যাবে ?

প্রশ্ন : আমি আঠারো বছরের একজন সিন্ধি যুবক। মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পর বর্তমানে দু'বছর থেকে আরবি মাদ্রাসায় দীনি শিক্ষা গ্রহণ করছি। আমাদের এখানে আরবি শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা এমন পদ্ধতির যে, প্রথমেই এ শিক্ষা সম্পর্কে আমার অন্তরে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়ে যায়। অতপর এক বছরের মধ্যেই এ 'আরবি শিক্ষা' আমাকে 'ধর্মহীন' বানিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু যেহেতু আমার 'সিরাতুল মুস্তাকীম' লাভের আন্তরিক বাসনা ছিলো, সেজন্যে সবসময় আল্লাহর দরবারে দোয়া করে আসছি, তিনি যেন আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরম মেহেরবানীতে পুনরায় আমাকে ঈমানের মতো অমূল্য সম্পদ দান করেছেন। তাই এখন আমি তাঁরই একজন আন্তরিক– নিষ্ঠাবান মুসলিম। আমি জাতীয়তাবাদকে চরম ঘৃণা করি এবং মানবতাবাদের অনুসারী। এই এক বছরে আমি 'মসনদ ও মিম্বর' দু'টোই দেখেছি। কিন্তু এর কোনোটা দ্বারাই মন আশ্বস্ত হয়নি। এই স্বস্তি ও সান্ত্বনার নিয়ামত যদি কোথাও থেকে লাভ হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে ঐ মহান কিতাবের অধ্যয়ন দ্বারা যাকে লোকেরা 'কুরআনে হাকীম' বলে থাকে।

এখন একদিকে ইসলামকে তো আমি 'নিজের দীন' হিসেবে মেনে নিয়েছি, তা সত্ত্বেও অপরদিকে অধ্যয়নকালে কোনো কোনো হাদিস এবং ফিকহী মাসআলা

www.icsbook.info

এমন মনে হয় যেগুলো অনেক সময় আমাকে পেরেশান করে তোলে। আজকের ঘটনাটাই বলছি। মাদ্রাসায় মিশকাতের পাঠদান চলছিল। উস্তাদ যখন 'তাকদীরের প্রতি ঈমান' অধ্যায়ের নিম্নোক্ত হাদিসটি পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন :

عن ابن مسعود قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم الوائدة والمؤودة فى النار

"ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বালিকাকে জীবিত প্রোথিতকারী এবং প্রোথিত বালিকা উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

তখন আমি সম্মানিত উস্তাদকে শুধুমাত্র এতোটুকু আরয করলাম 'হাদিসটি আমার বুঝে আসেনি।' তিনি জবাব দিলেন : তোমার কি বুঝটা আছে যে, তুমি এ হাদিস বুঝতে পারবে? তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু 'আমান্না ওয়া সাদ্দাকনা' (ঈমান আনলাম এবং সত্য বলে স্বীকার করলাম) বলা। আমি বললাল : একথা ঠিক, আমার বুঝে কমতি আছে, কিন্তু এতোটুকু তো বুঝতে পারি যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মুবারক দিয়ে এমন না ইনসাফী কথা বেরুতে পারেনা। এ হাদিস যদি তাঁরও হয়ে থাকে, তবু এর তাৎপর্য তা হতে পারেনা যা বাহ্যিক অর্থ দ্বারা মনে হয়। আর সত্যি এর তাৎপর্য যদি এটাই হয়ে থাকে তবে এ হাদিস সরওয়ারে কায়িনাতের হাদিস হতে পারেনা।' এ কথাগুলো আমার জন্যে মুসীবতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র এ কারণেই আমাকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়া হয়। বলা হয়– তুমি 'মুনকিরে হাদিস' (হাদিস অস্বীকারকারী)। অথচ হাদিস অস্বীকার করার মসলককে আমি মোটেও সঠিক মনে করিনা, বরঞ্চ গুমরাহ মনে করি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হাদিস বুঝবার অধিকার আমার আছে কিনা? না বুঝেশুনে এ ধরনের হাদিস সম্পর্কে আমরা কী করে 'আমান্না ওয়া সাদ্দাকনা' বলতে পারি? অথচ কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদিসটির সনদকে 'জয়ীফ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মেহেরবানী করে হাদিসটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেশ করে পথ নির্দেশ করবেন।

উত্তর : একথা জেনে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি যে, দারসে হাদিসের ক্লাসে একটি হাদিসের বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে আপনার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় শুধুমাত্র এই অপরাধেই আপনাকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং পাঠদানকারী মৌলভী সাহেব আপনার সন্দেহ দূর করতে অক্ষম ছিলেন। অপরাধ মূলত সেই মৌলভী সাহেবেরই ছিলো যিনি এমন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে বসেছেন, যার জট খুলবার যোগ্যতা তার ছিলনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এর জন্য শাস্তি দেয়া হলো আপনাকে। এ ধরনের কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক উলামা

www.icsbook.info

বেশ কিছু সংখ্যক সুস্থ চিন্তার অধিকারী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোককে গুমরাহীর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

যে হাদিসের বিষয়বস্তু আপনাকে পেরেশানীতে নিমজ্জিত করেছে, তা মূলত একটি বড় প্রশ্নের অংশমাত্র। তা হচ্ছে এই যে, যে শিশু বয়প্রাপ্ত হবার পূর্বে এবং বুঝেশুনে স্বেচ্ছায় কোনো সত্য কিংবা মিথ্যা ধর্ম অবলম্বন করার যোগ্যতা অর্জন করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে– তার পরিণতি কি হবে? এ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদিস পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো খুবই পরস্পর বিরোধী। এর কোনো কোনো হাদিস থেকে জানা যায়, তারা সকলেই জান্নাতে যাবে। কোনো কোনোটি থেকে জানা যায়, মুশরিকদের সন্তানরা জাহান্নামে এবং ঈমানদারদের সন্তানরা বেহেশতে যাবে। আবার কোনো কোনোটি থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইলমের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কে ফায়সালা করবেন। অর্থাৎ বয়প্রাপ্ত হয়ে তারা কি করতো? কে সালেহ মুমিন হতো আর কে অন্য কিছু হতো– এ বিষয়ে তাঁর ইলমের ভিত্তিতে তিনি ফায়সালা করবেন। পরস্পর বিরোধী অর্থবোধক এ হাদিসগুলোরই একটি হচ্ছে আপনার সেই হাদিসটি। সেটি হচ্ছে ঐ হাদিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কাফির এবং মুশরিকদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে। অন্য কথায়, শিশুদের সাথে পরকালে সেই আচরণই করা হবে, যার উপযুক্ত প্রমাণিত হবে তাদের পিতামাতা।

কোনো বিষয় সংক্রান্ত হাদিসসমূহে যখন সুস্পষ্ট ইখতিলাফ বিদ্যমান থাকে এবং সেগুলোকে একত্র করে কোনো একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ সন্ধান করা কষ্টকর হয়ে পড়ে, তখন কোন্ হাদিসটি সনদের দিক থেকে অধিকতর মজবুত এবং অর্থের দিক থেকে কুরআন ও দীনের সাধারণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যশীল– তা দেখা জরুরি হয়ে পড়ে। এ ধরনের হাদিসগুলোকে অন্য সকল হাদিসের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে।

মুহাক্কিক আলিমগণ এ নিয়ম মুতাবিক উক্ত বিষয়ের বিরোধপূর্ণ সবগুলো হাদিসকে যাচাই বাছাই করে যে মতটিকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন তা হচ্ছে এই যে : এরূপ সকল শিশুই জান্নাতে যাবে। কারণ এ মতের হাদিসগুলোই সবচাইতে মজবুত, কুরআনের বক্তব্যের সংগে সামঞ্জস্যশীল এবং দীনের সাধারণ নীতিমালাও এরই সমর্থন করে। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী লিখেছেন :

"থাকলো মুশরিকদের সন্তানদের কথা। তাদের ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। অধিকাংশ লোক বলেন, তারা নিজেদের বাপদাদাদের সংগে জাহান্নামে যাবে।

www.icsbook.info

একদল লোক তাদের ব্যাপারে কোনো প্রকার মত প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন। তৃতীয় দলের মত, তারা জান্নাতবাসী হবে। মূলত তাদের ব্যাপারে এটাই সঠিক মত। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই মতই গ্রহণ করেছেন এবং অনেক কিছু এ মতের সমর্থনে পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ বুখারির সেই হাদিসটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে হযরত ইবরাহীমকে (রা.) জান্নাতে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান তাঁর চারপাশে রয়েছে অসংখ্য মানব শিশু। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, তাদের মধ্যে কি মুশরিকদের সন্তানরাও রয়েছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, তাদের মধ্যে মুশরিকদের সন্তানরাও ছিলো।' তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "ওয়ামা কুন্না মুয়াযযিবীনা হাত্তা নাবআছা রাসূলা" –ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদান করিনা– যতোক্ষণ না কোনো রসূল পাঠাই।" আর একথা তো সর্বসম্মত যে, শিশুদের উপর কোনো প্রকার দায়িত্ব বর্তায়না এবং বয়প্রাপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত রসূলের আহ্বানও তাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়।"[১]

দীনের ব্যাপারে যাদের উপর এখনো দায়িত্ব বর্তায়নি সেসব লোকেরা সবাই জান্নাতে যাবে- সেকথা যদিও কুরআন মজিদ সরাসরি বলছেনা, কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন সুস্পষ্ট ফায়সালা দেয় যে, জাহান্নামে কেবল সেসব লোকেরাই যাবে, যারা নবীগণের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানের অনুসরণ অনুকরণ করেছে :

"যেনো তাদেরকে (রসূলগণকে) পাঠানোর পর আল্লাহর বিরুদ্ধে লোকদের কোনো যুক্তি না থাকে।" (সূরা আন নিসা : ১৬৫)

"আমি জাহান্নামকে তোর দ্বারা (শয়তান দ্বারা) পরিপূর্ণ করে দেবো, আর সেসব লোকদের দ্বারা, মানুষের মধ্য থেকে যারা তোর অনুসরণ করবে।" (সূরা সোয়াদ : ৮৫)

"যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে, তার কর্মচারিরা সেই লোকদের জিজ্ঞাসা করবে : তোমাদের নিকট কি কোনো সাবধানকারী আসেনি? তারা বলবে : হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট এসেছিল বটে, কিন্তু আমরা তাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি।" (সূরা আল মুলক : ৮–৯)

"কোনো প্রাণীর উপরই আল্লাহ তায়ালা তার শক্তি সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেননা। প্রত্যেক ব্যক্তি যে পুণ্য অর্জন করেছে তার প্রতিফল তারই জন্যে, আর যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে তার খারাপ ফল তারই উপর পড়বে।" (সূরা আল বাকারা : ১৮৬)

---

১. কিতাবুল কদর : বাবু মা'না কুল্লু মাওলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরাত।

www.icsbook.info

উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং আরো অন্যান্য আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বাকি থাকলো এ বিষয়ের হাদিসগুলোর কথা। এর মধ্যে এমন অনেকগুলো সহীহ্ বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো হয় সরাসরি বলছে যে, এসব শিশুরা জান্নাতে যাবে, কিংবা একথা প্রমাণ করছে যে, আযাবে আখিরাত থেকে তারা রেহাই পাবে। এর মধ্যে সবচাইতে মশহুর হাদিস হচ্ছে সেটি, যেটি সহীহুল বুখারি ও সহীহ্ মুসলিম বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ হয়েছে।

"এমন কোনো শিশু নেই যে 'ফিতরাতে'র উপর পয়দা হয়না। পরে তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। এর উদাহরণ হচ্ছে পশুর পেট থেকে বাছুর সুস্থ নিখুঁত জন্মগ্রহণ করে। তোমরা কি সেগুলোকে কান কাটা দেখতে পাও? (অর্থাৎ তাদের কান তো জাহিল লোকেরা পরবর্তীতে সমাজের কুপ্রথা অনুযায়ী কেটে থাকে)।"

এ হাদিসে বর্ণিত ফিতরাতের উপর পয়দা হওয়ার অর্থ ইসলামের উপর পয়দা হওয়া। কেননা এখানে ইয়াহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং মাজুসিয়াতকে ফিতরাতের প্রতিকূলে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া কোনো কোনো বর্ণনায় 'আ'লা ফিতরাতিল ইসলাম' এবং 'আ'লা হাযিহিল মিল্লাত' শব্দগুলো রয়েছে এবং তাতে একথাটা আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এ বক্তব্যের যে ফলাফল দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে, শিশু কাফির পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নিলেও পিতা-মাতার ধর্মের উপর জন্ম নেয়না, জন্ম নেয় ফিত্‌রী (প্রকৃতির) ধর্মের উপর। আর এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

"আল্লাহ্‌র সেই ফিতরাত, যার উপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌র বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারেনা। এটাই হচ্ছে সর্বোতভাবে সত্য নির্ভুল দীন।" (সূরা আর রূম : আয়াত ৩০)

শিশু মায়ের পেট থেকে কুফরী ফিতরাত নিয়ে আসেনা। কুফর, শিরক, নাস্তিকতা প্রভৃতি যা কিছুতেই নিমজ্জিত হোক না কেন, তা হয় পরে। তার পরিবেশ তাকে এগুলোতে নিমজ্জিত করে। এখন শিশু যদি সেই বয়সে না পৌঁছে থাকে, যে বয়সে বাইরের এসব প্রভাব তার উপর পড়তে পারে এবং সেগুলো গ্রহণ করে সে কাফির, মুশরিক কিংবা নাস্তিক হতে পারে, তবে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে আল্লাহর পয়দা করা সেই বিশুদ্ধ ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর এ অবস্থা কুফরী এবং নাফরমানী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাকে সেই জাহান্নামে পাঠানোর কোনো কারণই থাকতে পারেনা- যা কেবল কাফির এবং ফাসিকদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে।

www.icsbook.info

এই বক্তব্যের সাথেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসটিও সামঞ্জস্যশীল যাতে তিনি আল্লাহ তায়ালার এই বাণী উদ্ধৃত করেছেন :

"আমি আমার সকল বান্দাহকে হানিফ (একনিষ্ঠ মুসলিম) রূপে পয়দা করেছি। পরে শয়তান এসে তাদেরকে তাদের দীন থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।"

হাদিসটির কোনো কোনো সূত্রের বর্ণনায় সরাসরি 'একনিষ্ঠ মুসলিম' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ হাদিসের অর্থও এই দাঁড়ায় যে, যেসব লোক শয়তানী ভ্রষ্টতা গ্রহণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তারা একনিষ্ঠ ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করে, যা ছিলো তার জন্মগত দীন। সুতরাং তাদের আযাবে আখেরাতে নিমজ্জিত হবার কোনো কারণই থাকতে পারেনা।

এবার সেসব হাদিস দেখা যাক, যেগুল্যেতে সরাসরি বলা হয়েছে যে, কাফির এবং মুমিন সকলের শিশু সন্তানরাই জান্নাতে যাবে। এ প্রসঙ্গে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য হাদিস হচ্ছে সেটি, যা ইমাম বুখারি 'কিতাবুত তা'বীর' এবং 'কিতাবুল জানাইযে' হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত সামুরা বলেন "একদিন ফজরের নামাযের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক লম্বা স্বপ্ন আমাদের শুনালেন, যা তিনি সে রাতে দেখেছিলেন। সে স্বপ্নে তাঁকে আযাব ও সওয়াবের বহু দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। জান্নাতের এক স্থানে তাঁর সাক্ষাত হয় এক দীর্ঘ সুদেহী বৃদ্ধের সংগে। বৃদ্ধের চারপাশে ছিলো অসংখ্য মানবশিশু। যে ফেরেশতা (জিবরাঈল) তাঁকে ভ্রমণ করাচ্ছিলেন তিনি তাঁকে বলেন, এ বৃদ্ধ হলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। আর তাঁর চারপাশে ছিলো সেসব মানবশিশু যারা ফিতরাতের উপর মৃত্যুবরণ করেছে। এর ব্যাখ্যা চেয়ে উপস্থিত একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করেন : এদের মধ্যে কি মুশরিকদের সন্তানরাও ছিলো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, মুশরিকদের সন্তানরাও ছিলো।"

মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত খানসা বিনতে মুয়াবিয়া ইবনে হারীম সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসও এর সমর্থন করে। খানসা বলেন "আমার ফুফু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : জান্নাতে কারা যাবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : নবীগণ জান্নাতে যাবেন, শহীদগণ জান্নাতে যাবেন এবং শিশুরা জান্নাতে যাবে।"

এ থেকে কোনো কোনো আলেম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কুরআন মজীদ যাদেরকে 'গিলমান' এবং 'বিলদানুম মুখাল্লাদূন' (চিরস্থায়ী বালকবৃন্দ) বলে অভিহিত করেছে- এরাই হবে সেসব বালক। এ মতটি খুবই যুক্তিসংগত মনে

www.icsbook.info

হয়। সম্ভবত ব্যাপারটি এমন হবে যে, যেসব শিশুর পিতা-মাতা জান্নাতী হবেনা তাদেরকে বেহেশতবাসীদের জন্যে চিরস্থায়ী খাদিম বানিয়ে দেয়া হবে। (প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহই জানেন)।

এ মতকে সত্য বলে ধরে নিলে এর বিপরীত সবগুলো হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়তো এরি ভিত্তিতে করতে হবে, কিংবা সেগুলোর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। হতে পারে, সে হাদিসগুলো স্বস্থানে ঠিকই আছে, কিন্তু বর্ণিত শব্দমালা দ্বারা সেগুলোর যথার্থ তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছেনা। (তরজমানুল কুরআন : যিলহজ্জ ১৩৭৬ হি:, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী)

মূসা আলাইহিস সালাম এর সময়কার ফিরাউন একজন ছিলো না দু'জন?

প্রশ্ন : কুরআনের তফসীর প্রসঙ্গে আমি আমার একটি সন্দেহ পেশ করছি। তরজমানুল কুরআন জানুয়ারি ১৯৬১ ঈসায়ী সংখ্যায় সূরা কাসাসের তফসীরে আপনি মূসা আলাইহিস সালামের প্রতিদ্বন্দ্বী ফিরাউনের সংখ্যা একজনের পরিবর্তে দু'জন উল্লেখ করেছেন- যা আমার ধারণায় অতীত মুফাস্সিরদের মতের বিপরীত। এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো অধ্যয়ন করলে ফিরাউন একজন বলেই মনে হয়। যে ফিরাউনের নিকট মূসা আলাইহিস সালাম নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন সে এবং দাওয়াত অস্বীকারের কারণে যে ফিরাউন ডুবে মরেছিল এরা দুজন মূলত একই ফিরাউন। একইভাবে কুরআনে ফিরাউনের স্ত্রী কর্তৃক মূসা আলাইহিস সালামের প্রতিপালনের কথা উল্লেখ হয়েছে। একথাও জানা যায় যে, ঈমান আনার কারণে এই মহিলা ফিরাউনের হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হন। কারণ তিনি ফিরাউনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে দোয়া করেছিলেন।

আমি জানতে চাই আপনি কিসের ভিত্তিতে ডুবে মরা ফিরাউনকে সেই ফিরাউন থেকে পৃথক মনে করেন, যার ঘরে মূসা আলাইহিস সালাম প্রতিপালিত হয়েছিল?

উত্তর : ফিরাউন ছিলো মিসরের রাজাদের একটি বংশগত উপাধি। মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউন সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের সর্বসম্মত বর্ণনা হলো- তিনি দু'জন ফিরাউনের সাক্ষাৎ লাভ করেন। আধুনিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও একথার সমর্থন করে। আর যুক্তিও বলে দু'জন ফিরাউন হওয়াই উচিত। কারণ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হয়ে ফিরাউনের দরবারে পৌঁছেন। অতপর তেইশ বছরের দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পর ফিরাউন ডুবে মরে এবং বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়- এসময় হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বয়স ছিলো সম্ভবত আশি বছর। তাই এ ফিরাউন সে ফিরাউন হওয়াটা ধারণাতীত

www.icsbook.info

বলে মনে হয় যার ঘরে হযরত মূসা নবজাতক হিসেবে পৌছেছিলেন এবং যার স্ত্রী তাঁকে পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মূসা আলাইহিস সালামের ফিরাউন একজন হবার ধারণার পক্ষে যেসব আয়াত পেশ করা হয় সেগুলো এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ নয়। যেমন : প্রমাণ হিসেবে একটি আয়াত উল্লেখ করা হয় যাতে ফিরাউনের এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত হয়েছে "আমরা কি তোমাকে ছোটবেলায় আমাদের ঘরে লালন পালন করিনি?" কিন্তু বাপের কাছে প্রতিপালিত ব্যক্তিকে পুত্র কি একথা বলতে পারেনা যে, আমরা তোমাকে আমাদের এখানে প্রতিপালন করেছি? একইভাবে সূরা কাসাসে যে ফিরাউনের স্ত্রীর কথা উল্লেখ হয়েছে, কারো কারো ধারণা মতে তাকে অবশ্যি সেই ফিরাউনের স্ত্রী হতে হবে- যার কথা সূরা তাহরীমে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এদের দু'জনের পৃথক পৃথক দু'জন নারী হবার ব্যাপারে বাধা কোথায়? কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, ফিরাউনের যে স্ত্রী মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তিনি সেই ফিরাউনের স্ত্রী ছিলেন যার সামনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কাঠের বাক্সে করে পৌছেছিলেন এবং যিনি মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। (তরজমানুল কুরআন : ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ ঈসায়ী)

রসূল (সা.)-এর নিরক্ষর হওয়ার তাৎপর্য

প্রশ্ন : ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের 'তরজমানুল কুরআন' এর তফসীরের ৯১ নং টীকা অধ্যয়ন করার সময় কয়েকটি কথা মনে এলো। সেকথা কয়টি আপনার বিবেচনার জন্য পেশ করছি। আলোচ্য আয়াতে যেখানে 'উম্মী' (নিরক্ষর) শব্দটি রয়েছে, তার পূর্বাপর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে আমি এর অর্থ এটাই বুঝেছি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত লাভের পূর্বে নিরক্ষর ছিলেন। তাই বলে পরবর্তীকালে তিনি যে শিক্ষিত হননি এবং লেখাপড়া শেখেননি তা বুঝা যায়না। হতে পারে যে, নবুয়্যত লাভের পর তাঁর স্বাক্ষরতা অর্জনে মানবীয় চেষ্টা বা সাধনার কোনো অবদান ছিলনা। বরং অলৌকিকভাবে আল্লাহ স্বয়ং শিক্ষক হয়ে তাঁকে অক্ষরজ্ঞান দান করে থাকবেন। আমার এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমি তো মনে করি আয়াতটির শাব্দিক বিন্যাস আমার এ ধারণার পক্ষে।

উত্তর : আমি যেটা সঠিক মনে করেছি তা পূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ সহকারে তাফহীমুল কুরআনের ঐ আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছি, যার বরাত আপনি দিয়েছেন। আমার ঐ বিশ্লেষণে যদি আপনি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যেটা সঠিক মনে করেন, সেটাই মনে করতে থাকুন। আমি শুধু বলবো যে, পবিত্র কুরআনের সূরা

www.icsbook.info

আনকাবুতের আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ নিয়ে যদি ভালো মনে করেন আরো একটু চিন্তাভাবনা করবেন। আল্লাহ এই বাক্যটিতে স্বীয় নবীকে বলছেন, যদি এমন হতো (অর্থাৎ তুমি শিক্ষিত হতে) তাহলে বাতিলপন্থীদের জন্য তোমার নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ থাকতো। অন্য কথায়, এ বাক্যটির সুস্পষ্ট মর্ম এই যে, এখন আর তাদের জন্য সন্দেহ পোষণ করার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। কেননা তুমি নিরক্ষর। আপনার বক্তব্য অনুসারে আল্লাহ যদি তাঁকে নবী বানানোর সঙ্গে সঙ্গেই অলৌকিকভাবে স্বাক্ষর বানিয়ে দিতেন, তাহলে ঐ যুক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যেতো। যদি সত্যিই সেটা হতো তাহলে কি সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ বিলুপ্ত হয়ে যেতো? তেমনটি হলে তো মক্কার কাফিররা বলতে পারতো যে, তুমি এ যাবত আমাদের কাছ থেকে গোপন করেছো। এখন বুঝলাম যে, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে লেখাপড়া শিখে নিয়েছিলে এবং চুপি চুপি বই পুস্তক পড়ে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলে।

এটাও ভাবুন যে, এ আয়াত নবুয়তের পাঁচ বছর পর নাযিল হয়েছে। তখন পর্যন্ত যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ লেখাপড়া শেখাননি তার পরে এই অলৌকিক ঘটনাটা কোন্ তারিখে সংঘটিত হলো? কোন্ কারণে নবুয়ত প্রদানের সাথে সাথে তাঁকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হলোনা এবং কেনই বা পরবর্তী সময় একটা দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হলো এই মুজেযা সংঘটিত করার জন্য? আমি শুধু আপনার ভেবে দেখার জন্য এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনর্থক বিতর্ক দীর্ঘায়িত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)

ইহুদী জাতির লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ

প্রশ্ন : আমার মনে বার বার দুটি প্রশ্ন জাগছে। একটি হচ্ছে কুরআনের "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ"- কুরআনের এ আয়াতটি, যা ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, এর আসল অর্থ কি? যদি এর প্রচলিত অর্থটি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের অর্থ কি? এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমার বোধগম্য হচ্ছেনা। যদি এর অর্থ এভাবে গ্রহণ করা হয় যে, কুরআন নাযিলের সময় ইহুদীরা অনুরূপই ছিলো তাহলে মুফাসসিরগণ তাদের চিরন্তন লাঞ্ছনা ও রাষ্ট্র ক্ষমতাহীনতার কথা বলেছেন কেন? অবশ্য ইহুদীদের বর্তমান ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দেখে তাদের লাঞ্ছনা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বহীনতার অর্থ বোধগম্য হচ্ছেনা।

উত্তর : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ এর ব্যাপারে আমার বিশ্বাসও এই যে, এটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাওয়ার কারণে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হয়নি। প্রথমত আয়াতটি সমগ্র ইহুদী মিল্লাতের

www.icsbook.info

ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একটি বিধান দেয়, তার প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ছোট ছোট গোষ্ঠী ও দলের জন্য এ বিধান কার্যকর নয়। দ্বিতীয়ত এটা এমন একটা অবস্থায় বর্ণনা যা আল্লাহর ফায়সালা প্রকাশ হবার পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর সামগ্রিকভাবে সারা দুনিয়ায় বিরাজিত থাকবে। এ থেকে একথা প্রমাণ হয়না যে, এ সুদীর্ঘ সময় কালের মধ্যে কখনো স্বল্পকালের জন্যও যমিনের কোনো এক ক্ষুদ্রতম অঞ্চলেও তারা ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবেনা। আসলে এ আয়াতটির অর্থ বুঝার জন্য ইহুদী জাতির ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর তারা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত না থাকলে এ আয়াতটির অর্থ অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ইতিহাস এবং এ জাতিটির বর্তমান অবস্থা যা সামগ্রিকভাবে আজ সারা দুনিয়ায় বিরাজিত, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত বক্তব্যটির সত্যতা প্রমাণিত হবে :

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ.

“আর যখন ঘোষণা করে দিলেন তোমার রব, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন কোনো না কোনো ব্যক্তিকে বসিয়ে দেবেন যে তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দেবে।”

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

“তাদের উপর লাঞ্ছনা নিক্ষেপ করা হয়েছে, যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাকনা কেনো, তবে কোথাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কোথাও মানুষের পক্ষ থেকে তাদের নিরাপত্তার কোনো জামানত দেয়া ছাড়া (তাদের এই পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই।” (আলে ইমরান : ১১২)

মানব জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিভিন্ন সময় দুনিয়ার কোনো না কোনো এলাকায় এমনসব শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যারা ইহুদীদেরকে চরম শাস্তি দিয়েছে। দুনিয়ার যেখানেই ইহুদীরা একটু আরামে জীবন যাপন করেছে তা তাদের নিজেদের বাহুবলে নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার ফলে অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে। বর্তমান ইহুদী রাষ্ট্রটিও বৃটেন ও আমেরিকার সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের সহায়তার কারণেই এখনো টিকে আছে। এই সমর্থন ও সহায়তা যখনই খতম হয়ে যাবে, দুনিয়া তখনই তাদের পরিণতি দেখে নেবে। আমার মতে আল্লাহ এ জাতিটিকে ধ্বংস করতে চাননা, বরং একে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ টিকিয়ে রাখতে চান। যদি এর উপর এক নাগাড়ে আযাব নাযিল হতে থাকতো

www.icsbook.info

তাহলে তো এ জাতিটি বহু আগেই ধ্বংস হয়ে যেতো। আল্লাহ সুকৌশলে দুনিয়ার কোথাও তাকে মার খাওয়াচ্ছেন আবার কোথাও তাকে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে আড়াই হাজার বছর থেকে তাকে 'লা ইয়ামুতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহইয়া' -'না মৃত' না জীবিত" তথা জীবন মৃত অবস্থায় দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছেন।" (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৬২)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিনা বাপে জন্মলাভ

প্রশ্ন : একটি গোষ্ঠী এমন রয়েছে যারা স্বীকার করতে চায়না যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের যুক্তি এই যে, ফেরেশতারা যখন হযরত মরিয়মকে এই মর্মে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার পেট থেকে একটি পূতপবিত্র শিশু জন্মগ্রহণ করবে, তখন তিনি জবাব দিলেন, আমার তো এখনো বিয়েই হয়নি, আর আমি ব্যভিচারিণীও নই। এই ফেরেশতা আগমনের সময়ে হযরত মরিয়মকে যদি কুমারী ধরে নেই এবং পরবর্তীকালে ইউসুফ নাজ্জারের সাথে তাঁর বিয়ে এবং তারপরে হযরত ঈসার জন্ম হয়েছে বলে যদি মেনে নেই তাহলে কি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত হয়না?

তাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আল্লাহ তাঁর চিরন্তন রীতি পরিবর্তন করেননা, এ বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে তাঁরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে থাকেন : - وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا "তুমি আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবেনা।" তারা বলে যে, সন্তানদের জন্ম একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীর মিলনের ফল। সৃষ্টির শুরু থেকে এটাই আল্লাহর নিয়ম চলে আসছে এবং এ নিয়ম এখানো অব্যাহত রয়েছে।

অনুগ্রহপূর্বক এ যুক্তি কতদূর সঠিক তা ব্যাখ্যা করবেন। সময়ের স্বল্পতা হেতু আপনি যদি বিস্তারিত জবাব দেয়া সমীচীন মনে না করেন, তাহলে কোন্ কোন্ কিতাব থেকে এ তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে তা জানালেই চলবে।

উত্তর : আমি স্বীয় তফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরান ও সূরা মরিয়মের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিনাবাপে জন্মগ্রহণের সপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি প্রমাণ সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। আপনি উক্ত তফসীর পড়ে দেখুন। এতে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, হযরত ঈসার আলাইহিস সালাম অলৌকিক জন্মের ঘটনাকে যারা অস্বীকার করে তাদের যুক্তি কতখানি সঠিক।

আল্লাহ যে নিজের চিরন্তন নিয়মে কোনো রদবদল ঘটাননা, সেকথা ঠিক। কিন্তু কোন্টা আল্লাহর নিয়ম আর কোন্টা নয়, সে ফায়সালা করার অধিকার আমাদের

www.icsbook.info

নয়, স্বয়ং আল্লাহর। যেটাকে আল্লাহ স্বীয় নিয়ম বলে ঘোষণা করেন, তার বিপরীত কিছু হতে পারেনা। কিন্তু আমরা যেটাকে আল্লাহর নিয়ম বা বিধি বলে আখ্যায়িত করি, তার বিপরীত অনেক কিছুই হওয়া সম্ভব। কেননা আমাদের কথিত নিয়মবিধির আনুগত্য করার কোনো দায়দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। আল্লাহ এমন কথা কখনোই বলেননি যে, পুরুষ ব্যতিরেকে কোনো নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়া আমার নিয়মের খেলাফ, কিংবা আমার বিধান এই যে, একমাত্র পুরুষের সাথে মিলনক্রমেই নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, প্রথম মানব দম্পতি কোন্ নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে জন্মেছিলেন? আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আমি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তাঁর থেকেই তাঁর জীবন সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছি। এই দম্পতির জন্ম যদি আল্লাহর বিধানের বরখেলাফ না হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ঈসার (আ:) বিনা বাপে জন্মগ্রহণ আল্লাহর বিধানের বরখেলাপ হবে কেন? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের জন্মের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ط خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ-

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দাবিতে ঈসার আলাইহিস সালাম ব্যাপারটা আদমের মতোই, যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অতপর বলেছিলেন 'হও' আর অমনি সে হয়ে গেলো।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫৯, তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)

একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধকরণ

প্রশ্ন : আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। সেটি এই যে ইসলামী রাষ্ট্রে যদি মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম হয় তাহলে সরকার কি সে কারণে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করতে পারে?

এ প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা আমি এজন্য অনুভব করেছি যে, আমার ধারণা পবিত্র কুরআনে যেখানে একাধিক বিয়ের অনুমিত দেয়া হয়েছে, সেখানে জরুরি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই তা দেয়া হয়েছে। সে আমলে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বহু নারী বিধবা এবং বহু শিশু এতীম ও আশ্রয়হীন হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্য এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল, যাতে বিধবা ও এতীমদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করা এবং তাদের লালন পালনের ভদ্রজনোচিত ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

www.icsbook.info

উত্তর : আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোনো সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা একটা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটাতে পারে এ পরিমাণে কম হওয়া একটা বিরল ঘটনা। সাধারণত পুরুষদের সংখ্যাই ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। যেসব কারণে পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস পায়, সেসব কারণে নারীর সংখ্যা হ্রাস পায়না। নারীর সংখ্যা যদি কমে তবে কেবলমাত্র পুরুষের চাইতে নারীর জন্মহার কমে যাওয়ার কারণেই কমতে পারে। আর এমনটি হওয়া প্রথমত অত্যন্ত বিরল। আর তা যদি হয়ও, তথাপি নারীর জন্মহার এতো কম হয়না যে, তার দরুন একটা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে এবং তার সমাধানের জন্য আইন রচনার প্রয়োজন দেখা দেবে। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর পুন:বিবাহের প্রচলন দ্বারা এ সমস্যার সমাধান আপনা আপনিই হয়ে যায়।

দ্বিতীয় যে কথাটা আপনি লিখেছেন, তা কুরআনের সঠিক অধ্যয়নভিত্তিক নয়। ইসলামের কোনো যুগেই একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ ছিলনা। আর এই নিষেধাজ্ঞাকে কোনো কারণে বাতিল করে একাধিক বিয়ে বৈধ করা হয়েছে, এমন ঘটনাও কখনো ঘটেনি। আসলে একাধিক বিয়ে সকল যুগে সকল নবীর শরিয়তেই জায়েয ছিলো। আরবের জাহিলী সমাজেও এটা জায়েয ছিলো। নবুয়্যতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম এই প্রথার অনুসারী ছিলেন। কুরআনে একটি আয়াতও এমন নেই, যা দ্বারা ধারণা জন্মে যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ ছিলো এবং এ আয়াত এসে তাকে বৈধ করেছে। এ ধরনের কোনো আয়াত আপনার জানা থাকলে তার উল্লেখ করবেন।

প্রশ্ন-২ : আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার জবাব আমাকে আশ্বস্ত করেনি। আমি শুধু একথাই বলেছিলাম যে, কোনো সমাজে যদি নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে কম হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে সরকারের একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করার অধিকার আছে কি না? আপনি বলেছেন যে, এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। আমি তো সেই বিরল ঘটনা নিয়েই প্রশ্ন করেছি। আপনি হয়তো জানেন যে (আদমশুমারীর আলোকে) পাকিস্তানে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম। এখন সরকার কি এমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে যা দ্বারা এই পরিস্থিতি বহাল থাকা অবধি একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যায়?

আমার বক্তব্য ছিলো এই যে, একাধিক বিয়ে অনুমোদনের তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী আন্দোলনে লিপ্ত থাকার সেই আমলে বহু বছর ব্যাপী জিহাদ চলার কারণে বিধবা ও এতীম হয়ে যাওয়া নারী ও

www.icsbook.info

শিশুদের সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল এবং একাধিক বিয়ের অনুমোদনকেই তার একটি উপায় হিসেবে স্থির করা হয়েছিল। যে আয়াতে এই অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার আগে জিহাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহেরই উল্লেখ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমি এই ধারণায় উপনীত হয়েছি (তা ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক) যে, এ অনুমতি বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। এ ধারণা যদি ভুলও হয়ে থাকে এবং আপনার উক্তি অনুসারে এটা যদি কুরআনের বিশুদ্ধ অধ্যয়নভিত্তিক নাও হয়ে থাকে, তবে এটা বাদ দিয়েও একথাই ভাবা যেতে পারে যে, দুই, তিন ও চারটা করে বিয়ের প্রচলন কেবলমাত্র সেই অবস্থায়ই হওয়া সম্ভব যখন সমাজে পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্য বেশি হয়। তাদের সংখ্যা যদি অপেক্ষাকৃত বেশি না হয়ে থাকে অথবা পুরুষের সমান হয়, তাহলে এই অনুমতিকে বাস্তবায়িত করার কি প্রয়োজন?

উত্তর : পাকিস্তানের লোক গণনায় নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম পরিলক্ষিত হলেই একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়না যে, আমাদের দেশে সত্যিই পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম। আমাদের দেশের প্রচলিত রীতিপ্রথাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ জনগণ সাধারণভাবে পরিবারের নারী সদস্যাদের নাম নথিভুক্ত করেনা । তবুও যদি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়েক লাখের পার্থক্য হয়ও তবুও তাতে এমন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়না যার জন্য একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজন হবে। সমস্য যেটুকু হয়, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীদের পুন:বিবাহের প্রচলন করলেই তার সমাধান হয়ে যায়। তথাপি ধরে নেয়া যাক, কোনো অস্বাভাবিক ঘাটতি যদি দেখা দেয়, তবে সাময়িকভাবে কিছুকালের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করাও যেতে পারে। তবে শর্ত এই যে এই নিষেধাজ্ঞার আসল কারণ শুধুমাত্র এই সমস্যাই হওয়া চাই- অন্য কিছু নয়। কিন্তু একথা গোপন করার কি প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে এ সমস্যার কারণে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি, বরং এটা অনুভব করা হয়েছে একাধিক বিয়েকে মূলতই খারাপ মনে করার পাশ্চাত্য মানসিকতার ভিত্তিতে এবং আইনত এক বিয়েই চালু করার উদ্দেশ্যে। এ মানসিকতা আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং এর মূলোৎপাটন করাকে আমরা জরুরি মনে করি।

আমি আগেও একথা বলেছিলাম এবং এখন আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়ার জন্য কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। একাধিক বিয়ে আগে থেকেই বৈধ চলে আসছিল। (সূরা-নিসার : ৩ নং-আয়াত) নাযিল হওয়ার আগেই স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে তিনজন

www.icsbook.info

স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকের একাধিক স্ত্রী ছিলো। এই বৈধ কাজটির অনুমতি দেয়ার জন্য সূরা নিসার উক্ত আয়াত নাযিল হয়নি বরং আয়াতটি নাযিল হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, ওহোদ যুদ্ধে বহু সংখ্যক সাহাবীর শহীদ হওয়া এবং বহু সংখ্যক শিশুর এতীম হওয়ার দরুন তাৎক্ষণিকভাবে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধানের জন্য মুসলমানদেরকে একটি পদ্ধতি জানিয়ে দেয়া। এতে বলা হয় যে, তোমরা যদি তোমাদের বর্তমান স্ত্রীদের দ্বারা এতীমদের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করতে না পারো তাহলে দুই জন তিনজন বা চারজন করে মহিলাকে বিয়ে করে এই এতীমদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো। এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র এই জাতীয় সমস্যাবলীর উদ্ভব হলেই একাধিক বিয়ে বৈধ হবে। বিগত ১৩-১৪ শো বছর ধরে তো মুসলিম সমাজে এ প্রথা চালু রয়েছে। তার আগে এমন প্রশ্ন কখনো ওঠেনি যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি বিশেষ পরিস্থিতি শর্তাধীন কিনা?

এ চিন্তাধারার প্রাদুর্ভাব তো কেবল পাশ্চাত্যের আধিপত্যের কারণেই আমাদের দেশে হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৩)

দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদিসসমূহ এবং রসূল (সা.)-এর কোনো কোনো উক্তি অহিভিত্তিক না হওয়া

প্রশ্ন আপনি 'তাফহীমাত' প্রথম খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় সূরা নাজমের প্রথম দিককার তিনটি আয়াত :

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ط اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوحٰى -

"তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি, বিভ্রান্তও হয়নি, সে মনগড়া কথা বলেনা, যা বলে অহির কথাই বলে"। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"এ আয়াত কয়টিতে এমন কোনো বক্তব্য নেই, যার ভিত্তিতে রসূলের সকল কথাকে কুরআনের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা যেতে পারে। রসূলের বলা প্রতিটি কথা অহিভিত্তিক, এটাই এই আয়াত কয়টির বক্তব্য।"

অথচ 'রাসায়েল ও মাসায়েল' গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় দাজ্জাল সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছেন :

"দাজ্জাল সম্পর্কে যতোগুলো হাদিস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার বিষয়বস্তুর উপর একটি সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে এ ব্যাপারে যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা শুধু এতোটুকুই ছিলো যে, এক ভয়ঙ্কর

www.icsbook.info

দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তার গুণবৈশিষ্ট্য এরূপ হবে। কিন্তু সেই দাজ্জাল কবে ও কোথায় আবির্ভূত হবে এবং সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই জন্মগ্রহণ করেছে, না তাঁর পরবর্তী কোনো সুদূর ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে, তা তাকে জানানো হয়নি। এজন্যই দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান ও কাল সম্পর্কে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা এতো স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ যে, এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কোনো উপায় নেই। কেননা এগুলো অহির জ্ঞানভিত্তিক নয়।"

এই প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আপনি লিখেছেন :

"এ অস্পষ্টতা থেকে প্রথমত একথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি এ কথাগুলো অহির জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেননি, বরং নিজের ধারণা অনুসারে বলেছেন।"

আপনার উপরোক্ত কথাগুলো পরস্পর বিরোধী। প্রথম বক্তব্যে আপনি বলেছেন যে, রসূলের প্রতিটি কথা অহির জ্ঞানভিত্তিক। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যে আপনি বলেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো কথা অহির জ্ঞানভিত্তিক নয়। যেমন দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান ও কাল সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন, অথচ এগুলো রসূলেরই কথা।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব প্রয়োজন :

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব উক্তির পক্ষে কুরআন থেকে সমর্থন পাওয়া যায়না সেগুলো সম্পর্কে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে যে, তা অহির জ্ঞানভিত্তিক কিনা? আপনার উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আপনার জবাব যদি এই হয় যে, রসূলের যেসব উক্তি পরস্পর বিরোধী নয় তা অহির জ্ঞানভিত্তিক, আর যেগুলো পরস্পর বিরোধী তা অহির জ্ঞানভিত্তিক নয়, তাহলে জিজ্ঞাসা এই যে, হাদিসের কিতাবে এ ধরনের পরস্পর বিরোধী বেশ কিছু হাদিস রয়েছে, যার সম্পর্কে মুসলিম ইমামগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সেসব অহির জ্ঞানভিত্তিক এবং তা থেকে তারা শরিয়তের বিভিন্ন বিধি রচনাও করেছেন। সেসব হাদিস সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

২. আপনি বলেছেন যে, "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা বা আন্দাজ অনুমান এমন জিনিস নয়, যা সঠিক না হলে তাঁর নবুয়্যত বিতর্কিত হয়ে পড়ে" আপনার এ বক্তব্য আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ভ্রান্ত আন্দাজ অনুমান করা একজন দার্শনিকের কাজ হতে পারে। কিন্তু নবীর মর্যাদা এর চেয়ে বহু গুণ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক ধারণা ভুল ছিলো, তাহলে প্রকারান্তরে আমাদের এ কথাই মেনে নেয়া হবে যে, তিনি অমুক ক্ষেত্রে আল্লাহর দিক নির্দেশনা না পেয়ে

www.icsbook.info

বিপথগামী হয়েছিলেন। কাজেই مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰى (তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নয়, বিভ্রান্তও নয়) এ আয়াত তার প্রতি প্রযোজ্য নয়।

উত্তর : আমি তাফহীমাত প্রথম খণ্ডে وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি তার পূর্ণ বিবরণ আপনি পড়ে দেখেননি, শুধুমাত্র তার অংশবিশেষ পড়েছেন। এজন্যই আমার উক্ত ব্যাখ্যায় এবং পরবর্তী একটি বক্তব্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে বলে আপনার মনে হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক উক্ত পুস্তকের ৮৫ থেকে ৮৯, ২২০ থেকে ২২২, ২৩৮ থেকে ২৪০, ২৪৪ এবং ২৫৮ থেকে ২৫৯ পৃষ্ঠা মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখুন। তাহলে আমি কি বলতে চেয়েছি তা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারবেন। আপনি এও বুঝতে পারবেন যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কথা ও কাজের পেছনে প্রচ্ছন্ন অহি সক্রিয় থাকাকে আমি কোন্ অর্থে গ্রহণ করেছিলাম এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ কোন্ উক্তির অহিভিত্তিক হওয়ার এবং কোন কোন উক্তির অহিভিত্তিক না হওয়া বলতে আমি কি বুঝিয়েছি।

এরপর আপনার শেষের দিকের মৃত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার যাতে আর কোনো দুর্বোধ্যতা না থাকে, তাই উক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে দিচ্ছি।

১. আমি আমার লেখাতে কোথাও একথা বলিনি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিসমূহের পরস্পর বিরোধী হওয়া না হওয়াই তার অহিভিত্তিক হওয়া না হওয়ার একমাত্র অকাট্য দলীল। আর না আমার লেখার উদ্দেশ্য এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব বক্তব্যে কোনো রকমের স্ববিরোধিতা অথবা গরমিল দৃষ্টিগোচর হয় তাকে আমি অহিভিত্তিক বলে স্বীকার করিনা। অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অহিভিত্তিক বলেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়- রসূলের এমন কিছু কিছু উক্তিতেও কখনো কখনো আপাত: দৃষ্টিতে গরমিল ও পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য ও গরমিল কোনো না কোনো উপায়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সমন্বয় প্রয়াস দ্বারা সহজেই দূরীভূত করা যায়, অথবা একটি দ্বারা অপরটি রহিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে এমন ব্যাপার হওয়াও বিচিত্র নয় যে, কিছু কিছু হাদিসের বক্তব্যে হয়তো পারস্পরিক বিরোধ ও গরমিল আদৌ নেই, তথাপি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ঐ হাদিসের বক্তব্য অহিভিত্তিক নয়, বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব অভিমত মাত্র। আমি শুধু একথাই বলেছিলাম যে, যেসব হাদিসের বক্তব্য অহিভিত্তিক তাতে এমন

www.icsbook.info

গুরুতর ধরনের বিরোধ বৈষম্য থাকেই না, যার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সমন্বয় সাধন সম্ভবই নয়। আর যেসব হাদিসের বক্তব্য অহিভিত্তিক নয়, তাতে অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ যাই থাকুক না কেন, পারস্পরিক বিরোধ ও গরমিল ও একটা প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান থাকে।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ উক্তি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বা ধ্যান ধারণাভিত্তিক আর কোন্টি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানভিত্তিক, সেকথা অনেক সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, আবার কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারাও তা জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদিসগুলোকেই উল্লেখ করা যায়। এসব হাদিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের সুস্পষ্ট উক্তি থেকে জানা যায় যে, দাজ্জালের আবির্ভাবের স্থান, কাল ও তার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে তথ্য জানানো হয়নি। তথাপি ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে তিনি এতো প্রবল সন্দেহ পোষণ করতেন যে, হযরত উমর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই কসম খেয়ে তাকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খণ্ডন করেননি। কিন্তু হযরত উমর (রা.) যখন তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন তখন তিনি বললেন : ان يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلاخير لك فى قتله -

"সে-ই যদি দাজ্জাল হয়ে থাকে তবে তুমি তাকে কখনো কবজায় আনতে পারবেনা। আর যদি সে দাজ্জাল না হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার কোনো কল্যাণ নেই" (মুসলিম, ইবনে সাইয়াদের বিবরণ) আর একটি হাদিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم - فامرء حجيج
والله خليفتى على كل مسلم -

"সে যদি আমি বেঁচে থাকতেই আবির্ভূত হয় তাহলে তোমাদের পক্ষ হতে আমিই তার মুকাবিলা করবো। আর যদি আমার অনুপস্থিতিতে সে আবির্ভূত হয় তাহলে প্রত্যেক মানুষই যেন নিজের পক্ষ হতে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আর আমার অবর্তমানে আল্লাহই প্রত্যেক মুসলমানের রক্ষক" (মুসলিম, দাজ্জালের বিবরণ)।

বিশিষ্ট সাহাবি তামীম আদ-দারী (রা.) যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় এক সামুদ্রিক ভ্রমণকালে দাজ্জালের সাথে নিজের সাক্ষাতের ঘটনা শুনালেন, তখন তিনি তা সমর্থন বা খণ্ডন কোনোটাই করলেননা, বরং এরূপ মন্তব্য করলেন : اعجبنى حديث تميم انه وافق الذى كنت احدثكم عنه -

www.icsbook.info

"তামীমের বিবরণে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কেননা আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের যে বিবরণ দিয়েছি, তার সাথে ঐ বিবরণের মিল আছে।" অতপর তিনি আরো বলেন :

الا انه فى بحر الشام او بحر اليمن لابل من قبل المشرق -

"কিন্তু সে সিরিয়া বা ইয়ামান সাগরে আছে। না, বরঞ্চ সে পূর্বদিকে আছে।" (মুসলিম, জাস্সাসার বিবরণ)। এসব হাদিসের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট।

৩. তৃতীয় প্রশ্ন আপনি একটা গুরুতর কথা বলেছেন। এমন একটা কথা বলার আগে আপনি যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে নিতেন তাহলে খুবই ভালো হতো। পবিত্র কুরআন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছে : وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ.

"আর মাছওয়ালার (কথা স্মরণ কর) যখন যে রাগান্বিত হয়ে চলে গেলো এবং ধারণা করলো যে, আমি তাকে পাকড়াও করবোনা" (আম্বিয়া : ৮৭)। এখানে আল্লাহ নিজেই একজন নবীর ব্যাপারে 'ধারণ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন এবং তার ধারণা যে সঠিক ছিলোনা সেকথা আল্লাহ তায়ালই কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম শরীফে 'কিতাবুল ফাজায়েল' (সৎ গুণাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়) এ একটা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে, যার শিরোনাম নিম্নরূপ :

باب وجوب امتثال ماقال شرعا دون ماذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرائ -

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরিয়তসম্মতভাবে যা কিছু বলেছেন, তা মেনে চলা ওয়াজিব এবং যেকথা তিনি পার্থিব বিষয়ে নেহায়েৎ নিজের ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে বলেছেন তা মেনে চলা ওয়াজিব নয়, সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।" এই পরিচ্ছেদে হযরত তালহা (রা.) হযরত রাফে বিন খাদিজা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় পদার্পণ করলেন, তখন দেখলেন যে, মদিনার লোকেরা নর খেজুর গাছের সাথে নারী খেজুর গাছের জোড়া লাগায়। তিনি বললেন, ماظمنى يغنى ذلك شيئا "এতে কোনো উপকারিতা আছে বলে আমার মনে হয়না।"

لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تفعلوا كان خيرا "তোমরা এটা না করলেই বোধ হয় ভালো হয়।" লোকেরা তাঁর এ মন্তব্য শুনে জোড়া লাগানো বন্ধ করে দিলো। কিন্তু সে বছর খেজুরের ফলন তেমন ভালো হলোনা। তখন তিনি বললেন :

اِن كان ينفعكم فليصنعوه فانى انما ظننت ظنا فلاتؤاخذونى بالظن ولكن اذا احدثتكم عن الله شيئا فخذوا به - انى لم اكذب على الله -

www.icsbook.info

"একাজ দ্বারা যদি লোকের উপকার হয় তবে তারা তা করুক। আমি তো কেবল ধারণার ভিত্তিতেই একটি কথা বলেছিলাম। তোমরা আমার ধারণার জন্য আমাকে দায়ি করোনা। তবে আমি যখন আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো কথা তোমাদেরকে বলি, তখন তা মেনে নিও। কেননা আমি আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলিনি।"এ হলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজেরই সুস্পষ্টোক্তি। আর ইতিপূর্বে আল্লাহর স্পষ্টোক্তিও আপনি দেখেছেন। (অর্থাৎ -"তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত হয়নি, পথভ্রষ্টও হয়নি")। এখন আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন যে, আপনার মত সঠিক না আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা সঠিক।" (তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা, ১৩৭৫ হি:/জানুয়ারি ১৯৫৬)

হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা

প্রশ্ন : বুখারি শরিফের কিতাবুল আম্বিয়াতে (নবীগণ সংক্রান্ত অধ্যায়) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসের একটি অংশ নিম্নরূপ :

وان اناسا من اصحابى يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصحابى اصحابى فيقول انهم لم يزالوا مرتدين على الصالح وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم (الى قوله) الحكيم -

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমার কিছু সংখ্যক সাথিকে বাম দিক থেকে পাকড়াও করা হবে। তখন আমি বলবো (ওদেরকে কিছু বলোনা) এরা আমার সাথি, এরা আমার সাথি। তখন জবাব দেয়া হবে যে, তোমার মৃত্যুর পর এসব লোক বিপথে চালিত হয়েছে। এরপর আমি হযরত ঈসার মতো বলবো যে, হে আল্লাহ! যতোদিন আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম, ততোদিন তাদের কার্যকলাপের তদারক করেছি। কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়েছ, তখন তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। আর তুমি তো সব জিনিসেরই পর্যবেক্ষক। তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও তাহলে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।"

এ হাদিস থেকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা খাটো করা ও তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। এ হাদিসটি কি বিশুদ্ধ?

এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতেক লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে কেয়ামতের দিন ফেরেশতারা অপরাধী হিসেবে বাম দিক থেকে গ্রেফতার করবে এবং তারা পার্থিব জীবনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর নীতি বর্জন করে ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করেছেন।

www.icsbook.info

এখানে সাথি শব্দটি দ্বারা যে সাহাবায়ে কেরামকেই বুঝানো হয়েছে তার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উল্লেখ্য :

১. সাথি শব্দটি দ্বারাই বুঝা যায় যে, যারা তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের সাথে তাঁর সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে সাহাবি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২. একটি হাদিসে দেখা যায় যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, (হে সাহাবিমণ্ডলী!) তোমরা আমার সাথি। আর যেসব মুমিন তোমাদের পরে আসবে তারা আমাদের ভাই।

৩. হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর ফজিলত, মাহাত্ম্য ও মর্যাদার বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতেও সাথি বা সহচর বলে সাহাবায়ে কেরামকেই বুঝানো হয়েছে।

৪. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবাদে ফেরেশতারা বলবেন যে, "আপনি বিদায় গ্রহণের পর তারা আপনার নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করে মনগড়া নীতি ও আদর্শ উদ্ভাবন করে নিয়েছে। একটি হাদিসের অংশবিশেষে ফেরেশতাদের উক্তি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে لاتدرى احدثوا ما بعدك "তুমি জানোনা, তোমার পরে তারা কি কি উদ্ভট নীতি উদ্ভাবন করেছে" মেশকাত। এই উক্তির ভাষা থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ফেরেশতারা বলছেন যে, আপনার জীবদ্দশায় তারা আপনার অনুগত সহচর হিসেবে আপনার উপস্থাপিত দীনের অনুসারী ছিলো। কিন্তু যখনই আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অমনি তারা ইসলামকে বিকৃত করা শুরু করেছে।

৫. অতপর তিনি হযরত ঈসার মতো অনুনয় বিনয় করবেন।

সাহাবি পরিভাষা দ্বারা যে জনমণ্ডলীকে বুঝানো হয়ে থাকে, আলোচ্য ব্যাপারটা যে তাদের সাথেই সম্পৃক্ত, কুরআনের উপরোক্ত বাচনভঙ্গী দ্বারা তার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

উত্তর : আলোচ্য হাদিসটি ইমাম বুখারি কিতাবুল আম্বিয়া শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র বরাতে দুই জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন। একবার কুরআনের একটি আয়াতের অংশ واتّخذ الله ابراهيم خليلا (আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন) সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের আওতায়। আরেক বার আর একটি আয়াতাংশ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ (আল্লাহর) কিতাবে মরিয়মের কথা স্মরণ কর] সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে। তাছাড়া তিনি 'কিতাবুর রিকাক' নামক অধ্যায়ে

www.icsbook.info

'তাউজ' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে হযরত আনাস ইবনে মালেক, সাহল বিন সা'দ, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে একাধিক হাদিস এই মর্মে উদ্ধৃত করেছেন। এই সমস্ত হাদিস একত্র করলে দুটো বিষয় জানা যায় :

১. আলোচ্য বিষয়টি সেসব লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে সাহাবিদের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। একটি বর্ণনায় নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে :

فهمر لن يزالوا مرتدين على اعقابهمر فنذ فارقتهمر -

"তারা আপনার তিরোধানের পর কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রত্যাবর্তিতই থেকে যায়। অর্থাৎ ধর্মতাগী হওয়ার পর আর তওবা করেনি)"

অপর একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে : -

فهمر ارتدوا على اعقابهمر القهقرى اوعلى ادبارهمر -

"তারা পশ্চাদ্দিকে ফিরে গিয়েছিল। অর্থাৎ যে কুফরী থেকে এসেছিল, সে দিকেই ফিরে গিয়েছিল।"

২. এ বর্ণনা সেসব লোকের সাথেও সংশ্লিষ্ট যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীকালে গর্হিত পথ অবলম্বন করে। একাধিক রেওয়ায়েতে আছে :

لاتدرى ما احدثوا بعدك   انك لاعلمر لك بما احدثوا بعدك -

"আপনার পরে তারা কি কি করেছে তা আপনার জানা নেই।"

উভয় ক্ষেত্রে বিষয়টি কতিপয় সহচরের সাথে সংশ্লিষ্ট, সকল সহচরের সাথে নয়। এটা সকলের জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা তার সাহাবি বা সহচররূপেই গণ্য হতো। কিন্তু তাদের মধ্যেই কতিপয় লোক এমনও ছিলো, যারা ধর্মত্যাগের আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল এবং সেই অবস্থাতেই মারা যায়। এসব লোকের মধ্যে কেউ কেউ এমনও থেকে থাকতে পারে যারা কপটতা ও ভণ্ডামী সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজেদের ভণ্ডামী ও মুনাফিকীকে লুকিয়ে রাখে। আপন সহচরবৃন্দের মধ্যে এ ধরনের কিছু লোক থাকা বিচিত্র নয় মনে করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সতর্কবাণীর আকারে কিছু কথা বলে থাকেন, তবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এ ধরনের সতর্কবাণীর উচ্চারণ করাতে সকল সাহাবিকে হেয় করাও হয়না উপরোক্ত হাদিসসমূহ আসলে এ ধরনেরই হুঁশিয়ারী বিশেষ। এসব সতর্কবাণী দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.icsbook.info

একথাই বলতে চেয়েছেন যে, যারা নিজেদের ঈমানের রক্ষণাবেক্ষণ করবেনা এবং কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তারা আখেরাতে কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হওয়ার সুবাদে আল্লাহর আযাব থেকে নিস্তার পাবেনা। (তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উখরা, ১৩৭৫ হি : ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬)

'আনা মাদিনাতুল ইল্‌ম' হাদিসটির পর্যালোচনা

প্রশ্ন : আমার এক দীনদার বন্ধু সম্প্রতি শিয়া হয়ে গিয়েছেন। তিনি আহলে সুন্নতের আকীদা বিশ্বাস ও কর্ম পদ্ধতির বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তার একটি নিচে উদ্ধৃত করলাম। আশা করি এর যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসটির অর্থ কি?

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا - فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ -

২. এ হাদিসটি থেকে কি একথা প্রমাণ হয়না যে, দীনী ইল্‌ম ও ইসলামী জ্ঞান লাভ করার একমাত্র ও সবচাইতে নির্ভরযোগ্য পথ হচ্ছে এ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ব্যক্তি সত্তা? আর এছাড়া অন্য যে সমস্ত পথ ও উপায় অবলম্বিত হয়েছে সবই ত্রুটিপূর্ণ? কারণ দীন ইসলামে এই সমস্ত পথের কোনো গুরুত্ব নেই।

উত্তর : হাদিস থেকে কোনো কিছু প্রমাণ করার আগে প্রথমে রেওয়ায়েতের দিক থেকে হাদিসটির পর্যালোচনা হওয়া উচিত। দেখা উচিত হাদিসটির বর্ণনা মাধ্যম কতোটুকু নির্ভরযোগ্য। তারপর তার অর্থের প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে হাদিসটি যদি সহীহ ধরা যায় তাহলে তার সঠিক অর্থ কি হতে পারে। কোনো হাদিসের এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করা যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য বহু হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক অথবা যার ফলে বহুতর ত্রুটি ও অবাঞ্ছিত বিষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে, তা কোনোক্রমেই যথার্থ হতে পারেনা। বরং এর বিপরীত পক্ষে যদি তার এমন কোনো অর্থ বের করা হয়, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য বাণীর সাথে সামঞ্জস্যশীল আবার একই সংগে সব রকমের ত্রুটি থেকে মুক্ত, তাহলে একজন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে তা অবশ্যি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

এ নীতি প্রেক্ষিতে রেওয়ায়েতের দিক থেকে উপরোক্ত হাদিসটির স্থান নির্ণয় করতে হবে। সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে একমাত্র ইমাম তিরমিযি (র.) এ হাদিসটি গ্রহণ করেছেন। তবে সেখানে 'আনা মাদিনাতুল ইলম' এর স্থলে "আনা দারুল

www.icsbook.info

হিকমাতে ও আলীউন বাবুহা" (অর্থাৎ জ্ঞানের আমি গৃহ এবং আলী তার দুয়ার) উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) নিজেই এ হাদিসটির বর্ণনাকারী। ইমাম তিরমিযি (র.) এটি উদ্ধৃত করার পর এর বর্ণনাগত অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

هذا حديث غريب منكر - روى بعضهم هذا الحديث عن شريك لم يذكروا فيه عن الصّنابحى - ولانعرف هذا الحديث على احد من الثقات غير شريك -

"এ হাদিসটি 'গারীব' ও 'মুনকার' কোনো কোনো রাবী একে শুধুমাত্র শরীক (তাবিঈ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন এবং তার সনদে সুনাবেহী এর নাম উল্লেখ করেননি। আমরা জানিনা শরীক ছাড়া সিকাহ (নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী) রাবীদের মধ্যে থেকে আর কেউ এটি রেওয়ায়েত করেছে কিনা।"

হাদিসের পরিভাষায় 'গারীব' এমন সব হাদিসকে বলা হয় যার সনদ বা বর্ণনা পরম্পরার কোনো এক পর্যায়ে বর্ণনাকারী থাকেন মাত্র একজন। আর 'মুনকার' হচ্ছে এমন একটি হাদিস, যা কেবলমাত্র গারীবই নয়, বরং একই সংগে তার রাবী বা বর্ণনাকারীও হয় দুর্বল। এ থেকে সনদের বিচারে ইমাম তিরমিযির এ রেওয়ায়েতটির স্থান ও মর্যাদা জানা যায় এখন বিচার করুন, এর উপর সমগ্র দীনের ভিত্তি স্থাপন করা কতোটুকু বুদ্ধিমত্তা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক হতে পারে।

তিরমিযির পর এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদিসগুলোর সমগ্র ভিত্তি হাকেমের মুসতাদরাক এর উপর স্থাপিত। আর 'মুসতাদরাক'-কে নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়না। এতে তিনি ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুমা থেকে দুটি রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসের শব্দগুলো হচ্ছে : انا مدينة العلم وعلى بابها (অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর ও আলী তার দরজা)। فمن اراد المدينة فليات الباب (কাজেই যে ব্যক্তি ঐ শহরে ঢুকতে চায় তাকে দরজায় আসতে হবে)। আর জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণিত হাদিসটির শেষ বাক্যটি হচ্ছে : فمن اراد العلم فليات الباب (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইলম লাভ করতে চায় তাকে দরজায় আসতে হবে)।

হাকেম এ দুটি হাদিসের নির্ভুলতার দাবিদার। কিন্তু হাদিস শাস্ত্রের বড় বড় সমালোচকদের মতে কেবল এ হাদিস দুটিই নয়, বরং এই মর্মে বর্ণিত সমস্ত হাদিসই অনির্ভরযোগ্য হিসেবে অগ্রহণযোগ্য। ইবনে আব্বাসের বর্ণনা হিসেবে কথিত হাদিসটি সম্পর্কে হাফেয যাহাবী (র.) বলেন, 'এ হাদিস সহীহ হওয়া তো দূরের কথা, এটি আসলে একটি মওযু' বানোয়াট হাদিস। আর জাবের ইবনে আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হিসেবে কথিত হাদিসটি সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে :

www.icsbook.info

العجب من الحاكر وجرأته - فى تصحيحه هذا وامثاله من البوطيل واحمد هذا رجال كذاب -

"হাকামের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, কেমন দুঃসাহসিকতার সাথে তিনি এ হাদিসটি এবং এ ধরনের অন্যান্য বাতিল হাদিসগুলোকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই আহমদ (অর্থাৎ আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ আল হাররানী, যার সনদের মাধ্যমে হাকেম এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন) তো দাজ্জাল ও ডাহা মিথ্যাবাদী।"

ইয়াহ্ইয়া ইবন মুঈন এ হাদিসটির ব্যাপারে বলেছেন : لااصل له (এর কোনো ভিত্তি নেই)। ইমাম বুখারির (র.) মত হচ্ছে : انه منكر ليس له وجه صحيح (এটি একটি মুনকার হাদিস। এর বর্ণনার কোনো একটি পদ্ধতি ও সহীহ নয়)। ইমাম নববী ও আল্লামা জাযারী একে 'মওযু' বানোয়াট বলেছেন। ইবনে দাকীকুল ঈদের মতেও এ হাদিসটি সঠিক বলে প্রমাণিত নয়। ইবনে জাওযী বিস্তারিত আলোচনা মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন- انا مدينة العلم সম্পর্কিত যতোগুলো হাদিস যতো পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট।

আসল চিন্তার বিষয় হচ্ছে, সনদের দিক থেকে যে হাদিসটির এমনি দুরবস্থা, তার উপর এতোবড় সিদ্ধান্তের ভিত্তি রেখে দেয়া কতোদূর ন্যায়সংগত ও যথার্থ হতে পারে যে, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীনের যাবতীয় বিধি বিধান একমাত্র আলীর (রা.) মাধ্যমেই গ্রহণ করবো এবং অন্যান্য সাহাবাদেরকে ইল্ম (দীনের জ্ঞান) হাসিল করার মাধ্যম হিসেবে আদতে গ্রহণই করবোনা? সোজা কথায় বলা যায়, এটা কোনো মামুলি সিদ্ধান্ত নয়। কুরআন মজীদের পর আমাদের কাছে যদি হেদায়াতের আর কোনো উৎস থেকে থাকে তবে সেটি হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা। আর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন এর একমাত্র মাধ্যম, যাঁদের সহায়তায় আমরা জানতে পারি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের উপর ভরসা করে এই জ্ঞানের জন্য একমাত্র সাইয়িদুনা আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর নির্ভর করি তাহলে আমাদেরকে অনিবার্যভাবে জ্ঞানের সেই বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে যা অন্যান্য সাহাবাদের মাধ্যমে উদ্ধৃত হয়েছে। মানবিক বুদ্ধি কি এ দাবি জানায়না যে, এতোবড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আমাদের কাছে এই হাদিসটির তুলনায় আরো অনেক বেশি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে পৌছানো উচিত ছিলো? বরং এ ধরনের হাদিস অনেকগুলো সহীহ ও শক্তিশালী সনদ পরম্পরায় বর্ণিত

www.icsbook.info

হওয়া উচিত ছিলো, যার ফলে তার নির্ভুলতা সম্পর্কে কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশই থাকতোনা।

এখন এ হাদিসটির বাইরের শব্দগুলো থেকে যে অর্থ প্রকাশিত হয় কেবলমাত্র সেই অর্থটি গ্রহণ করলে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য অসংখ্য বাণী এবং তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের সাথে কিভাবে সংঘর্ষশীল হয় তা প্রত্যক্ষ করার মতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবাকে সেনাবাহিনীর অফিসার বানিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠান, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদেরকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন, নামায পড়াবার দায়িত্ব অনেকের উপর সোপর্দ করেন, শিক্ষাদানে ও ইসলাম প্রচারের জন্য অসংখ্য সাহাবাকে নানা স্থানে পাঠান। এগুলো ঐতিহাসিক সত্য। এগুলো অস্বীকার করার কোনো পথ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দায়িত্ব কি দীনের জ্ঞান ছাড়াই সম্পাদন করা হতো? অথবা এসব সাহাবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়, বরং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র ছিলেন? যদি এ দু'টি কথাই মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে সত্য কথা এই একটি মাত্রই হতে পারে যে, ঐ সাহাবাগণ 'মাদিনাতুল ইল্‌ম' অথবা 'দারুল হিকমাত' এর কাছে থেকেই সরাসরি ইল্‌ম ও হিকমাত লাভ করেছিলেন এবং এরা সবাই হযরত আলীর (রা.) মতোই ইল্‌মের শহর ও দারুল হিকমাতের দরজা ছিলেন।

এছাড়াও যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত অধ্যয়ন করেছেন তারা জানেন, নবুয়্যতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি দীনের শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। আর যারাই দীন সম্পর্কে কিছু জানতে বা জিজ্ঞেস করতে চাইতো তারা কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁর কাছ থেকেই জবাব জেনে নিতেন। কখনো কি এমন দেখা গেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম পেয়েছেন এবং তা কেবল হযরত আলীকেই জানিয়েছেন আর তা দুনিয়াবাসীকে জানাবার দায়িত্ব একমাত্র হযরত আলীই সম্পাদন করেছেন? অথবা কোনো ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দীনের কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছে আর তিনি জবাবে বলেছেন : যাও আলীকে জিজ্ঞেস করো? অথবা আলীর মাধ্যমে আমার কাছে এসো? নবীর ২৩ বছরের নবুয়্যতী জীবনে যদি কখনো এমনটি না হয়ে থাকে তাহলে "জ্ঞানের শহরের একটি মাত্র দরজা আর সে দরজাটি হচ্ছে হযরত আলী।" এ বক্তব্যটির অর্থ কি?

www.icsbook.info

হাকেম অত্যন্ত জোরেশোরে এ হাদিসটির নির্ভুলতার দাবি জানিয়েছেন অথচ তিনি নিজেই ঐ একই গ্রন্থ মুসতাদরাকে অন্য সাহাবাদের থেকে হাজার হাজার হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে এমন অসংখ্য হাদিস রয়েছে যেগুলোর সমার্থক কোনো হাদিস হযরত আলী (রা.) এর মাধ্যমে তাঁর এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, হাকেমের মতে যদি এ হাদিসটি নির্ভুল হয়ে থাকে এবং যদি 'ইল্‌মের শহর' পর্যন্ত পৌঁছার দরজা একটাই হয়ে থাকে তাহলে সেখানে এই আরো বহু দরজা জন্ম নিলো কোথা থেকে এবং তিনি কেনই বা এসব দরজায় গেলেন?

হযরত আলী (রা.) নিজেও এ দাবি করেননি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমন কোনো ইল্‌ম দিয়েছিলেন, যা আর কাউকে দেননি। বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদে আহ্‌মাদের নির্ভুল সনদ সহকারে এ হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে যে, হযরত আলী বারবার প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যারা এ ধরনের চিন্তা পোষণ করে। তিনি নিজের তরবারির কোষ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে লোকদেরকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন এটা ছাড়া আর এমন কোনো বিশেষ জিনিস আমার কাছে নেই যা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে আমি সংরক্ষিত করে রেখেছি। সেই কাগজের টুকরোটিতে মাত্র চার-পাঁচটি ফিকাহর বিধান ছিলো। মুসনাদে আহমদে ১৩টি বিভিন্ন সনদ পরম্পরায় হযরত আলীর এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে। এসব রেওয়ায়েতকে একত্রিত করার পর জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জামাতাকে গোপনে দীনের কিছু গভীর তত্ত্ব শিখিয়ে গিয়েছিলেন যা আর কাউকে শেখাননি, সাধারণ মানুষের এ ধরনের কিছু বিভ্রান্তিকে হযরত আলী নিজেই দূর করে দিয়েছিলেন। বহু লোক তাঁর নিজমুখে এ বাতিল ধারণার প্রতিবাদ শুনেছেন এবং এ প্রতিবাদ বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণের কাছে পৌঁছি গেছে। এর ফলে আজ এর নির্ভুলতায় সন্দেহ করার অবকাশ মাত্রই নেই।[১]

এরপর যখন আমরা অন্যান্য অসংখ্য সহীহ হাদিস দেখি, যা অন্যান্য সাহাবাদের সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন এ হাদিসটি ঐ অসংখ্য হাদিসের সম্পূর্ণ বিরোধী প্রতীয়মান হয়। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযিতে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) সম্পর্কে বলেছেন 'আফরাদুহুম'- অর্থাৎ সাহাবাদের মধ্যে মীরাস সম্পর্কিত

---

১. এজন্য দেখুন মুসনাদে আহমদ (দারুল মা'আরিফ মিসর থেকে প্রকাশিত), হাদিস নম্বর ৫১৯, ৬১৫, ৭৮২, ৭৯৮, ৮৫৮, ৮৭৪, ৯৫৪, ৯৫৯, ৯৬২, ৯৯৩, ১০৩৭, ১২৯৭ ও ১৩০৬।

www.icsbook.info

জ্ঞানের ব্যাপারে তিনিই সবচাইতে পারদর্শী। মুআয ইবনে জাবাল (রা.) সম্পর্কে বলেছেন : "আ'লামুহুম বিল হালালে ওয়াল হারাম" - অর্থাৎ তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। উবাই ইবনে কাব সম্পর্কে বলেছেন : 'আকরাউহুম'-অর্থাৎ সাহাবাদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় কারী।

মুসনাদে আহমদে হযরত আলী (রা.) এর নিজের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لو كنت مؤمرا احدا من امتي من غير مشورة لامرت عليهم ابن ام عبد.

অর্থাৎ - আমার উম্মতের মধ্য থেকে বিনা পরামর্শে যদি কাউকে আমীর বানাবার প্রয়োজন হতো তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে আমি আমীর বানাতাম।

ইমাম তিরমিযি হযরত আবু হুযাইফা (রা.) এর একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে :

لا ادرى مابقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى ابو بكر وعمر -

"জানিনা আমি কতোদিন তোমাদের মধ্যে থাকবো। আমার পর তোমরা আবু বকর ও উমর -এ দু'জনের অনুসরণ করো।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ما من نبى الاوله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض فاما وزير اى من اهل السماء فجبريل وميكائيل فاما وزير اى من اهل الارض فابو بكر وعمر -

"প্রত্যেক নবীর দু'জন মন্ত্রী ছিলো আকাশবাসীদের মধ্য থেকে এবং দু'জন মন্ত্রী ছিলো দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে। আমার আকাশবাসী মন্ত্রী দু'জন হচ্ছেন জিবরাঈল ও মিকাইল আর দুনিয়াবাসী মন্ত্রী দু'জন হচ্ছেন আবু বকর ও উমর।"

তিরমিযিতেই উকবা ইবনে আমের (রা.) এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لو كان بعدى نبى لكان عمر -

"যদি আমার পরে কোনো নবী থাকতো তাহলে উমরই হতো সে নবী।"

"বুখারি-মুসলিমে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা.) কে সম্বোধন করে বলেন :

يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجافا الاسلك فجا غير فجك -

www.icsbook.info

"হে খাওাবের পুত্র! সেই সত্তার কসম, যার মুঠিতে নিবদ্ধ আমার প্রাণ! যে পথেই শয়তান তোমার মুখোমুখি হয় সে পথ ছেড়ে সে অন্য পথে চলে যায়, যেখানে তুমি তার মুখোমুখি হবেনা।"

আবু দাউদ হযরত আবুযার গিফারি (রা.)-র সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন :- ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به "আল্লাহ হককে রেখে দিয়েছেন উমরের কণ্ঠে। সেই অনুযায়ী সেকথা বলে।"

বুখারি ও মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম লোকদেরকে আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে এবং তারা ছোট বড় জামা পরে রয়েছে। কারোর জামা বুক পর্যন্ত, কারোর বেশি নিচে পর্যন্ত। উমরকে আমার সামনে পেশ করা হলো। তার জামা মাটির ওপর ঘেঁষে ঘেঁষে চলছিল।" উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বপ্নের কি তাবীর করলেন? বললেন : জামা অর্থ হচ্ছে দীন।

এ রেওয়ায়েতগুলো তো হচ্ছে অন্যান্য সাহাবাদের, কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর নিজের অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতটি হাদিসের কিতাবগুলোয় উদ্ধৃত হয়েছে সেটি প্রণিধানযোগ্য :

বুখারির উদ্ধৃতি অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া বলেন "আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিলেন : আবু বকর (রা.)। আমি জিজ্ঞেস করলাম : তারপর কে? জবাব দিলেন : উমর (রা.)। আমি এই ভয়ে আর জিজ্ঞেস করলামনা যে, আবার এই প্রশ্ন করলে হয়তো বলবেন উসমান (রা.)। তাই বললাম : তারপর কি আপনি? জবাব দিলেন : ما انا الا رجل من المسلمين "আমি মুসলমানদের একজন ছাড়া আর কিছুই নই। এ জবাবটি ছিলো সাইয়িদুনা হযরত আলী (রা.)-র উন্নত ও পূতপবিত্র চরিত্রের অভিব্যক্তি। তাঁর মতো উন্নত পর্যায়ের ব্যক্তি নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার পরিবর্তে নিজেকে সাধারণ মুসলমানদের লাইনে দাঁড় করাবেন এটাই ছিলো স্বাভাবিক।

মুসনাদে আহমাদ ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে (এ রেওয়ায়েতটি তিরমিযি ও ইবনে মাজায়ও উদ্ধৃত হয়েছে) তাতে তাঁর পিতা সাইয়িদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় সামনে থেকে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)কে আসতে দেখা গেলো। নবী

www.icsbook.info

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আলী! এরা দু'জন নবীদের পর সমস্ত বয়স্ক ও যুবক জান্নাতবাসীদের নেতা। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নম্বর ৬০২)

হযরত আলী (রা.) থেকে সহীহ সনদের মাধ্যমে মুসনাদে আহমদ, বাযযার ও তাবারানীতে আর একটি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার পরে কে আমীর হবেন? তিনি জবাব দেন :

اَنْ تُؤَمِّرُوْا اَبَا بَكْرٍ تَجِدُوْهُ اَمِيْنًا زَاهِدًا فِى الدُّنْيَا رَاغِبًا اِلَى الْاٰخِرَةِ وَاِنْ تُؤَمِّرُوْا عُمَرَ تَجِدُوْهُ قَوِيًّا اَمِيْنًا لَّايَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاِنْ تُؤَمِّرُوْا عَلِيًّا وَّلَااَرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجِدُوْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَاخُذُ بِكُمُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ-

"যদি তোমরা আবু বকরকে আমীর বানাও তাহলে তাকে পাবে আমানতদার, দুনিয়ার ব্যাপারে নির্লোভ ও আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট। যদি তোমরা উমরকে আমীর বানাও তাহলে তাকে পাবে শক্তিশালী আমানতদার। আল্লাহর ব্যাপারে সে কোনো দুর্নাম রটনাকারীর দুর্নামের পরোয়া করবেনা। আর যদি তোমরা আলীকে আমীর বানাও, তবে আমার মনে হয় তোমরা তা করবেনা, তাহলে তোমরা তাকে পাবে পথপ্রদর্শনকারী ও পথ প্রাপ্ত যে তোমাদেরকে সোজা পথে চালাবে"– (মুসনাদে আহমদ : হাদিস নম্বর ৮৫৯)।

এই মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ২৬টি নির্ভুল সনদের মাধ্যমে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) তাঁর এক বক্তৃতায় প্রকাশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর (রা.) এবং তাঁর পর উমর (রা.)। এই রেওয়ায়াতগুলোর অধিকাংশের সমস্ত বর্ণনাকারী সিকাহ অর্থাৎ পুরোপুরি সৎ, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য এবং এদের কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। হাদিস শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী ২৩টি রেওয়ায়েত 'সহীহ' ও ২টি 'হাসান। কেবলমাত্র একটি রেওয়ায়েত 'যঈফ'।[১] এর

---

১. যে হাদিসের কোনো স্তরের কোনো বর্ণনাকারী উহ্য নেই, সকলেই সুস্পষ্ট, সকল বর্ণনাকারীই পরিপূর্ণ সত্যবাদী, মিথ্যাচারের ধারে কাছেও কেউ যাননা, সবাই শরিয়তের উপর পূর্ণ আমলকারী, কেউ ফাসেক ফাজের নন, সবাই পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, সেটিই সহীহ হাদিস। আর যে হাদিসটির উপরোক্ত সব গুণ রয়েছে, শুধুমাত্র বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি প্রথম পর্যায়ের নয়, সেটিকে বলা হয় হাসান হাদিস। ফকীহগণ এই দুই ধরনের হাদিস থেকেই আইন প্রণয়নে সহায়তা নিয়েছেন।
আর যে হাদিসের কোনো একজন বর্ণনাকারীও হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণ সম্পন্ন নয় সেটি যঈফ হাদিস। - অনুবাদক

www.icsbook.info

মধ্যে ১২টি হাদিসের রাবী বর্ণনাকারী হচ্ছে হযরত আবু হুজাইফা সাহাবি। হযরত আলীর (রা.) খিলাফত আমলে তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগ ও বায়তুল মালের প্রধান। তিনি বলেন : হযরত আলী (রা.) তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে প্রশ্ন করলেন, জানো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! আপনিই সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি জবাব দিলেন : না, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আরেকজন বর্ণনাকারী হচ্ছে আব্দ খায়ের হামদানী। তেরটি রেওয়ায়েত তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত আলীর এ রেওয়ায়েত কি আপনি তাঁর নিজ মুখে শুনেছেন? জবাবে তিনি বলেন : যদি আমি এগুলো তাঁর মুখ থেকে নিজের কানে না শুনে থাকি তাহলে আমার কান কালা হয়ে যাক।

আরেকজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইবরাহীম নাখয়ী। তিনি বলেন আলকামা কুফার মসজিদের মিম্বারের উপর হাত দিয়ে আঘাত করে বলেন : আমি এই মিম্বারে বসে হযরত আলীকে (রা.) তাঁর বক্তৃতায় একথা বলতে শুনেছি : 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আবু বকর তারপর উমর।"

বায়হাকী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আলীর (রা.) এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে : "আমরা এটাকে মোটেই দূরবর্তী মনে করতামনা যে, প্রশান্তি কথা বলতো উমরের মুখ থেকে।"

বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে ইবনে আব্বাসের (রা.) এ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে : হযরত উমরের (রা.) ইন্তিকালের পর তাঁকে গোসল দেবার জন্য তখতার উপর এনে রাখা হলো। চারদিক থেকে লোকেরা উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁর জন্য দোয়া করতে লাগলো। এমন সময় এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমার কাঁধে কনুয়ের ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলেন এবং বলতে লাগলেন "আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তুমি ছাড়া আর এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার সম্পর্কে আমি মনের গভীরে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, তার মতো আমলনামা নিয়ে যেনো আমি আল্লাহর সামনে হাযির হতে পারি। আমি আশা করি, আল্লাহ তোমাকে তোমার দুই সাথির (অর্থাৎ রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু) কাছেই রাখবেন। কারণ প্রায়ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনতাম, অমুক জায়গায় ছিলাম আমি, আবু বকর ও উমর; অমুক কাজটি করেছিলাম আমি, আবু বকর ও

www.icsbook.info

উমর; অমুক জায়গায় গিয়েছিল আমি, আবু বকর ও উমর; অমুক জায়গা থেকে বের হলাম আমি, আবু বকর ও উমর।" ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন আমি পেছন ফিরে দেখলাম, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) একথাগুলো বলছিলেন।[১]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'আনা মাদিনাতুল ইলম' হাদিসটি যদি সহীহ হয়ে থাকে এবং এর যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাই যদি এর যথার্থ অর্থ হয়ে থাকে তাহলে এই অসংখ্য হাদিস সম্পর্কে কি বলা হবে, যেগুলো অন্যান্য সাহাবাদের থেকে এর চাইতে অনেক গুণ শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে? কোন যুক্তিতে এ দুর্বলতর ও চরম সংশয়পূর্ণ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসটির ভিত্তিতে ঐগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে? আর যদি ঐগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করা যেতে পারে তাহলে সেগুলোর এমনকি ব্যাখ্যা করা হবে যার ফলে হযরত আলী মাদিনাতুল ইলমের একমাত্র দরজা হিসেবেও বহাল থাকেন এবং অন্যদিকে অন্যান্য সাহাবাগণ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং খোদ হযরত আলীর এ উক্তিগুলোর সত্যতাও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে? আমার মতে প্রথমত সাইয়্যিদুনা হযরত আলী (রা.) বর্ণিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের সংখ্যা কম নয়। কাজেই অনর্থক এমন একটা হাদিসকে তাঁর বর্ণিত হাদিস বলে দাবি করার চেষ্টা করা, যা সনদের দিক থেকে যঈফের চাইতেও নিম্ন পর্যায়ের, এর এমনকি প্রয়োজন আছে? তবুও যদি কেউ এর নির্ভুলতার উপর জোর দিতেই থাকেন তাহলে বলবো, এর শেষাংশটুকুও একেবারেই মিথ্যা, যেখানে বলা হয়েছে : 'যে ব্যক্তি এ শহরে আসতে চায় তাকে অবশ্যি ঐ একটি দরজা দিয়েই আসতে হবে।' কারণ এটি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য বহু উক্তি এবং তাঁর সারা জীবনের সমগ্র কাজের বিরোধী, উপরন্তু হযরত আলীর (রা.) নিজের বক্তব্যের সাথেও সাংঘর্ষিক। বড়জোর এর প্রথম অংশ 'আমি ইলমের শহর এবং আলী তার দরজা' –এ অংশটুকু মেনে নেয়া যেতে পারে। তাও এ অর্থে নয় যে, এই শহরের মাত্র একটিই দরজা এবং তা হচ্ছেন আলী (রা.)। বরং এই অর্থে যে, আলী (রা.) এই শহরের দরজাগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম দরজা। এ অর্থটিই সত্য এবং এটি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য বাণী ও কর্মকাণ্ডের সাথেও সামঞ্জস্যশীল। (তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট ১৯৫৭)

---

১. এ রেওয়ায়েতগুলোর জন্য দেখুন–মুসনাদে আহমদ, হাদিস নম্বর ৮২৩ থেকে ৮৩৭, ৮৭১, ৮৭৮ থেকে ৮৮০, ৯০৯, ৯২২, ৯৩২ থেকে ৯৩৪, ১০৩০ থেকে ১০৩২, ১০৪০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৯, ১০৬০।

www.icsbook.info

কয়েকটি হাদিসের জটিলতা নিরসন

প্রশ্ন : বেশ কিছুদিন ধরে দুই-তিনটে বিষয় আমার মগজের উপর বোঝা হয়ে চেপে আছে। এজন্য আপনার দিকনির্দেশনা আমার প্রয়োজন।

১. বুখারি শরিফের তৃতীয় হাদিসে অহি নাযিল হওয়া এবং নাযিল হওয়াকালীন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাবান্তরের বিবরণ রয়েছে। ঐ বিবরণ পড়ে মনে হয় যে, অহি অবতরণের সূচনাকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বেগজনক অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কেন? এর একটা ব্যাখ্যা সচরাচর দেয়া হয় এভাবে যে, এ অবস্থাটা ছিলো রিসালাতের দায়িত্ব অনুভূতির ফলশ্রুতি। কিন্তু এটা সন্তোষজনক মনে হয়না। নইলে ওয়ারাকার কাছে নিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয়না। কেউ কেউ এরূপ ধারণাও ব্যক্ত করে থাকেন যে, তখন পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে স্বীয় রিসালাতের ব্যাপারটা হয়তো যথাযথভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেটি। কিন্তু একথাটাও তেমন অর্থপূর্ণ মনে হয়না। এটা যদি সঠিক হয়, তাহলে যে ব্যক্তির কাছে এ বিষয়টি পেশ করার জন্য তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন- তিনি কি এই পরিস্থিতির পটভূমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে ভালো জানতেন? ওয়ারাকা বলেছিলেন যে, هذا الناموس الذى انزل الله على موسى (ইনিই সেই দূত, যাকে আল্লাহ মূসা (আ.) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন) এটা এই বক্তব্যকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করে যে, বাস্তবিকই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে স্বীয় রিসালাতের দায়িত্বটা যথাযথভাবে বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। এরপর ব্যাপারটা আরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। প্রকৃত ব্যাপারটা কি?

২. 'জিহাদ ও সন্ধির শর্ত সংক্রান্ত অধ্যায়ে' বর্ণিত ১২৬৬ নং হাদিসে সাহাবায়ে কেরামের অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার উল্লেখ করে সাহাবি হযরত উরওয়া (রা.) বলেন :

فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الاوقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده -

"খোদার কসম! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে নিসৃত কোনো তরল পদার্থ তাঁর সহচরবৃন্দের কারো না কারো হাতের তালুতেই পড়তো এবং তিনি তা নিজের মুখে বা ত্বকে মেখে নিতেন।" এখানে উল্লেখিত তরল পদার্থ বা (নাখামা) কফকেও বলা হয়। এর যেটাই হোক, বিষয়টা ভেবে দেখার মতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থুথু, কফ বা সিকনি কি সাধারণ কফ বা সিকনির মতো ছিলনা? না, ভক্তির আতিশয্যে সাহাবিগণ তা মুখে ও

www.icsbook.info

শরীরে মেখে নিতে কুণ্ঠিত হতেননা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচ্ছন্নতাকে এতো ভালোবাসতেন তবুও এ কাজে বাধা দিলেননা কেন?

৩. অযুর ব্যবহৃত পানিকে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের আওতাধীন ১৫৫ নং হাদিসে বলা হয়েছে যে :

دعاء النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ وجہہ فیہ ومج فیہ ثم قال لہما اشربا وافرغا علی وجوہکما ونحورکما -

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পানি ভর্তি পাত্র চাইলেন, অতপর তাতে হাত ও মুখ ধৌত করলেন ও কুলি করলেন। তারপর বললেন, এই পানিটুকু তোমরা দু'জনে পান কর এবং গলার উপর ঢেলে নাও।"

পানির পাত্রে হাত ধুলেন। আবার তার ভেতরে কুলি করলেন। আর এসব করার পর লোকজনকে তা খেতে বললেন ও তা দিয়ে মুখ ধুতে বললেন। এসব কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচ্ছন্নতা প্রিয়তার সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী মনে হয়। আবার সাহাবাদের এ ব্যাপারে আত্মহারা হয়ে গিয়ে তা ব্যবহার করা আরো আশ্চর্যজনক লাগে। এর ব্যাখ্যা প্রার্থনীয়।

৪. আল্লামা ইকবাল পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়, বিশেষত: আধুনিক সমাজে। আর জনাব গোলাম মোহাম্মদ পারভেজের অনুসারীরাও (হাদিস অমান্যকারী গোষ্ঠী) এই মহলে ঘুরাফেরা করে থাকেন। এজন্য এই মহলের লোকেরা বলে বেড়াচ্ছে যে, আল্লামা ইকবালও হাদিস মানতেননা। আসল ব্যাপার কি? মরহুম ইকবাল স্বীয় ইংরেজি ভাষণগুলোতে শরিয়তের যেসব উৎসের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে হাদিসেরও উল্লেখ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি যেসব বক্তব্য রেখেছেন, তা দ্বারা মরহুমের দৃষ্টিভঙ্গি হাদিস অমান্যকারীদের খানিকটা উৎসাহ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তর : আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন তার সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি :

অহি নাযিলের সূচনা

১. অহি নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা সঠিকভাবে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম একথা হৃদঙ্গম করা প্রয়োজন যে, একেবারে আকস্মিকভাবেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি যে নবী হতে যাচ্ছেন তা তিনি ইতিপূর্বে কল্পনাও করতে পারেননি এবং তা তিনি ঘুণাক্ষরেও কামনা করেননি। এজন্য তিনি কোনো প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেননা এবং একজন ফেরেশতা উপর থেকে বাণী নিয়ে আসবেন এমন প্রত্যাশাও তিনি করেননি। তিনি নির্জনে বসে বসে ধ্যান ও ইবাদত অবশ্যই করতেন। কিন্তু নবী হবার কথা তার চিন্তায়ও

www.icsbook.info

আসেনি। এমতাবস্থায় যখন হেরা গুহার সেই নিভৃত মুহূর্তে ফেরেশতা এলেন তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই বিরাট অসাধারণ অভিজ্ঞতায় ঘাবড়ে গেলেন। তিনি যতো বড় মহামানবই হোন না কেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে 'একজন মানুষ' হিসেবে তাঁর ঘাবড়ে যাওয়া অনিবার্য ছিলো। তাঁর এই হতবুদ্ধিতার উপাদান ছিলো একাধিক। বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন তাঁর মনে জন্ম নিচ্ছিল এবং তা তাঁর মনমেজাজকে অস্থির করে তুলেছিল। তিনি ভাবছিলেন, সত্যিই কি আমি নবী হয়ে গেলাম? কোনো কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় পড়লাম না তো? এতো বড় দায়িত্বভার আমি কিভাবে বহন করবো? মানুষকে আমি কিভাবে বলবো যে, আমি তোমাদের জন্য নবী নিযুক্ত হয়েছি? মানুষ আমার কথা কিভাবে বিশ্বাস করবে? এ যাবত যে সমাজে পরম সম্মানে বসবাস করেছি সেখানে এখন লোকেরা আমাকে উপহাস করবে। আমাকে পাগল বলবে। এই ঘোর অজ্ঞতার পরিবেশের বিরুদ্ধে আমি কিভাবে সংগ্রাম করবো? এককথায়, এ ধরনের কতো প্রশ্ন যে তাঁকে বিব্রত করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। এ কারণে তিনি যখন গৃহে পৌঁছলেন, তখন থর থর করে কাঁপছিলেন। গৃহে গিয়েই তিনি বললেন, আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও। গৃহের লোকেরা তাঁকে ঢেকে দিলো। কিছুক্ষণ পর তাঁর মন যখন কিছুটা শান্ত হলো, তখন মহিয়ষী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তিনি সমগ্র ঘটনা অবহিত করলেন এবং বললেন لقد خشيت على نفسى "আমি আমার জীবন নিয়ে শংকিত।"খাদিজা (রা.) তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন :

كلا والله ما يخزنك الله ابدا - انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم
تقرى الضيف وتعين على نوائب الحق -

"কখনও নয়! আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো দুঃখ দেবেননা, আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের উপকার করে থাকেন। অনাথদের সাহায্য করেন। সহায় সম্বলহীনকে সহায়তা করেন। অতিথির সমাদর করেন এবং সকল পুণ্য কর্মে অংশগ্রহণ করেন।"

এরপর তিনি তাঁকে ওয়ারাকা ইবনে নওফালের কাছে নিয়ে গেলেন। কেননা তিনি আসমানী কিতাবের অনুসারী তথা আহলে কিতাব ছিলেন এবং পূর্বতন নবীদের ইতিবৃত্ত জানতেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনাবলী শুনে কিছুমাত্র চিন্তা ভাবনা ছাড়াই এই বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন যে, 'ইনিই তো সেই দূত, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন।' কেননা তিনি শিশুকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, এই ব্যক্তির মধ্যে

www.icsbook.info

নবী হবার কোনো পূর্বপ্রস্তুতির নামগন্ধও ছিলনা। এই দু'টো বিষয়কে যখন তিনি উদ্ধৃত এ ঘটনার সাথে মেলালেন যে, আকস্মিকভাবে অদৃশ্য থেকে এক দূত এসে এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁকে নবীদের শিক্ষার হুবহু অনুরূপ বার্তা প্রদান করেছেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝলেন যে, এটা অবশ্যই যথার্থ নবুয়্যত।

এই সমগ্র ঘটনা এমন স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ যে, এ পরিস্থিতিতে এ ধরনের অবস্থার উদ্ভব হবারই কথা। এ নিয়ে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, আমার মতো এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথার্থ নবী হওয়ার একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। ঘটনাটা যদি এভাবে সংঘটিত না হতো এবং তিনি অকস্মাৎ হেরা গুহা থেকে এসে অত্যন্ত শান্তিতে ও স্বাভাবিকভাবে ফেরেশতার আগমনের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে নিজের নবুয়্যতের ঘোষণা জারি করতেন, তাহলে যে কোনো মানুষ সন্দেহ করতে পারতো যে, উনি বুঝি আগে থেকেই নিজেকে নবুয়্যতের যোগ্য মনে করে বসেছিলেন এবং দূরে হেরার গুহায় বসে বসে প্রতীক্ষারত ছিলেন যে, কখন তাঁর কাছে ঐশী প্রত্যাদেশ আসবে। এভাবে প্রতীক্ষারত অবস্থায় অত্যধিক ধ্যানমগ্নতার দরুন হয়তো তাঁর মানসপটে একজন ফেরেশতার ছবি ভেসে উঠেছে এবং অদৃশ্য থেকে আগত একটা কিছু আওয়াজও হয়তো শুনতে পেয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু আল্লাহর রহমতে সেখানে নবুয়্যতের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা বা চেষ্টা সাধনা দূরে থাক, যখন সত্যি সত্যি তা এলো, তখনো কিছু সময়ব্যাপী তাঁকে হতবুদ্ধিতা আচ্ছন্ন করে রাখলোনা। অন্য কথায় বলা যায়, অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারি হয়েও এই মানুষটি অহংকার ও গর্ববোধ থেকে এতো মুক্ত ছিলেন যে, নবুয়্যতের সুমহান মর্যাদায় হঠাৎ অধিষ্ঠিত হয়েও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর মন ভালোভাবে সায় দিতে পারেনি যে, দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমি একাই এই পদের জন্য মহাবিশ্ব প্রভুর মনোনয়ন লাভের উপযুক্ত হয়ে গেছি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থুথু থেকে বরকত লাভ

২. দ্বিতীয় প্রশ্নে আপনি যে ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, তা আসলে বিস্মিত হবার মতো ব্যাপারই নয়। কেবলমাত্র এই কথাটুকুই ভেবে দেখুন যে, ঘটনাটা একজন নবীর সাথে জড়িত, আর যারা খাঁটি মনে তাকে নবী বলে জেনে নিয়েছিল এবং এতবড় এক মহান ব্যক্তিত্বকে নিজেদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল তাদের ব্যাপার। যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তিত্ব বিরাজমান যিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার গৌরবের অধিকারী, তাদের উপর এমন মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সশরীরে

www.icsbook.info

উপস্থিতির কিরূপ প্রভাব থাকতে পারে, তা আপনি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যদি কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে তাদের স্থানে অবস্থিত মনে করেন। নবীদের ব্যক্তিত্বের এই অস্বাভাবিক প্রভাবের দরুনই তো তাঁদের ভক্তদের অনেকে সীমার মধ্যে থেমে থাকতে পারেনি এবং ভক্তির আতিশয্যে তাঁদেরকে খোদা, আল্লাহর পুত্র, অবতার এবং আরো কতো কি বানিয়ে ফেলেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে মানুষকে ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে অবিচল রাখার জন্য যে চেষ্টা করেছেন তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন এবং ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় ভক্তি প্রদর্শনের যতোখানি অনুমতি দেয়ার অবকাশ ছিলো ততোখানি দিয়েছেন। এ কারণেই লোকেরা কখনো যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থুথু মাটিতে পড়তে না দিয়ে থাকে এবং এগিয়ে এসে তা হাত পেতে নিয়ে শরীরে ও মুখে মালিশ করে থাকে, তবে তাতে তিনি বাধা দেননি। যারা একাজ করেছে তাদের ঘৃণা লাগলোনা কেন, এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো যে, সাধারণ মানুষের থুথু হলে তো ঘৃণা লাগারই কথা। কিন্তু যে মুখের উপর আল্লাহর বাণী নাযিল হয়েছে, সে মুখের থুথুতে ঘৃণা তো দূরের কথা, ঈমানদার লোকদের দৃষ্টিতে তার সামনে আতরও কিছু নয়।

৩. তৃতীয় ঘটনাও একই পর্যায়ের। তবে এ ঘটনার যে পূর্ণ বিবরণ বুখারির "কিতাবুল মাগাযি" (যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়)-এর আওতাধীন তায়েফের যুদ্ধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের রয়েছে, তা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে উপরে আমি যে কথাটা বলেছি তা আরো ভালোভাবে বুঝে আসবে। ঘটনাটা এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়েন যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রু পরিত্যক্ত সম্পদ (গণিমতের মাল) ঘটনাস্থলেই বন্টন না করে জিরানা নামক স্থানে গিয়ে বণ্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ কারণে কতিপয় সদ্য ঈমান আনা লোক বড়ই ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছিল। যখন তিনি জিরানা পৌছলেন, এক বেদুঈন এসে নিজের অংশের দাবি জানালো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন "তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর।" (অর্থাৎ শীঘ্রই গণিমত বিতরণ হবে এবং এতোক্ষণ তুমি যে ধৈর্যধারণ করেছ তার পুরস্কার তুমি পাবে এই সুসংবাদ)। সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো "আপনার এসব সুসংবাদ বহুবার শুনেছি।" হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) ও হযরত বিলাল (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উভয়কে সম্বোধন করে বললেন : "এই ব্যক্তি আমার সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমরা দু'জনে তা গ্রহণ করো।" উভয়ে বললেন,

www.icsbook.info

"আমরা গ্রহণ করলাম।" অতপর তিনি এক পেয়ালা পানি চাইলেন। সেই পেয়ালার মধ্যে তিনি হাতমুখ ধুলেন এবং কুলি করলেন। অতপর উভয় সাহাবিকে বললেন "তোমরা উভয়ে এই পানি পান কর, মুখে ও বুকে ঢেলে নাও এবং সুসংবাদ লও।" উভয়ে তৎক্ষণাত তাই করলেন। পর্দার আঁড়ালে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বসা ছিলেন। তিনি উভয় সাহাবিকে ডেকে বললেন : "তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু বাঁচিয়ে রেখ।" একথা শুনে তাঁরা কিছু পানি বাঁচিয়ে রাখলেন এবং তাঁকেও দিলেন।

এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে ঐ বেদুঈনকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, ঈমানের দাবি করা সত্ত্বেও সে এমন অমূল্য সুসংবাদকে প্রত্যাখ্যান করলো। এটা কতো বড় অকৃতজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। অথচ সত্যিকার মুমিনরা নবীর সাথে কেমন আচরণ করে থাকে। হযরত আবু মূসা আশয়ারীর বর্ণনাভঙ্গি ও হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঐ পানির কিছু অংশ চাওয়া থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাঁরা এই মহাপবিত্র পানি পান করা এবং মুখে ও বুকে মাখাকে ঘৃণা করা তো দূরে থাক, তাকে নিজেদের জন্য অমৃততুল্য মনে করতেন। এর জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন এবং এই নেয়ামত লাভ করায় গর্ববোধ করতেন।

৪. "আল্লামা ইকবাল ও হাদিস" সংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যাপারে আমি শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, হাদিস সম্পর্কে ইকবাল কি মত পোষণ করতেন বা করতেননা, সে প্রশ্নের আমাদের কাছে কোনো গুরুত্বই নেই। আমাদের কাছে যদি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও অকাট্য আল্লাহর নির্দেশ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মতের আলেম সমাজের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও আচরণবিধি না থাকতো, তাহলে হয়তো বা আমাদের জানবার প্রয়োজন দেখা দিতো যে, হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল মরহুমের ধ্যান ধারণা কি ছিলো। কিন্তু এসব অকাট্য দলিল প্রমাণ থাকতে আমাদের এ তথ্য অনুসন্ধান করার কোনোই প্রয়োজন নেই।" (তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৬০)

কুরআন ও হাদিসের পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রশ্ন : রাসায়েল মাসায়েল দ্বিতীয় খণ্ডের ৬২-৬৩ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারায় আপনি লিখেছেন : "কুরআনে যদি কোনো নির্দেশ ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয় এবং হাদিস ঐ ব্যাপক নির্দেশটির বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র বর্ণনা করে, তাহলে তা কুরআনের নির্দেশকে নেতিবাচক পর্যায়ে নামিয়ে দেয়না, বরং তার ব্যাখ্যারূপে বিবেচিত হয়। এ ব্যাখ্যাকে যদি আপনি কুরআন বিরোধী গণ্য করে প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে এর ফলে অসংখ্য ত্রুটি দেখা দেবে। এ সম্পর্কিত নজিরসমূহ আপনার সম্মুখে পেশ

www.icsbook.info

করলে আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পীড়াপীড়ি করা ভুল।'

এ কথাগুলোর পর যদি আপনি এ সংক্রান্ত কতিপয় নজির পেশ করতেন তাহলো প্রশ্নকারী আরো ভালোভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হতো। আমার এ ধরনের কতিপয় নজিরের প্রয়োজন যেগুলোর সাহায্যে একজন হাদিস অস্বীকারকারীকে একথা স্বীকার করানো যায় যে, এমন পরিস্থিতিতে (হাদিসের ব্যাখ্যাকে কুরআন বিরোধী গণ্য করলে) সত্যিই অসংখ্য ত্রুটি দেখা দেয়।

আমি ভালরূপেই জানি যে, হাদিস কুরআনের ব্যাখ্যা করে, কিন্তু কোনো নির্দেশ কুরআনের মধ্যে না থাকার ও কুরআন বিরোধী হবার মধ্যে পার্থক্য করতে পারিনা। মেহেরবানী করে আপনি এ সম্পর্কিত চারটি নজির পেশ করুন, যেনো এর মাধ্যমে আমার রেখা চিহ্নিত কথা দু'টির পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

উত্তর : হাদিস যেভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা করে, তার অসংখ্য নজিরের মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

কুরআন বলে, চোরের হাত কাটতে হবে। সেখানে চুরির কোনো সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এমনকি আপনার ছেলে আপনার পকেট থেকে একটি পয়সা বের করে নিলেও তাকে চোর গণ্য করা যেতে পারে। হাতেরও কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। ডান হাত না বাম হাত, কব্জি থেকে কাটতে হবে, না কনুইয়ের কাছ থেকে, না কাঁধের কাছ থেকে, তাও চিহ্নিত করা হয়নি। হাদিস এসব ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ করেছে। সেগুলো যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলে ভেবে দেখুন এ নির্দেশটি কার্যকরী করতে গিয়ে কতোগুলো জুলুমের অবতারণা হতে পারে।

কুরআন হজ্জ ফরয হবার ব্যাপক নির্দেশ দান করেছে। কিন্তু তা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর প্রতি বছর ফরয, না জীবনে একবার মাত্র আদায় করা যথেষ্ট, একথা সেখানে সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। শেষোক্ত কথাটি কেবল হাদিস থেকেই জানা যায়। হাদিসের এ ব্যাখ্যাটি যদি গ্রহণ না করা হয়, তাহলে কুরআনের ব্যাপক নির্দেশের অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানকে প্রতি বছর হজ্জ করতে হবে।

কুরআন কয়েক প্রকার মহিলাকে হারাম গণ্য করার পর বলে যে, তাদের ছাড়া বাদ বাকি সকল প্রকার মহিলাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল। এই হারামকৃত মহিলাদের মধ্যে চিরকালের জন্য হারাম মহিলাদের ছাড়া একমাত্র শ্যালিকার নামোল্লেখ করা হয়েছে-যখন তার বোন (অর্থাৎ স্ত্রী) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবাহাধীনে জীবিত থাকে, স্ত্রীর খালা ও ফুফির উল্লেখ করা হয়নি। হাদিস থেকে

www.icsbook.info

জানা যায় যে, স্ত্রীর নিজের বোনের ন্যায় তার মাতার বোন ও পিতার বোনের সাথেও একই সংগে বিয়ে করা জায়েয নয়। এই ব্যাখ্যা যদি গৃহীত না হয়, তাহলে নির্দেশের ব্যাপকতার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে মানুষ সেই সমস্ত অপকর্মের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে পারে, যেগুলোর পথরোধ করার জন্যে শরিয়ত দু'বোনকে এক সংগে বিয়ে করা হারাম গণ্য করেছিল।

কুরআন সোনা রূপা সঞ্চয় করে রাখার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। সূরা তওবার ৩৫-৩৬ নম্বর আয়াত দু'টি দেখুন। সেখানে এ নির্দেশটির ব্যাপকতা এতো বেশি যে, তার মধ্যে সোনা রূপার সামান্য একটি টুকরাও গৃহে রাখার অবকাশ দেয়া হয়নি। কিন্তু হাদিসের মাধ্যমে এ নির্দেশটির উদ্দেশ্য ও অর্থ পরিস্ফুট হয়েছে।

কোনো নির্দেশ যদি কুরআনে না থাকে এবং কেবল হাদিসে থাকে তাহলে এর অর্থ এই হয় যে, হাদিস কুরআনের অতিরিক্ত একটি নির্দেশ বর্ণনা করছে, কুরআনের বিরোধী কোনো নির্দেশ নয়। যেমন, নামাযের রাকাত, তার মধ্যে যা কিছু পড়া হয় এবং নামাযের অন্যান্য বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয়নি। হজ্জের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক কর্ম সম্পর্কে কুরআন কিছুই বলেনি। যাকাতের নেসাব, তার হার ও অন্যান্য বিস্তারিত বিষয় কুরআনে নেই। আযানের শব্দাবলী কুরআনে নেই। এ ধরনের যতোগুলো অতিরিক্ত নির্দেশ আমরা হাদিস থেকে পাই সেগুলো অবশ্য কুরআনের অতিরিক্ত কিন্তু তার বিরোধী নয়। কুরআন বিরোধী তখন হয়, যখন কুরআন একটি বিষয়ের নির্দেশ দেয় এবং হাদিসে সেটি করতে নিষেধ করে। অথবা এর বিপরীত অর্থ কুরআন নিষেধ করে কিন্তু হাদিস নির্দেশ দেয়। কোনো সহীহ হাদিসে এর কোনো নজির নেই। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)

হাদিস ব্যাখ্যার সঠিক পন্থা

প্রশ্ন : একটি প্রবন্ধে নিম্নোক্ত হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে। "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ! যদি তোমরা গোনাহ্ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে উঠিয়ে নিতেন এবং তদস্থলে অন্য একটি জাতিকে আনতেন, যারা গোনাহ্ করতো ও মাগফেরাত চাইতো। কাজেই আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিতেন।" আমার মনে হয় এ হাদিসটি মনগড়া এবং অপকর্মের বৈধতা প্রমাণ করার জন্যে এটি রচিত হয়ে থাকবে। বাহ্যত এর মধ্যে ইস্তেগফারকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে গোনাহ্ করার লালসা তার চাইতে অনেক বেশি স্থান লাভ করেছে বলে মনে হয়। এটি কি একটি সহীহ হাদিস ? এর কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা কি সম্ভব?

www.icsbook.info

উত্তর : কোনো হাদিসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্য চিন্তা ভাবনা করার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং কোনো কথা বোধগম্য না হলে অথবা তার কোনো ভুল অর্থ মনে স্থান পাবার পর নি:সংকোচে তাকে মনগড়া হাদিস আখ্যা দান করা, হাদিস প্রত্যাখ্যানের যথার্থ পদ্ধতি নয়। এই সংগে এ ধারণা করাও ঠিক নয় যে অমুক অমুক কারণে হাদিসটি রচিত হয়ে থাকবে। এভাবে হাদিস যাচাই করা হলে না জানি কতো বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদিস প্রত্যাখ্যাত হবে। হাদিস যাচাই করার জন্যে হাদিস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অপরিহার্য এবং এরপর দ্বিতীয় অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তুটি হচ্ছে, আলোচ্য বিষয়ের অন্তরদেশে প্রবেশ করার উত্তম যোগ্যতা। এভাবে বর্ণনা ও যুক্তির মধ্যে যথার্থ ভারসাম্য স্থাপিত হলে মানুষ হাদিস যাচাই করে তার নির্ভুলতা ও দুর্বলতা এবং তার বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অবস্থা সম্পর্কে কোনো মতামত কায়েম করার যোগ্যতা অর্জন করে।

আপনি যে হাদিসটির সমালোচনা করেছেন, সেটি মুসলিম, তিরমিযি ও মুসনাদে আহমদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উদ্ধৃত হয়েছে এবং রেওয়ায়েত হিসেবে তার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারেনা। আর এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা যায় যে, এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত আর যে সমস্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সাথে একে মিলিয়ে পড়লে এর এ অর্থ দাঁড়ায় না যে, মানুষের জেনেশুনে গোনাহ করা উচিত অতপর তওবা করা উচিত। বরং এর যথার্থ অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষ যতোক্ষণ মানুষ থাকে ততোক্ষণ একেবারে নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক থাকতে পারেনা। মানুষ কখনো গোনাহ করবেনা এটা তার আসল গুণ নয়, বরং তার আসল গুণ হচ্ছে এই যে, যখনই সে গোনাহ করবে তখনই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে এবং নিজের খোদার নিকট মাফ চাইবে। এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি নিষ্পাপ মখলুকাত সৃষ্টি করা আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মানুষের পরিবর্তে তিনি অন্য মখলুক পয়দা করতেন। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা নেকী ও গোনাহ উভয়টি সম্পাদনের যোগ্যতাসহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং নিষ্পাপ কর্ম সম্পাদন এ ধরনের মখলুক সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারেনা। তার সবচাইতে বড় মর্যাদা এই হতে পারে যে, মানুষ হবার কারণে যখনই সে কোনো দোষ করবে তখনই তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য পীড়াপীড়ি না করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে মাগফেরাত চাইবে। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬২)

❖❖❖

www.icsbook.info

যাকাত ও তার মালিকানা প্রসঙ্গ

সাধারণত হানাফী আলেমগণ যাকাত আদায়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে একজনকে মালিক বানিয়ে দেয়া অপরিহার্য মনে করেন। এজন্য তাদের ফতোয়া এই যে, মালিক বানানোর কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা মাদ্রাসা ও হাসপাতাল ইত্যাদির সামষ্টিক খাতে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। এ ব্যাপারে জনৈক প্রশ্নকারী আলেম সমাজের সামনে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন। মুহররম ১৩৭৪ হিজরির তরজমানুল কুরআনে এই প্রশ্নগুলো ছাপাও হয়েছে। প্রশ্নকর্তার মূল আপত্তির বিষয় ছিলো এই যে, হানাফী ফিকাহ মতে মালিক বানানোর যে শর্ত আরোপ করা হয় এবং তার ভিত্তিতে যে বিধিসমূহ রচিত হয়, তা শুধু ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু সামষ্টিকভাবে যেমন ইসলামী সরকারের মাধ্যমে যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা থাকলে মালিক বানানোর শর্ত ও তার ভিত্তিতে রচিত বিধিমালা একদিনের জন্যও চালু থাকতে পারেনা। কেননা যাকাতের ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও সংহত করতে গিয়ে তার বন্টন ও ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ও স্থানান্তর এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সংগ্রহে এতো রকমারি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, সেসব ক্ষেত্রে মালিক বানানোর শর্ত মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এসব প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

"যে ফতোয়া প্রসঙ্গে এসব প্রশ্ন উঠেছে, আমার মতে ঐ ফতোয়া যাকাত সংক্রান্ত আয়াত إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ এর হানাফী ব্যাখ্যা অনুসারেও সঠিক নয়। আয়াতটির প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করার জন্য প্রথমে এর শাব্দিক অর্থের দিকে একটা নজর বুলিয়ে নিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . الخ

"সদকা দরিদ্রদের জন্য, মিসকিনদের জন্য এতদসংক্রান্ত কাজে নিয়োজিতদের জন্য এবং যাদের মনকে আকৃষ্ট করা কাম্য তাদের জন্য -----।"

এখানে লক্ষণীয় যে, 'লাম' অর্থাৎ 'জন্য' অব্যয়টি শুধু দরিদ্রদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি, বরং মিসিকিন, এতদ্সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিতদের এবং যাদের মনকে আকৃষ্ট করা কাম্য তাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। এই 'লাম' বা 'জন্য' শব্দটি যদি মালিকানা স্বত্ব দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে তা

www.icsbook.info

যেমন দরিদ্রদের সাথে, তেমনি অন্য তিন শ্রেণীর সাথেও একই অর্থে সংযুক্ত হবে। আর যদি তা নিছক অধিকার নির্ধারণ বা বরাদ্দকরণ অথবা অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে সেই অর্থেই তা দরিদ্রদের এবং অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর সাথেও যুক্ত হবে। এখন হানাফীগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, সে অনুসারে এর দ্বারা যদি মালিক বানিয়ে দেয়াই বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে যাকাতও অনুরূপ বাধ্যতামূলক দান সদকার টাকা বা দ্রব্য উক্ত চারজনের মধ্যে যাকেই দেয়া হবে, তাকে মালিকই বানানো হবে। এরপর পুনরায় মালিক বানানোর বিধি কোথা থেকে উদ্ভাবন করা হয়? দরিদ্র অথবা মিসকিনের মালিকানায় যাকাতের অর্থ পৌঁছে যাওয়ার পর ঐ জিনিস ব্যবহারে কি তার উপর কোনো বিধি নিষেধ আছে? তা যদি না থাকে, তাহলে যারা যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত, তাদের হাতেও তা পৌঁছে যাওয়ার পর যখন তাদের মালিকানা লাভের শর্ত পূর্ণ হয়ে গেলো. তখন পুনরায় বাড়তি মালিকানার বাধ্যবাধকতা আরোপের যুক্তি কি?

'লাম' বা 'জন্য' শব্দটিকে যদি মালিক বানানোর অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তি যখন যাকাত ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক 'সদকা' যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত লোকদের হাতে অর্পণ করে, তখন কার্যত: সে তাদেরকে তার মালিকই করে দেয়া। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) ও রাজস্বলব্ধ সম্পদ (ফায়) যেমন সরকারের সম্পত্তি হয়ে যায়, তেমনি যাকাতের মালও তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এরপর তারা ঐ মাল অন্য যেসব হকদারকে দেবে, তা তাদেরকে মালিক বানানোর প্রক্রিয়াতেই দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকেনা। অবশিষ্ট সাতটি খাতে তারা যেভাবে ভালো ও প্রয়োজন মনে করে, সেভাবে তা বন্টন করতে পারে। মালিকানার প্রতীক 'লাম' অব্যয়টির শক্তিবলে তাদের উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা চলেনা। কেবল একটি বিধিই আরোপ করা যায়। সেটি এই যে, যে ব্যক্তি যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের কাজে নিয়োজিত সে কেবল নিজের কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। অবশিষ্ট মাল তাকে যাকাতের অন্যান্য হকদারদের মধ্যে বন্টন করতেই হবে। কেননা যাকাত সদকার কাজে নিয়োজিত লোক হিসেবেই তাদেরকে ঐ মালের মালিক করা হয়, স্বয়ং তার হকদার হিসেবে না। "যাকাতের কাজে নিয়োজিত" এই কথাটাই ব্যক্ত করে কোন্ কারণে যাকাত তাদের হাতে অর্পণ করা হয়। একথাটা থেকে এও জানা যায় যে, বিভাগীয় কর্মী হিসেবে এই মালের কতোটুকু বৈধ উপায়ে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারে ব্যয় করতে পারে।

www.icsbook.info

এই ব্যাখ্যার পর হযরত আনাসের বর্ণিত যে হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার। হযরত আনাস বলেন যে এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো যে,

اِذَا اَدَّيْتُ الزَّكٰوةَ اِلٰى رَسُوْلِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ منها الى الله ورسوله -

"আপনার প্রেরিত আদায়কারীর কাছে আমি যদি যাকাত দিয়ে দেই তাহলে কি আল্লাহ ও তার রসূলের সামনে আমি দায়মুক্ত হয়ে যাবো? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

نعم اذا اديتها الى رسولى فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها

"হাঁ, আমার প্রেরিত আদায়কারীর কাছে যাকাত দিয়ে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে দায়মুক্ত। এর পুরস্কার তোমার প্রাপ্য। আর যে ব্যক্তি তাতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করবে, তার পাপ সেই ভোগ করবে।"

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাকাত প্রদানকারী স্বীয় যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিকট সোপর্দ করার পর দায়মুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ মালিকানার প্রতীক 'লাম' বা 'জন্য' অব্যয়টির দাবি কোনো দরিদ্র বা মিসকিনকে যাকাত দিলে যেমন পূর্ণ হয়ে যায়, তেমনি তা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদের কাজে অর্পণ করলেও পূর্ণ হয়। এখন এই কর্মচারীরা যদি মালিকানা প্রদানসহকারে অন্যান্য হকদারদের তা বন্টন করে কেবল তাহলেই তাদের কাছে যাকাত দেয়া যাবে, অন্যথায় দেয়া যাবেনা, এ ফতোয়া কিসের ভিত্তিতে দেয়া হয়? কর্মচারীরা কিভাবে যাকাত বন্টনসম্পন্ন করে, সেটা তদারক করার দায়িত্ব যাকাতদাতার উপর কে আরোপ করলো? দাতার দায়িত্ব শুধু ততোটুকু যে যাকাত যাদের প্রাপ্য তাদেরকেই অথবা যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে নিজ যাকাতের মালিক করে দিতে হবে। বড়জোর একথা বলা যেতে পারে যে, যার কাছে যাকাত অর্পণ করা হয়, তার ব্যাপারে যাকাতদাতাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে সত্যিই যাকাত বিষয়ক কর্মচারী কিনা। ইসলামী সরকার যদি থাকে এবং সেই সরকার যদি যাকাত কর্মী নিয়োগ করে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির কাছে যাকাত আদায়ের নিয়োগপত্র থাকাই এই নিশ্চয়তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তা যদি না থাকে এবং মুসলমানদের কোনো সামাজিক সংগঠন নিজ দায়িত্বে তাদের যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করে, তাহলে সেই সংগঠন সম্পর্কে শুধু এটুকু অনুসন্ধান করতে হবে যে, সে সত্যিই তা হকদারদের মধ্যেই বন্টন করে থাকে কিনা এবং এই ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তা থেকে বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করে কিনা। অনুসন্ধান করে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে ঐ সংগঠনকে

www.icsbook.info

যাকাত প্রদানকারী নি:সন্দেহে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ব্যবস্থাপক যাকাতের অর্থ মালিকানা প্রদানসহকারে বন্টন করে কিনা, সেটাও যাকাত প্রদানকারীকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, এমন কোনো দলিল আমি শরিয়তের বিধানে দেখিনা।

এবার একথাটাও অনুধাবন করা দরকার যে, 'যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত' কুরআনের এই প্রবচনটি কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এটা শুধুমাত্র ইসলামী সরকার কর্তৃক এই কাজে নিয়োগকৃত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরআনের এই প্রবচনটি এতো ব্যাপক অর্থবোধক যে, যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যাপারে 'কর্মরত' যে কোনো ব্যক্তির বেলায়ই তা প্রযোজ্য। এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটিকে সংকীর্ণ ও সীমিত অর্থে প্রয়োগ করার পক্ষে কোনো প্রমাণ আছে বলে আমার জানা নেই। ইসলামী সরকার যদি বর্তমান না থেকে থাকে অথবা এই দায়িত্বকে অবহেলা করে এবং মুসলমানদের কোনো গোষ্ঠি এই কাজটি করতে উদ্যোগী হয়, তাহলে কোন্ যুক্তিতে তাদেরকে বলা যাবে যে, তোমরা "যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত লোক" নও? আমি তো মনে করি যে, এটা আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি সরকার নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার পরিবর্তে স্বীয় নির্দেশ প্রদান করার জন্য এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যাতে করে মুসলমানরা ইসলামী সরকারের অবর্তমানে কিংবা অবহেলা প্রবণ শাসকদের বিদ্যমানতায় আপন প্রচেষ্টায় যাকাত আদায় ও বন্টনের জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর এই অবাধ ও সাধারণ নির্দেশকে যদি অবাধ ও সাধারণই মেনে নেয়া হয়, তাহলে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা, এতিমদের লালন পালন, বৃদ্ধ, দুর্বল ও পঙ্গুদের তত্ত্বাবধান, সহায় সম্বলহীন রোগীদের চিকিৎসা এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপকরা সম্পূর্ণ বৈধভাবেই "যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত লোক" বলে গণ্য হবে এবং তাদের যাকাত আদায় ও প্রয়োজন মোতাবেক তা ব্যয় করার অধিকার ও ক্ষমতা থাকবে। সেক্ষেত্রে ইদানিং আরবি মাদ্রাসাসমূহের মুহতামেম সাহেবগণ যাকাত সংগ্রহের জন্য যেসব হিলাবাজির আশ্রয় নিয়ে থাকেন তার কোনো প্রয়োজন হয়না। অনুরূপভাবে, শুধুমাত্র যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজেই নিয়োজিত থাকে, এমন প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তার কর্মকর্তারাও 'যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী'রূপে গণ্য হবেন এবং মালিকানা প্রদান সংক্রান্ত ফতোয়া দিয়ে তাদের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রয়োজন থাকবেনা।

আমার মতে, কুরআনের ভাষায় ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতার প্রতি দৃষ্টি দিলে শুধুমাত্র উপরোল্লিখিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য হয়না, বরং আরো কয়েক ধরনের কর্মচারী এর আওতায় আসে। যেমন কোনো এতিমের

www.icsbook.info

অভিভাবক, কোনো রোগী বা পঙ্গু ব্যক্তির তত্ত্বাবধানকারী এবং কোনো অসহায় বৃদ্ধের তত্ত্বাবধায়কও "যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত।" এরা যাকাত আদায় করে এসব আর্তের প্রয়োজন পূরণে তা ব্যয় করতে পারে এবং তা থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজ কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে চাইলে তাও গ্রহণ করতে পারে।

যাকাতের অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে হলে তা থেকে ডাক বিভাগের মাশুল বা ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ দেয়া যেতে পারে। কেননা এই কাজটুকু সম্পাদন করার পর্যায়ে ডাক বিভাগ ও ব্যাংক 'যাকাত সংক্রান্ত কর্মচারী' বলে গণ্য হবে।

যাকাত আদায় করা, যাকাতের সামগ্রী প্রয়োজন মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া অথবা যাকাতের হকদারদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত রেল, বাস, ট্রাক, ঠেলাগাড়ি, রিকসা ইত্যাদি ব্যবহার করা হলে তার ভাড়া যাকাতের টাকা থেকে দেয়া যায়। কেননা এসব কার্য সম্পাদনের সময় এগুলো সব 'যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত' বলেই গণ্য হবে।

যাকাতের হকদারদের উপকারার্থে যতো সংখ্যক শ্রমিক বা কর্মচারী ব্যবহৃত হবে তাদের সকলের মজুরী বা বেতন যাকাতের তহবিল থেকে দেয়া যাবে। কেননা এসবই "যাকাতের কাজে নিয়োজিত"। রেল স্টেশনে যাকাতের দ্রব্যাদি ভর্তি বস্তা উঠানো নামানো, দরিদ্র রোগীদের সেবা সুশ্রুষার জন্য গাড়ি চালানো অথবা এতিম শিশুদের তত্ত্বাবধান যেটাই কেউ করুক, সে এই পর্যায়ভুক্ত।

এখন যে প্রশ্নটির মীমাংসা বাকি থাকছে তা এই যে, যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত লোকদের উপর এমন কোনো বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে কিনা যে, যাকাতের হকদারদের সেবার জন্য ভবন নির্মাণ করা যাবেনা এবং গাড়ি, ওষুধ যন্ত্রপাতি, কাপড় চোপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যাবেনা। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যাকাত সংক্রান্ত আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা হানাফী মতে করা হয়, সে হিসেবে এই বিধি নিষেধ শুধুমাত্র যাকাতদাতার উপর আরোপিত হয়। দাতা নিজে এর কোনো একটি খাতেও যাকাতের টাকা ব্যয় করতে পারবেনা। তার কাজ শুধু এতোটুকুই যে, আল্লাহ নির্দেশ অনুসারে যাকাত যাদের প্রাপ্য তাদের অথবা তাদের কোনো একজনের মালিকানায় সোপর্দ করে দিতে হবে। কিন্তু যারা যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত, তাদের উপর ও ধরনের নির্দেশ নেই। তারা যাকাতের সকল হকদারের অভিভাবক বা প্রতিনিধিস্বরূপ। তাই মূল হকদাররা যাকাতের অর্থ ব্যয়ে যতোখানি স্বাধীন, তাদের অভিভাবক বা প্রতিনিধি হিসেবে এরাও ততোখানি স্বাধীন। দরিদ্র ও মিসকিনদের জন্য তারা যদি কোনো ভবন নির্মাণ করে বা গাড়ি খরিদ করে তাহলে সেটা হবে ব্যক্তিগতভাবে

www.icsbook.info

যাকাত প্রাপ্ত বহু সংখ্যক দরিদ্র ও মিসকিনের যৌথভাবে কোনো ভবন নির্মাণ কিংবা কোনো যানবাহন খরিদ করার মতো। তাদের এই ব্যয়ে যেমন কোনো বিধি নিষেধ নেই, তেমনি তাদের প্রতিনিধি বা অভিভাবকের ব্যয়েও বিধি নিষেধ নেই। যাকাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদের কাছে যাকাত সোপর্দ করার রীতি আল্লাহ এজন্যই প্রবর্তন করেছেন এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাতে যাকাত প্রদানকারীকে এজন্যই দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন যে, তাদের হাতে এ অর্থ বা সামগ্রী সমর্পণ করা সকল হকদারকে দিয়ে দেওয়ার শামিল। তাদের পক্ষ থেকেই তারা তা আদায় করে এবং তাদেরই প্রতিনিধি ও অভিভাবক হয়ে তা ব্যয় করে। আপনি তাদের ব্যয়ে এদিক দিয়ে আপত্তি তুলতে পারেন যে, তুমি অমুক ব্যয় বিনা প্রয়োজনে করেছো অথবা অমুক কাজে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় করেছো অথবা নিজের কাজের পারিশ্রমিক যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের অতিরিক্ত নিয়েছো অথবা কোনো কর্মচারীকে যুক্তিসঙ্গত হারের চেয়ে বেশি মজুরী দিয়েছো। কিন্তু শরিয়তের এমন কোনো বিধি আমার জানা নেই, যার ভিত্তিকে যাকাত কর্মীদের এক ধরনের ব্যয়ের অনুমতি দেয়া এবং আরেক ধরনের ব্যয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যাকাতের হকদারদের জন্য যা কিছুই করা দরকার হোক, শরিয়তের বিধি তাদেরকে তা করার অনুমতি দেয়।

মোটকথা, এ ব্যাপারে আসল প্রশ্ন দু'টো এবং সেই দু'টো প্রশ্নেরই মীমাংসা প্রয়োজন।

একটি এই যে, যাকাত প্রদানকারী ও যাকাতের হকদারদের সম্মতিক্রমে যদি কতিপয় বেসরকারি লোক যাকাতের ব্যবস্থাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহলে তারা কুরআনে বর্ণিত 'যাকাত বিষয়ক কর্মচারীর সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ কিনা?

অপরটি এই যে 'যাকাত সংক্রান্ত কর্মচারীদের' হাতে যাকাত সোপর্দ করার পর তাদের তা ব্যয় করা বা বিলিবণ্টন করার জন্য মালিক বানিয়ে দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করার যুক্তি প্রমাণ কি?

এই দু'টো প্রশ্ন সম্পর্কে ভেবেচিন্তে একটা সিদ্ধান্ত দেয়াই আলেম সমাজের কর্তব্য। (তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল ১৩৭৪ হি:, ডিসেম্বর ১৯৫৪)

এক দেহীভূত যমজ বোনের বিবাহ

(নীচের যে প্রশ্নটির জবাব দেয়া হচ্ছে তার ভিত্তিতে একদল লোক কয়েক বছর থেকে লেখকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যে, তিনি একই সংগে দুই বোনের বিয়ে হালাল করে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি এ আলোচনাটি পাঠ করে

www.icsbook.info

নিজেই এ অপপ্রচারটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দুই যমজ ভাই বা বোনের একদেহীভূত হওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। রিডার্স ডাইজেস্টের ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় শ্যামদেশের একদেহীভূত যমজ ভাইয়ের কাহিনী দ্রষ্টব্য।)

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত বিষয়টির জবাব দেবেন। জবাবটি কোনো সাক্ষাতকারীদের মাধ্যমে পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

বাহাওয়ালপুরে দু'টি একদেহীভূত যমজ বোন আছে, অর্থাৎ জন্মের সময় তাদের কাধ, পার্শ্বদেশ ও কোমরের হাড় জোড়া ছিলো। কোনোক্রমে তাদেরকে আলাদা করা সম্ভব ছিলনা জন্মের পর থেকে এখন যৌবনে পদার্পণ পর্যন্ত তারা একত্রে চলাফেরা করছে। তাদের একই সংগে ক্ষুধা লাগে, একই সংগে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয় এমনকি যদি তাদের একজন কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে অন্যজনও তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন পুরুষের সাথে তাদের দু'জনের বিয়ে হতে পারে কিনা। উপরন্তু তাদের দু'জনকে যদি একই সময়ে একই পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া যায় তাহলে এর সপক্ষে শরিয়তের প্রমাণ উল্লেখ করবেন।

স্থানীয় আলেমগণ তাদেরকে একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দেবার অনুমতি দেননা আবার দু'জন পুরুষের সাথে বিয়ে দিতেও আপত্তি করেন। একজন পুরুষের সাথে তাদের বিয়ে জায়েয না হবার সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের একটি আয়াত, যাতে বলা হয়েছে যে, দু'জন সহোদর বোনের সাথে একই সময়ে একজন পুরুষ বিয়ে করতে পারে না। ---এ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের ভিত্তিতে যদি দু'টি পুরুষের সাথে এই একদেহীভূত মেয়ে দু'টির বিয়ে দেয়া হয় তাহলে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলো দেখা দেয়। এগুলো প্রত্যক্ষ করে ওলামায়ে কেরাম নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

১. একজন পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রী পর্যন্ত নিজের যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখবে এবং অন্য যে মেয়েটির সাথে তার বিয়ে হয়নি তার সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েম করবেনা, এর কি নিশ্চয়তা আছে?

২. এই দ্বিতীয় মেয়েটি তার বোনের সাথে একদেহীভূত হবার সাথে সাথে এক স্বভাব প্রকৃতিরও অধিকারী। কাজেই তার বোনের সাথে ঐ ব্যক্তির দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের সময় সে নিজেও কি প্রভাবিত হবেনা?

৩. দু'জন পুরুষের সাথে তাদের বিয়ে হলে দুই বোনই (যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সময়) তাতে প্রভাবিত হবে, তাদের লজ্জা আহত হবে, তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণা সৃষ্টি হবে, কাজেই এ ধরনের বিয়ে কি "ওয়া জায়ালা বাইনাকুম

www.icsbook.info

মাওয়াদ্দাতান এবং ওয়া জায়ালা মিনহা যাওজাহা লিয়াসকুনু ইলাইহা" এ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিয়ের যে প্রাণশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তার বিরোধী নয়?

৪. বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি এবং সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন। কিন্তু দু'জন পুরুষের এ বিয়ে এ সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত হানে। এছাড়াও আরো বহু অনিষ্টকারিতা আছে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হলোনা।

মেহেরবানী করে শরিয়তের আলোকে এ সমস্যাটির সমাধান করুন। এ অচলাবস্থা দূর করুন। ঐ মেয়েদের পিতামাতা যেনো তাদের বিয়ে দিতে পারে এবং যৌবনে পদার্পণ করার কারণে যে ফিতনার সৃষ্টি হয়েছে তার দরজা যেনো বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তর : এ মেয়ে দু'টির ব্যাপারে চারটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

এক. দু'জনের বিয়ে দু'টি পৃথক পৃথক পুরুষের সাথে দেয়া যেতে পারে।

দুই. তাদের একজনকে কোনো একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং অন্যজনকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

তিন. দু'জনের বিয়ে একজন পুরুষের সাথে দেয়া যেতে পারে।

চার. দু'জনকে চিরকালের জন্যে বিয়ে থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

এর মধ্যে প্রথম পন্থা দু'টি এমন সুস্পষ্টভাবে অবৈধ, অযৌক্তিক ও অবাস্তব যে, এদের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। এখন শেষের দু'টি পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এ পন্থা দু'টি বাস্তবানুগ। কিন্তু এ দু'টির একটি পন্থা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, যেহেতু এর ফলে একই সময়ে দুই বোনকে বিয়ে করা হয় এবং কুরআনে এটিকে হারাম করা হয়েছে তাই অবশ্যি সর্বশেষ পন্থাটিকে কার্যকরী করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে ওলামায়ে কেরামের একথাটি যথার্থ মনে হয়। কারণ মেয়ে দু'টি যমজ বোন এবং কুরআনে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একই সময়ে দুই বোনকে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এখানে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক, এ মেয়ে দু'টিকে চিরকাল যৌন সম্পর্ক রহিত এবং বিবাহ থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য করা কি জুলুম নয়? দুই একটি মেয়ে জন্মগতভাবে যে বিশেষ ও অস্বাভাবিক অবস্থার সাথে জড়িত কুরআনের এ হুকুমটি কি সত্যিই তার সাথে সম্পৃক্ত?

আমার মত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এ ফরমানটি এ বিশেষ অবস্থাটির জন্যে নয়, বরং যে সাধারণ অবস্থায় দু'বোন আলাদা আলাদাভাবে জন্মগ্রহণ করে সেই অবস্থার জন্যে ফরমানটি প্রদত্ত হয়েছে এবং এই সাধারণ অবস্থায় যদি এক ব্যক্তি

www.icsbook.info

একই সময় দু'বোনকে বিয়ে করে তাহলে এ নির্দেশটি অমান্য করা হবে, অন্যথায় নয়। আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ম হচ্ছে, তিনি সাধারণ অবস্থার জন্যে নির্দেশ দান করেন এবং বিশেষ ও অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যে কোনো নির্দেশ না দিয়ে সামনে অগ্রসর হন। এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হলে সাধারণ নির্দেশকে হুবহু তার উপর প্রয়োগ করার পরিবর্তে নির্দেশের রূপকল্পটি বাদ দিয়ে তার উদ্দেশ্যকে সংগত পদ্ধতিতে পূর্ণ করাই ফিকাহ্ জ্ঞানের পরিচায়ক।

এর নজীরস্বরূপ বলা যায়, রোযা সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন, সুবহে সাদেকের উদয়ের সাথে সাথে রোযা শুরু করতে এবং রাত শুরু হবার সাথে সাথে ইফতার করতে। পৃথিবীর যে সমস্ত এলাকায় চব্বিশ ঘণ্টায় রাত দিন হয় সেসব এলাকার জন্যে এ নির্দেশটি প্রদত্ত হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি এসব এলাকায় থাকার দরুন নির্দেশটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি এলাকার যেখানে রাত ও দিন কয়েক মাস পরিমাণ দীর্ঘ হয়, সেসব এলাকার বিশেষ অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি এ নির্দেশটি প্রয়োগ করেন তাহলে তিনি মস্ত বড় ভুল করবেন। এসব এলাকার জন্য একথা বলা মোটেই যথার্থ নয় যে, সেখানেও সুবহে সাদেকের উদয়ের সাথে সাথে রোযা শুরু করতে হবে এবং রাত শুরু হবার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে। অথবা সেখানে আদতে রোযা রাখতেই হবেনা। এসকল স্থানে নির্দেশের রূপকল্পটি বাদ দিয়ে অন্য সংগত পদ্ধতিতে নির্দেশের উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই প্রকৃত ফিকাহ্ জ্ঞানের পরিচায়ক। যেমন, রোযার জন্যে এমনসব সময় নির্ধারণ করা উচিত যা পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতির রোযা কালের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

আমার মতে যে মেয়ে দু'টির দেহ একত্র সংযুক্ত তাদের ব্যাপারেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। দু'জন পৃথক পৃথক পুরুষের সাথে তাদের বিয়ে দেয়া বা আদতে তাদের বিয়ে না দেয়ার প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ। এর পরিবর্তে এর বাহ্যিক রূপকল্পটি বাদ দিয়ে কেবল এর উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করা উচিত। এর নির্দেশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু'বোনকে সতিনসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নিক্ষেপ করা থেকে রক্ষা করা। আর এখানে যেহেতু এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে দু'জনের বিয়ে একই ব্যক্তির সাথে হতে পারে অথবা আদতে তাদের বিয়েই হতে পারেনা, তাই ঐ বোনদ্বয় একই সময় এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে করতে রাজি আছে বা চিরন্তন কুমারিত্ব অবলম্বন করতে প্রস্তুত, এ ব্যাপারটি তাদের দু'জনের মতের উপর ছেড়ে দেয়াই সংগত। যদি তারা নিজেরাই প্রথম অবস্থাটি গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে পছন্দ করে এমন কোনো ব্যক্তির সাথে তাদের বিয়ে দেয়া উচিত। আর যদি তারা

www.icsbook.info

দ্বিতীয় অবস্থাটি পছন্দ করে তাহলে এ জুলুমের জন্যে আমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাই এবং খোদার আইনও।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ঐ মেয়ে দু'টিকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেবার পর ঐ ব্যক্তি তাদের একজনকে তালাক দিতে পারে, তখন কি অবস্থা হবে? আমি বলবো, এ অবস্থায় তাদের দু'জনই তার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। একজনকে তো তালাক দেয়া হয়েছে তাই সে আলাদা হয়ে যাবে। আর প্রথম জনের সাথে মিলনের অপরাধে অপরাধী না হয়ে দ্বিতীয় জনের থেকে সে কোনো প্রকার ফায়দা হাসিল করতে পারবেনা বলে দ্বিতীয় জনও আলাদা হয়ে যাবে। কেবল এতোটুকুই নয়, বরং সে ঐ অতালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে নিজের গৃহে রাখতে পারবেনা। কারণ তালাকপ্রাপ্তা মেয়েটিকে নিজের গৃহে রাখার জন্য বাধ্য করার অধিকার তার নেই। আর তালাকপ্রাপ্তা মেয়েটিকে বাদ দিয়ে অতালাকপ্রাপ্তা মেয়েটি তার গৃহে থাকতে পারেনা। কাজেই সে তাদের একজনকে তালাক দিলে অন্যজন 'খুলা' তালাক দাবি করার বৈধ অধিকার লাভ করবে। যদি সে 'খুলা' তালাক না দেয় তাহলে আদালত তাকে খুলা তালাক দিতে বাধ্য করবে। এ মেয়ে দু'টি জন্মগতভাবে এহেন শারীরিক কাঠামোর অধিকারিণী যার ফলে কোনো ব্যক্তি তাদের একজনের সাথে বিয়ে করতে পারেনা এবং একজনকে তালাকও দিতে পারেনা। তাদের বিয়েও একসাথে হবে এবং তালাকও হবে একসাথে। আমার মতে এটিই যথার্থ, অবশ্যি আল্লাহই ভালো জানেন। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫৪)

বিয়ের পূর্বে তালাক

প্রশ্ন : আমার এক অবিবাহিত বন্ধু সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে একবার বলে ফেলেছিল "আমি যে নারীকেই বিয়ে করিনা কেন, তাকে তিন তালাক দিলাম।" একথার জন্যে এখন সে খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। সে এখন বিয়ে করতে চায়। স্থানীয় উলামায়ে কিরাম বলছেন, বিয়ে করার সাথে সাথেই স্ত্রীর উপর তার তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তাই এখন গোটা জীবন বিয়ের চেষ্টা করাটা তার জন্যে একটা নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। মেহেরবানী করে বলুন, এই বিপদ থেকে মুক্ত হবার কোনো পথ আছে কি নেই?

উত্তর নি:সন্দেহে হানাফী ফকীহগণের মত এটাই যে, এমতাবস্থায় যে নারীর সাথেই তার বিয়ে হবে, সাথে সাথে তার উপর তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু সকল ফিকাহর ইমামগণ এর সাথে একমত নন।

www.icsbook.info

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল–এর মত হচ্ছে, কেবলমাত্র বিবাহের পরেই কোনো ব্যক্তি তালাকের অধিকার লাভ করে থাকে, বিবাহের পূর্বে নয়। কোনো ব্যক্তি যদি একথা বলে : "ভবিষ্যতে আমি যে নারীকেই বিয়ে করি না কেন, তাকে তালাক দিলাম," তবে এটা হবে বাজে নিরর্থক ও অকার্যকর কথা। এরূপ কথা আইন ও বিধানের আওতামুক্ত। হযরত আলী, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে। "লা তালাকা ইল্লা মিন বাদে নিকাহিন– বিয়ের পর ছাড়া তালাক হয়না"– এই হাদিসটিও উক্ত মতের সমর্থন করে। ইমাম মালিকের (রহ.) মত হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট নারী, কিংবা নির্দিষ্ট খান্দান ও কবিলার নারী সম্পর্কে যদি কেউ এ ধরনের কথা বলে, তবে তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু সাধারণভাবে গোটা নারী সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি এ ধরনের কথা বলা হয়, তবে তালাক কার্যকর হবেনা। কেননা প্রথম অবস্থায় তো এ অবকাশ থাকে যে, সে ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট মহিলা কিংবা নির্দিষ্ট খান্দান ও কবিলার মহিলাদের বাইরের নারীদের বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থা তো সুন্নত বর্জনের শামিল এবং এটা হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ারই সমার্থক।

বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আহযাব–এর ৮৬ টীকা দ্রষ্টব্য। (তরজমানুল কুরআন : জানুয়ারি ১৯৫৬)

তাফহীমুল কুরআনেও মাওলানা মওদূদী এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। আমরা সে অংশটি এখানে সংযোজন করে দিলাম :

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী, আলী ইবনে হুসাইন (জয়নুল আবেদীন), ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আলোচ্য আয়াতাংশ "যখন তোমরা বিয়ে করো এবং পরে তালাক দাও" থেকে এই দলিল পেশ করে বলেছেন যে, বিয়ের পর তালাক দিলেই তা কার্যকর হতে পারে। বিয়ের পূর্বে তালাক দেয়া অর্থহীন। সুতরাং কেউ যদি বলে : 'আমি অমুক নারীকে কিংবা অমুক বংশের অমুক ঘরের কোনো মহিলাকে অথবা যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করলে সে তালাক হয়ে যাবে", তবে এরূপ কথা হবে অর্থহীন। এতে কারো উপর তালাক কার্যকর হবেনা। একথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদিস পেশ করা হয় : "মানুষ যার মালিক নয়, সে বিষয়ে তালাক দেয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করার কোনো অধিকার তার নেই।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : "বিবাহের পূর্বে কোনো তালাক নেই।" (ইবনে মাজাহ)

www.icsbook.info

কিন্তু ফিকাহবিদদের একটি বড় দলের মতে এ আয়াত ও হাদিস কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন কেউ তার স্ত্রী নয় এমন নারীকে বলে 'তোমাকে তালাক দিলাম' কিংবা 'তোমাকে তালাক'। এমতাবস্থায় এরূপ কথা অবশ্যি অর্থহীন হবে। এর আইনগত কোনো ফল নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তোমাকে তালাক" এ ধরনের কথা বিয়ের পূর্বে তালাক দেয়া নয়, বরঞ্চ সেই নারী যখন তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখন তার উপর তালাক কার্যকর হওয়ার কথাই এখানে ঘোষিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কাজেই এ ধরনের কথা অর্থহীন নয়। যেসব ফিকাহবিদ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে আবার একথা নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এ ধরনের তালাক দেয়ার ব্যাপকতা কতোখানি?

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম জুফার বলেন, কেউ যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো নারীর কথা বলে কিংবা সাধারণভাবে বলে যে, 'আমি যে নারীকেই বিবাহ করি না কেনো সেই তালাক', তবে এ উভয় অবস্থাতেই (বিবাহের পরপরই) তালাক হয়ে যাবে। আবু বকর জাস্‌সাস স্বীয় কিতাবে হযরত উমর (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), ইব্রাহীম নখয়ী, মুজাহিদ ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত এটাই বলে উল্লেখ করেছেন।

সুফিয়ান সওরী ও উসমান আলবাত্তী বলেন, কেবল এরূপ বললেই তালাক কার্যকর হবে : 'আমি যদি অমুক নারীকে বিবাহ করি, তবে সে তালাক।'

হাসান ইবনে সালেহ, লাইস ইবনে সাদ এবং শা'বী (রহ.) বলেন, এই ধরনের তালাক সাধারণত ব্যাপকভাবেও কার্যকর হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তাতে কোনো না কোনো ধরনের বিশেষত্ব থাকতে হবে। যেমন কেউ যদি বলে :"আমি যদি অমুক পরিবার, অমুক গোত্র, অমুক শহর, কিংবা জাতির কোনো নারীকে বিবাহ করি, তবে সে তালাক।"

ইবনে আবী লায়লা ও ইমাম মালিক উক্ত মতের সাথে বিরোধ করে অধিক শর্তারোপ করেছেন। তাঁদের মতে এরূপ কথায় মেয়াদ নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। যেমন, কেউ যদি বলে "আমি যদি এই বছর কিংবা আগামী দশ বছরের মধ্যে অমুক নারীকে কিংবা অমুক লোকদের মেয়ে বিয়ে করি, তবে তার উপর তালাক", তবে এ তালাক কার্যকর হবে, অন্যথায় নয়। ইমাম মালিক আরো বলেন এই মেয়াদ যদি এতোদূর লম্বা হয় যে, ততোদিন তার বেঁচে থাকারও আশা করা যায়না, তবে তার এরূপ কথা অর্থহীন।" তাফহীমুল কুরআন : সূরা আহযাব : টীকা : ৮৬-র শেষাংশ (অনুবাদক)

www.icsbook.info

অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য এবং মাথার একাংশের চুল কামানো ও অপরাংশের চুল রাখা

প্রশ্ন : আপনি 'রাসায়েল ও মাসায়েল' গ্রন্থে এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, আপনার মতে ইংরেজদের মতো চুল রাখা শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়। আপনি লিখেছিলেন যে, 'কাযা' অর্থাৎ মাথার একাংশের চুল কামিয়ে অপরাংশের চুল রাখা অথবা অমুসলিমদের মতো বেশভূষা ধারণ করাই শুধু নিষিদ্ধ। ইংরেজদের ধরনের চুল কাটা এর আওতায় পড়েনা। আপনার এই জবাব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিলো। এই জবাবে আপনি দলিল প্রমাণ বিশ্লেষণ করেননি। বিশেষত: 'কাযা'র যে সংজ্ঞা আপনি দিয়েছেন তার সমর্থনে কোনো সুনির্দিষ্ট হাদিস অথবা সাহাবা ও ইমামগণের কোনো উক্তি উদ্ধৃত করেননি। অনুরূপভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অমুসলিমদের পোশাক পরিচ্ছদ আংশিকভাবে গ্রহণ করার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও আপনি কোনো বরাত দেননি। তরজমানুল কুরআনে আপনি যদি সংশ্লিষ্ট দলিল প্রমাণ উল্লেখ করেন তাহলে ভালো হয় এবং বক্তব্য অধিকতর পরিষ্কার হয়।

আপনার বিশ্লেষণ অনুসারে ইংরেজ ধাঁচের চুল রাখা হারাম না হলেও তা আপনার রুচিতে পছন্দনীয় নয়। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেশভূষা দীনদার লোকদের কাছে পছন্দনীয় নয় কিন্তু একেবারে হারামের পর্যায়েও নয়, তার প্রচলন রোধ করার জন্য কোনো বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করা যায় কিনা?

উত্তর শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো জিনিসকে অবৈধ বলার জন্য দু'টো শর্তের একটি পূর্ণ হওয়া জরুরি। ঐ জিনিস সম্পর্কে হয় সরাসরি কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ কুরআন অথবা হাদিসে থাকা চাই, অথবা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত কোনো মূলনীতির আলোকে তা অবৈধ সাব্যস্ত হওয়া চাই। এই দু'টো শর্তের একটাও যদি পূর্ণ না হয় তাহলে এ ধরনের জিনিস কোনো ব্যক্তি বা সমাজের রুচিতে যতোই গর্হিত মনে হোক না কেন, তাকে অবৈধ বলা চলেনা। এই মূলনীতির অধীন আমরা যখন ইংরেজ ধাঁচের চুলের ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কি জানতে চেষ্টা করি, তখন দেখতে পাই যে, কোনো জিনিসের নিষিদ্ধ বা হারাম হওয়ার জন্য উপরোক্ত প্রয়োজনীয় দু'টো শর্তের একটিও এখানে পাওয়া যায়না। মাথার চুল সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে সুনির্দিষ্টভাবে যে জিনিসটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে তা হলো 'কাযা'। এই কাযা'র যে সংজ্ঞা হাদিস ও ফিকাহর বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন তা এই যে : ان يحلق بعض راس الصبى ويترك بعض.

www.icsbook.info

'শিশুর মাথার একাংশ কামানো এবং একাংশের চুল রাখা।' (মুসলিম : নাফে মাওলা ইবনে উমর)

اذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة وههنا وههنا اشار الى ناصيته وجانبى راسة ولكن القزع ان يترك بناصيته شعر وليس فى راسه غيره وكذالك شق راسة هذا وهذا

'যখন শিশুর মাথা এভাবে কামানো হয় যে, শুধু কপালে এবং মাথার উভয় পার্শ্বে চুল রাখা হয় (অতপর পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলে ব্যাখ্যা করলেন যে,) তবে 'কাযা' হলো কপালের চুল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মাথা সম্পূর্ণ কামানো এবং মাথার বিশেষ বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ মাথা কামানো।'

আবু দাউদের বর্ণনায় এই সংজ্ঞা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি থেকেই প্রতিপন্ন হয়। এতে ইবনে উমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুর মাথার একাংশ কামানো এবং অপরাংশের চুল রাখা হয়েছে দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন :

احلقوا كله او اتركوا كله 'হয় পুরোটা কামিয়ে দাও নচেত পুরোটা রেখে দাও।' এ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, শরিয়তে কেবল আংশিক কামানো এবং আংশিক রেখে দেওয়াই অবৈধ। ইংরেজি ধাঁচের চুল কাটা যে এর আওতায় পড়েনা, তা সুস্পষ্ট।

এবার দেখতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো মৌলিক বিধির আওতায় ইংরেজ ধাঁচের চুল কাটাকে অবৈধ বলা যায় কিনা। এ ধরনের মৌলিক বিধি কেবল একটাই আছে এবং তা হলো, বেশভূষায় অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ। এই মূলনীতিটাকে হয়তো এখানে প্রযোজ্য মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে তা হলো, বেশভূষার সাদৃশ্য বলতে কি বুঝায়? সার্বিক বেশভূষাতেই সাদৃশ্য হয়ে থাকে, না আংশিকভাবেও হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আমরা যখন হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দেই তখন জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংশিকভাবে অমুসলিম জাতিসমূহের কোনো বৈশিষ্ট্যকে নিজ সমাজ ও বেশভূষার অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয মনে করতেন। উদাহরণস্বরূপ, সালোয়ার (পাজামা) ইরানি পোশাক ছিলো। এটা আরবে গিয়ে সারাবীল নামে খ্যাত হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জিনিস ব্যবহার করাকেই শুধু বৈধ বলে স্বীকার করেননি, বরং নিজেও ব্যবহার করেছেন।

www.icsbook.info

বুখারি শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "من لم يجد ازار فليلبس سراويل" যে ব্যক্তি 'ইজার' সংগ্রহ করতে পারেনা, সে যেনো সালোয়ার পরে'। বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সালোয়ার কিনেছিলেন এবং তাঁর আমলে তাঁর অনুমতিক্রমে মুসলমানগণও তা পরতেন।[১] অনুরূপভাবে বুরনুস (টুপি) ব্যবহার করাকে তিনি শুধু বৈধ বলেই স্বীকার করেননি, বরং জনৈক সাহাবিকে তিনি তা উপহার হিসেবেও দিয়েছিলেন। প্রথম শতাব্দীর কারীগণও ব্যাপকভাবে এটা ব্যবহার করতেন। অথচ এটা ছিলো খৃস্টান ধর্মযাজকদের টুপি। এ কারণে প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের কেউ কেউ এর ব্যবহার মকরূহ মনে করতেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) এই ধারণা সুস্পষ্ট ভাষায় খণ্ড করেছেন।[২]

অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এমন জুব্বা পরিধান করতেন, যা অমুসলিম জাতিসমূহ থেকে আমদানি হতো। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সিরীয়, রোমক ও পারসিক জুব্বা পরিধান করতেন। অথচ সিরীয় জুব্বা ইহুদী পোশাকের অংশ ছিলো, রোমক জুব্বা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের পোশাক ছিলো এবং পারসিক জুব্বা ইরানি পোশাক ছিলো। এই সকল হাদিস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিম জাতিসমূহের বেশভূষা, পোশাক পরিচ্ছদ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো জিনিস নিয়ে নিজেদের আচার ও কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের আওতাভুক্ত নয়। (অবশ্য যে জিনিসটি গৃহীত হবে তা যেন সুনির্দিষ্টভাবে হারাম না হয়)। তবে কোনো মুসলমান যদি সামগ্রিকভাবে কোনো অমুসলিম জাতির বেশভূষা অবলম্বন করে এবং তার ফলে একজন অপরিচিত মুসলমান তাকে দেখে মুসলমান বলেই চিনতে না পারে– কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই 'সাদৃশ্য' প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যার সামগ্রিক বেশভূষা মুসলমানদের মতোই রয়েছে, কেবল মাথায় ইংরেজ ধাঁচের চুল আছে, তাকে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত করা যায়না।

নি:সন্দেহে এ চুল আমার নিজের রুচিতে অসহনীয় হয়ে উঠেছে এবং সেজন্য আমি তা ত্যাগও করেছি। কিন্তু একথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, হালাল ও হারামের সীমা এক জিনিস আর ইসলামী মানসিকতা গড়ে উঠলে তা

---

১. ফাতহুল বারী, পোশাক সংক্রান্ত অধ্যায়, সালোয়ার সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, 'যাদুল মায়াদে' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালোয়ার ও জুতার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

২. ফাতহুল বারী, পোশাক সংক্রান্ত অধ্যায়, বুরনুস সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

www.icsbook.info

থেকে যে অভিরুচির উদ্ভব হয়, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এই দু'টো জিনিসকে তালগোল পাকানো ঠিক নয়। আমরা একটা ইসলামী সমাজে যে জিনিসকে বিধিসম্মতভাবে আইনের আকারে চালু করতে পারি তা কেবল হালাল ও হারামের সুনির্দিষ্ট সীমা।

ইসলামী চেতনা ও মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর ফলে যে বিশেষ অভিরুচি গড়ে ওঠে, সেটা সকল মুমিনের সর্বসম্মত ব্যাপার নাও হতে পারে। আর যদি তা সর্বসম্মত ব্যাপার হয়ও, তথাপি তাকে 'শরিয়তে'র অঙ্গীভূত করার অধিকার আমাদের নেই। কুরআন ও সুন্নাহতে 'দ্ব্যর্থহীন' ভাষায় উল্লেখিত বিধিসমূহেরই নাম শরিয়ত। এর বাইরে ইজতিহাদ অথবা অভিরুচিজনিত যেসব বিষয় থাকবে তা সমাজে চালু করার জন্য যুক্তিতর্ক, শিক্ষা, অনুশীলন ইত্যাদির প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু তার নির্দেশ দেয়া যেতে পারেনা। (তরজমানুল কুরআন, জিলকদ ১৩৭৫ হি:, জুলাই ১৯৫৬)

খুলা'র ইদ্দত সম্পর্কে

প্রশ্ন : আপনার লিখিত 'তাফহীমুল কুরআন' এর প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারায় ১৭৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, খুলা'র (স্ত্রী কর্তৃক স্বেচ্ছায় স্বামীর নিকট থেকে তালাক গ্রহণ) ক্ষেত্রে এক হায়েজ পরিমাণ সময় ইদ্দত পালন করতে হবে। আসলে এটা ইদ্দতই নয়, বরং এটা কেবল জরায়ুকে বীর্যমুক্ত করার জন্যই নির্ধারিত হয়েছে।

জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি এই মতের সপক্ষে কোনো দলিল দেননি। অথচ এটা আয়াতের বক্তব্য, বিশেষজ্ঞদের উক্তি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তির বিরোধী। যেমন-

১. আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, খুলা' এক তালাকের সমান।

২. দারকুতনী এবং ইবনে আ'দী বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলা'কে এক তালাকের সমান গণ্য করেছেন।

৩. ইবনে উমর (রা.) এর বরাত দিয়ে মালেক বর্ণনা করেন যে, খুলা, গ্রহণকারিণী তালাকপ্রাপ্তার মতোই ইদ্দত পালন করবে।

একমাত্র আবু দাউদের একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, অর্থাৎ খুলার ইদ্দত এক হায়েজের সমান। কিন্তু এটা বর্ণনাকারীদের উক্তি বলে মনে করা হয়েছে। এটা কুরআনের উক্তিরও পরিপন্থী। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

"তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন হায়েজ পরিমাণ ইদ্দত পালন করবে।"

www.icsbook.info

অনুগ্রহপূর্বক প্রামাণ্য গ্রন্থাবলির বরাত ও যুক্তি প্রমাণ সহকারে সমস্যাটির সূক্ষ্ম বিচার এমনভাবে করবেন যাতে এ সংক্রান্ত সকল হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। কুরআন ও হাদিসের উক্তিসমূহের ব্যাপকতর মর্ম বহাল থাকে, হাদিস বিশারদগণের মন্তব্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয় এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণটি সন্তোষজনক হয়।

উত্তর 'খুলা' গ্রহণকারিণীর ইদ্দত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ফিকাহবিদগণের একটি বিরাট গোষ্ঠির মতে এই ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতের মতোই। অপর একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠির মতে তা এক হায়েজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। শেষোক্ত মতের সমর্থনে একাধিক হাদিস পাওয়া যায়। নাসায়ী ও তাবারানী রুবাই বিনতে মুয়াওয়াজের রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এই মর্মে যে, সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীর খুলা'র ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাহহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেনো এক হায়েজের সমান ইদ্দত পালন করে অতপর বাপের বাড়ি চলে যায়।

আবু দাউদ ও তিরমিযি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন যে, উক্ত সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাহহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, এক হায়েজ পরিমাণ ইদ্দত পালন করো।

তাছাড়া তিরমিযি, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা রুবাই বিনতে মুয়াওয়াজের অপর একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যার বক্তব্য অনুরূপ। একই মর্মে ইবনে আবি শায়বা ইবনে উমরের বরাত দিয়ে হযরত উসমানের একটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছেন। সেই সাথে তিনি একথাও লিখেছেন যে, ইতিপূর্বে ইবনে উমর খুলা'র ইদ্দত তিন হায়েজের সমান মনে করতেন। কিন্তু হযরত উসমানের এই সিদ্ধান্তের পর তিনি নিজের মত পাল্টান এবং এক হায়েজের ফতোয়া দিতে থাকেন। অনুরূপভাবে ইবনে আবি শায়বা ইবনে আব্বাসের এই মর্মে ফতোয়া উদ্ধৃত করেছেন যে, খুলা' গ্রহণকারিণীর ইদ্দত এক হায়েজ। ইবনে মাজা রুবাই বিনতে মুয়াওয়াজের বরাত দিয়ে হযরত উসমানের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে হযরত উসমানের এ উক্তিও রয়েছে যে, "আমি এ ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালাই অনুসরণ করি।"

আশা করি এই সকল উদ্ধৃতি দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন। (তরজমানুল কুরআন, মুহাররম-সফর ১৩৬৭ হি: অক্টোবর ১৯৫৬)

ইংরেজি ভাষায় নামায পাঠ

প্রশ্ন : আমি একজন ইংরেজ মুসলমান। আমার বয়স ২১ বছর। এক বছর আগে আমি সোমালিল্যান্ডে সেনাবাহিনীতে অফিসার থাকাকালে ইসলাম গ্রহণ করি।

www.icsbook.info

ইসলামের সরকারি ভাষার সাথে আমার প্রশ্ন জড়িত। ইতিপূর্বে খৃষ্টান থাকাকালে আমি নিজের মাতৃভাষায় (ইংরেজি) বাইবেল পাঠ করতাম। এখন ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে নামায ও কুরআন উভয়ই আরবি ভাষায় পড়তে হয়। এ পরিবর্তনের ফলে আমার মনে অনুভূতি জেগেছে যে আরবির আনুগত্যের কারণে - তার মধ্যে যতোই মাধুর্য থাকনা কেনো আমাকে বিরাট আধ্যাত্মিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমি কি ইংরেজি ভাষায় নামায পড়তে পারি? এ ব্যাপারে আমাকে সত্যিকার পথনির্দেশ দিলে আমি অবশ্যি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো। এ ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব লাভ করার জন্যে পুরাতন ইমামগণের মধ্য থেকে যারা এ ব্যাপারে কোনো মতামত প্রকাশ করেছেন তাদের নাম জানাবেন।

এটি নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার নিজের মনের একটি সংশয় হলেও আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, এ বিষয়টি বিশেষ করে ইউরোপে অনেক অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লন্ডনের কতিপয় বন্ধু এ ব্যাপারে আপনার সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। আশা করি আপনার পথনির্দেশ আমার জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান হবে।

উত্তর : আপনার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এক ভাইয়ের দিল হেদায়াতের আলোকে উজ্জ্বল করেছেন, এজন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং দোয়া করছি যেনো আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আরো অধিক হেদায়াত ও দৃঢ়তা দান করেন। দীনের নির্দেশ ও বিষয়াবলী হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে আমি আপনাকে যতোদূর সাহায্য করতে পারি সানন্দে করবো এবং এজন্যে আপনি যে কোনো সময় আমার খেদমতের ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

নামাযের ভাষা সম্পর্কে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাব হচ্ছে এই যে, নামায একমাত্র আরবি ভাষায়ই আদায় করা যেতে পারে। কারণ নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত, আর কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, কুরআনের তরজমা যতোই নির্ভুল হোক না কেনো তা কুরআন হতে পারেনা এবং তাকে খোদার কালাম বলা যায়না। কুরআন ছাড়া নামাযে আর যা কিছু পাঠ করা হয় সবগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত। যে শব্দগুলোর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছিলেন সেগুলোই তাতে পড়া হয়। অন্য যে কোনো ভাষায় শব্দ সেগুলোর যথার্থ অর্থ প্রকাশ করেনা আর কতকাংশে প্রকাশ করলেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.icsbook.info

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথিত শব্দাবলির স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনা। এ কারণেই প্রথম থেকে এ পর্যন্তকার সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, যে নামায আরবি ভাষায় পড়তে হবে। কুরআনের আসল শব্দাবলির স্থলে সেগুলোর তরজমা পড়া যেতে পারেনা এবং রসূলুল্লাহ কথিত শব্দাবলির অন্য শব্দের দ্বারা বদলানোও যেতে পারেনা।

তবে কোনো নতুন ইসলাম গ্রহণকারী অনারব মুসলমান যদি ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আরবি ভাষায় কুরআন ও নামাযের অন্যান্য আয়াত এবং দোয়াসমূহ পড়তে সক্ষম না হয় তাহলে সে কি করবে, এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে- ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদের (রহ.) [ইমাম আবু হানিফার (রহ.) দুই মহান শাগরিদ] মতে এহেন ব্যক্তি নিজের ভাষায় অনুবাদ করে ওগুলো পড়তে পারে। কিন্তু তাকে অতি শীঘ্রই আরবি ভাষায় কুরআন ও নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথমে এ মত পোষণ করতেন যে, আরবি শব্দ উচ্চারণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যেও অনারব ভাষায় নামায পড়া জায়েয, কিন্তু পরে তিনি নিজের এ মত প্রত্যাহার করেন এবং নিজের দুই মহান শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মত অবলম্বন করেন। ইমাম শাফেয়ির (রহ.) মত হচ্ছে এই যে, নামায কোনো অবস্থায় আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় পড়া যাবেনা। যে ব্যক্তি আরবি শব্দাবলি উচ্চারণ করতে অক্ষম তাকে নামাযে কমপক্ষে 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' এর ন্যায় সংক্ষিপ্ত শব্দ পড়তে হবে এবং শীঘ্রই আরবি ভাষায় নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। (এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে হলে হেদায়া গ্রন্থের মশহুর ব্যাখ্যা-পুস্তক 'ফাতহুল কাদীর' প্রথম খণ্ড, ১৯৯-২০১ পৃষ্ঠা, ইমাম সারাখসী লিখিত আলমাবসুত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা এবং বায়দবীর কাশফুল আসরার গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠা দেখুন।)

এমন একটি ভাষায় নামায পড়া যে ভাষাটি মানুষ বুঝেনা এবং যার শব্দাবলিই কেবল মুখে উচ্চারণ করা হয়, আপত: দৃষ্টিতে কেমন অদ্ভুত মনে হয় এবং বাহ্যত মানুষ একে অস্বাভাবিক মনে করে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর সুদূরপ্রসারী কারণসমূহ আপনার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কোনো ধর্মের নিজের আসল রূপ ও প্রাণশক্তি সহকারে টিকে থাকা বেশির ভাগ নির্ভর করে তার শিক্ষাবলি নিজের মূল শব্দাবলির মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকার উপর। একটি ভাষার তরজমা অন্য ভাষায় কখনো মূলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনা। মূলের সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত এবং তার পূর্ণাঙ্গ অর্থব্যঞ্জনা ভাষান্তরিত হতে

www.icsbook.info

পারেনা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বোধ অনুযায়ী তরজমা করবে এবং দু'জন তরজমাকারীর তরজমা কখনো এক হতে পারবেনা। মানুষের রচনাবলি তরজমা ব্যাপারে আমরা প্রতিদিন এ বিষয়ের সম্মুখীন হই। তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহর কালাম ও পয়গম্বরের বাণীকে তার সমগ্র প্রাণশক্তিও অর্থব্যঞ্জনা সহকারে ভাষান্তরিত করা কেমন করে সম্ভব? এবং কেমন করে একথা বলা যেতে পারে যে, এ তরজমা মূলের স্থলাভিষিক্ত?

দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মের বিকৃতির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের মৌলিক কিতাবগুলো মূল ভাষায় সংরক্ষিত নেই এবং তাদের অনুসারীরা বিভিন্ন ভাষার তরজমার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। অথচ এ তরজমাগুলোর মধ্যে কোনো পারস্পরিক সামঞ্জস্য নেই এবং প্রায়শই এগুলোর মধ্যে নানাপ্রকার রদবদল হয়ে থাকে। মুসলমানদের সৌভাগ্য, পয়গম্বরের যে হেদায়াত এবং যে কিতাবের উপর জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সেগুলো তাদের মূল ভাষায় বর্তমান আছে এবং ঐ পয়গম্বরের শিক্ষাবলিও তার আসল ভাষায় সংরক্ষিত আছে। এখন আমরা যদি ঐ নেয়ামতের কদর না করি এবং নিজেদের দীনের ভিত্তি তরজমার উপর স্থাপন করার দুয়ার উন্মুক্ত করি, তাহলে এটি হবে আমাদের একটি বিরাট নাদানির পরিচায়ক। আমরা প্রতিদিন পাঁচবার যে নামায পড়ি কুরআন ও পয়গম্বরের শিক্ষার সাথে আমাদেরকে সংযুক্ত রাখার জন্য সেটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। তার ভাষা পরিবর্তনের পর দীনের মূল উৎসের সাথে আমাদের সম্পর্ক কায়েম রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

কোনো ধর্মকে সংরক্ষিত রাখার জন্যে তার ইবাদতসমূহকে আসলরূপে কায়েম রাখা এবং লোকেরা যাতে নিজেদের ইচ্ছামতো তার মধ্যে রদবদল করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। ধর্মের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার ইবাদতসমূহ। এই ইবাদতসমূহ যথাযথরূপে সম্পাদন ও এগুলোর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের ফলে দীনের অবশিষ্ট শিক্ষাবলি প্রবর্তিত হয়। ধর্মের অনুসারীগণের জন্যে ঐ ইবাদতসমূহের যে বস্তুটি পবিত্র, মর্যাদাপূর্ণ ও অবশ্য পালনীয় করে সেটি হচ্ছে এই বিশ্বাস, যে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালীর উপর তারা ঈমান এনেছে ধর্মের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি শব্দ তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ বিশ্বাস তখন শেষ হয়ে যাবে যখন ইবাদতের রূপ ও তার শব্দাবলি নির্ধারণের প্রশ্নে লোকেরা নিজেদের মতামত ও ইচ্ছার অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকবে। আর এর ভিত্তিটি ধ্বসে পড়ার সাথে সাথেই সমগ্র দীন বিকৃত হবার এবং তার বিধানসমূহের আনুগত্য থেকে লোকদের স্বাধীন হবার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

www.icsbook.info

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে এই যে, সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের, প্রত্যেকটি জাতির ও সকল ভাষাভাষির আযান ও নামাযের ভাষা এক হওয়া এমন বিরাট সংযোগ শক্তি যা সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে এক মিল্লাত ও এক বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত করে। পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই আপনি চলে যান না কেন, আযানের আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই আপনি অনুভব করবেন, এখানে আপনার মিল্লাতের কোনো ব্যক্তি বা দল আছে এবং সে নামাযের জন্যে আহ্বান করছে। নামাযের জন্যে আপনি লন্ডন, নাইজেরিয়া বা ইন্দোনেশিয়া যেখানেই যান না কেন, এই একই পরিচিত আওয়াজ সর্বত্রই শুনতে পাবেন। নিজের মুসলমান সাথিদের ভাষার একটি শব্দও হয়তো আপনি না বুঝতে পারেন, কিন্তু নামাযে সে আপনার জন্যে অপরিচিত হবেনা এবং আপনিও তার নিকট অপরিচিত হবেননা। বিপরীতপক্ষে যদি প্রত্যেকে নিজের মাতৃভাষায় নামায পড়তে থাকে এবং সর্বত্রই স্থানীয় ভাষায় আযান দেয়া শুরু হয় তাহলে এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে। পাক-ভারত উপমহাদেশে তিন শতের অধিক ভাষা প্রচলিত। কেবল এই একটি মাত্র দেশে যতোগুলো ভাষা প্রচলিত মুসলিম মিল্লাত ঠিক ততোগুলো অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং একজন মুসলমান তার নিজের এলাকার বাইরে বের হয়ে আযান বুঝতে পারবেনা। দুনিয়ার অন্যান্য এলাকায়ও এই একই অবস্থা দেখা দেবে। আর হজ্জের সময় সম্ভবত ব্যাবিলনের মিনারের ন্যায় অবস্থা সৃষ্টি হবে। খৃষ্টজগত যে nationalisatoin of the church-এর মাধ্যমে অসংখ্য বিবদমান জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে, এটিও আসলে মুসলিম সমাজে তারই সূচনারূপে বিবেচিত হবে। আপনি কি এ নেয়ামতটি অনুভব করেননা যে, জাতি পূজা, বংশ পূজা, বর্ণ পূজা, ভাষা পূজার ফলে বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডিত মানবতার জন্যে ইসলাম বিশ্বজনীন ঐক্যের কতো বড় একটি মাধ্যম সৃষ্টি করেছে। যা আরবি আযান, আরবি নামায, আরবি কালেমা ও আরবি ভাষায় কতিপয় পরিচিত ও সর্বত্র প্রচলিত ধর্মীয় পরিভাষারূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছেঃ এই রাষ্ট্রভাষার' বদৌলতেই মুসলমান সবখানে মুসলমানকে চিনতে পারে এবং তারা পরস্পর এমনভাবে মিশে যায় যেনো সৃষ্টির প্রথমলগ্ন থেকেই তাদের আত্মার মধ্যে পারস্পরিক নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

নামায বুঝে পড়ার প্রয়োজনটি অস্বীকার করা যায়না। কিন্তু উপরে আমি যে বৃহত্তর ক্ষতির উল্লেখ করেছি তার সম্মুখীন না হয়েও এ প্রয়োজন পূর্ণ করা যেতে পারে। নামাযের জন্যে কুরআনের মাত্র কতিপয় সূরাই যথেষ্ট। আর কুরআন ছাড়া অন্য সে সমস্ত দোয়া নামাযে পাঠ করা হয় সেগুলো নিছক কতিপয় বাক্যের সমষ্টি।

www.icsbook.info

সেগুলো কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে সহজেই সেগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। এভাবে 'আধ্যাত্মিক সম্পদ' বলে আপনি যাকে আখ্যায়িত করছেন তার প্রয়োজনও সহজে পূর্ণ হতে পারে। (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫৭)

ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা এবং নফল

প্রশ্ন একজন মাওলানা লিখেছেন "কাযা নামাযসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব আদায় করা কর্তব্য ..... যতোক্ষণ কারো জিম্মায় ফরয অনাদায়ী থাকে, ততোক্ষণ তার কোনো নফল কবুল করা হয়না।"

বিবেকের রায় অনুযায়ী এ মূলনীতি যে গুরুত্ববহ তা বুঝার জন্যে কোনো দলিল প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু শরিয়ত আমাদের বিবেক বুদ্ধিসম্মত কোনো মূলনীতি স্বীকার করে নিয়ে তার উপর তার বিষয়াবলির ভিত্তি স্থাপন করবে, এমনটি জরুরি নয়। অথচ আমাদের এদিককার মুসলমানদের সম্ভবত অধিকাংশের অবস্থাই হচ্ছে যে প্রত্যেকের জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় জাহিলিয়াতের উপর অতিবাহিত হয়েছে। এসময় না নামাযের খেয়াল ছিলো আর না রোযার পরোয়া ছিলো। একারণে কাযা নামাযের জিম্মা থেকে মুক্ত লোকের সংখ্যা খুবই কম।

এখন এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয় :

কোনো ছুটে যাওয়া ফরয নামায জিম্মায় থাকা অবস্থায় নফল (সুন্নত ও যার অন্তর্ভুক্ত) কবুল হবেনা একথা কি সঠিক?

যে ব্যক্তির জিম্মায় ছুটে যাওয়া ফরয নামাযের কাযা বাকি রয়েছে, সে যদি দৈনন্দিনকার ফরয নামায আদায়ের সময় সুন্নত ও নফল পড়ে, তবে তার এই সুন্নত নফলের পরিণতি কি হবে? সেগুলো কি বিনষ্ট হয়ে যাবে? নাকি পূর্বের ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা বলে গণ্য হবে?

এতো সাধারণ এবং সার্বজনীন নিয়ম। নামাযের সাথে এর বিশেষ সম্পর্কের কারণ নেই। তবে কি রোযা এবং শরিয়তের অন্যান্য ফরযসমূহের ব্যাপারেও এ নিয়ম প্রযোজ্য?

বিশেষ করে যাকাতের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে আলোকপাত করুন। অধিকাংশ লোকই যাকাত পরিশোধ করেনা। কিন্তু নফল দান সদকা দিয়ে থাকে। যেমন, কখনো কিছু রান্না করে ফকিরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। কোনো নেক কাজে চান্দা দিয়ে থাকে। ভিক্ষুকদের পয়সা দিয়ে থাকে।

এমনিভাবে ভূস্বামী এবং চাষীরা উশর পরিশোধ করেনা। কিন্তু ফসল গোলায় উঠানোর সময় উপস্থিত ভিক্ষুকদের চাউল, আটা মিঠাই দিয়ে থাকে। এরূপ

www.icsbook.info

দানের সময় উশর বা যাকাত দেয়ার কোনো নিয়ত তাদের থাকেনা। আর উশর এবং যাকাতের কোনো হিসাবও তারা রাখেনা।

এরূপ দানের শরয়ী গুরুত্ব কি? এগুলো সবই কি বিনষ্ট হয়ে যাবে? নাকি আল্লাহ্র নিকট উশর এবং যাকাত বলে গণ্য হবে?

এই মূলনীতির (অর্থাৎ কারো জিম্মায় অনাদায়ী ফরয থাকলে তার নফল কবুল করা হয়না, একথার) পক্ষে প্রমাণস্বরূপ "ইলাইহি ইয়াসয়াদুল কালিমুত তাইয়্যিবু ওয়াল আমালুস্ সালিহু ইয়ারফাউহু"[১] আল্লাহ্র এই যে বাণীটি ব্যবহার করা হয় তা কতোটা সঠিক? কোনো হাদিসে 'আমলে সালেহ্'র অর্থ ফরযসমূহ এবং 'কালিমুত তাইয়্যিবু'র অর্থ নফল যিক্র আযকার বলে বর্ণিত হয়েছে কি?

উত্তর : একটা বিশুদ্ধ বিষয়কে কিছুটা ভুল পন্থায় বর্ণনা করার ফলে আপনার মনে এসব প্রশ্ন উদয় হয়েছে। কারো কোনো আমলেকে কবুল করা বা না করা মানুষের ইখতিয়ারে নয়। তা কেবল বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার ইখতিয়ারেই রয়েছে। কারো জিম্মায় যদি ফরযের কাযা বাকি থাকে আর তিনি যদি ফরযের কাযা আদায় করার সাথে সাথে আন্তরিকতার সাথে সুন্নত ও নফল পড়েন, তবে আল্লাহ তায়ালা তার এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে গ্রহণ না করার কোনো কারণ নেই। তবে কেউ যদি অনাদায়ী ফরযসমূহের প্রতি উদাসীন থাকে, তাহলে তার এরূপ আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবার আশা করা যায়না। কারণ ফরযের কাযার উদাহরণ ফরযের মতো। ফরয পরিশোধে উদাসীনতা প্রদর্শন করে যতোই দান খয়রাত করা হোক না কেন, তার কোনো অর্থ নেই।

অবশ্য যারা জীবনের এক বিরাট অধ্যায় জাহিলিয়াতের মধ্যে অতিবাহিত করেছে এবং সে সময় অসংখ্য নামায ছেড়ে দিয়েছে, তাদের জন্যে পেছনের কাযাও আদায় করা এবং সেই সাথে সুন্নত নফল পড়া কঠিন ব্যাপার। এমনটি করলে তাকে আলস্য পেয়ে বসতে পারে এবং ফরযের কাযা আদায় বাকি থাকার আশংকা থেকে যেতে পারে। পক্ষান্তরে তার জন্য সহজ পন্থা হলো, প্রত্যেক ফরয নামাযের সাথে সাধারণতঃ যতোগুলো সুন্নত নফল পড়া হয়ে থাকে, সেগুলো সে সুন্নত নফলের পরিবর্তে অনাদায়ী ফরযের কাযা আদায়ের নিয়তে পড়বে এবং সে ততোদিন পর্যন্ত এমনটি করতে থাকবে যতোদিনে তার মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মে যে, এখন তার পেছনের সমস্ত কাযা নামায আদায় হয়ে গেছে। এভাবেই সহজ পন্থায় কোনো ব্যক্তি তার ঘাড়ে চেপে থাকা ফরয থেকে মুক্ত হতে পারে।

---

১. "কালিমুত তাইয়্যিব তাঁর নিকট পৌছে থাকে। আমলে সালেহ তা পৌছে দিয়ে থাকে" এ হচ্ছে বাক্যটির অর্থ।

www.icsbook.info

পড়া নামাযসমূহ বিনষ্ট হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এখন যেহেতু মাসআলা জানতে পেরেছেন, তাই সামনের সমস্ত সুন্নত ও নফল পেছনের অনাদায়ী ফরযসমূহের কাযার নিয়তে পড়তে আরম্ভ করুন।

কাযা রোযার বিষয়টি ছুটে যাওয়া নামাযেরই মতো। যার ফরয রোযা ছুটে গিয়েছিল, সে নফল রোযা রাখার পরিবর্তে পেছনের ফরয রোযা আদায়ের নিয়ত করবে।

যাকাতের ব্যাপারটা একই রকম। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, একজন লোকের ঘাড়ে ফরয যাকাত আদায় করার দায়িত্ব চেপে আছে। এখন সে যদি তা পরিশোধ না করে এমনিতেই দান খয়রাত করে, তবে তার একাজটি কেমন করে ঠিক হতে পারে? সে কেনো এ দান খয়রাতটা যাকাতের হিসাব করে যাকাতের নিয়তে পরিশোধ করেনা। কোনো আমল বিনষ্ট কিংবা কবুল করার ইখতিয়ার তো আল্লাহর। কিন্তু আমার আপনার বিবেক তো একথা বলে, ফরযের ব্যাপারে উদাসীন থেকে নফল আদায় করাটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনি কি মনে করেন, এ সামান্য ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালা বুঝেননা? তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি যা ফরয করেছিলাম, তা আদায় না করে তুমি তো নিজের খেয়াল খুশিমতো দান খয়রাত করে এসেছো তখন কারো এর কোনো জবাব থাকবে কি?

আপনি যে আয়াতটির কথা উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আমার জানা মতে এমন কোনো সহীহ হাদিস নেই, যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল কালিমাতুত তায়্যিব মানে নফল যিক্‌র আযকার এবং আমলে সালেহর অর্থ ফরয বিধান বলে গেছেন। যিনি এ দলিল পেশ করেছেন, আপনি তাকেই জিজ্ঞেস করুন, হয়তো তার এরূপ কোনো হাদিস জানা থাকতে পারে। হাঁ, তবে ইবনে আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যা এরকম আছে যে, আল কালিমাতুত তায়্যিব মানে- আল্লাহর যিক্‌র আর আমলে সালেহ মানে ফরযসমূহ। আর এটাও কেবল তাঁর ব্যক্তিগত মত যে, যে ব্যক্তি ফরযসমূহ আদায় করবে, তাঁর আমল আল্লাহর যিকরকে উপরে উঠিয়ে নেবে। কিন্তু যে কেবল যিকর করবে এবং ফরয আদায় করবেনা, তার যিকর গ্রহণ করা হবেনা। (তরজমানুল কুরআন : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯)

ফরযের কাযা, মিসকীন খাওয়ানো এবং স্ত্রীর জীবন

প্রশ্ন গত সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে আপনি 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন : "সাধারণত ফরয নামাযের পরে যেসব সুন্নত পড়া হয়, সেগুলো ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযার নিয়তে পড়াটাই সেগুলোর কাযা (পূর্ণ) করার সহজ পথ। এভাবে কোনো ব্যক্তি সে ফরয থেকে মুক্ত হতে পারে।"

www.icsbook.info

প্রশ্ন হচ্ছে, যারা স্বীয় জীবনের একটা অংশ জাহিলিয়াতের মধ্যে অতিবাহিত করেছে, সত্যিই কি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সে জীবনের ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা অবশ্যি দিতে হবে? উল্লেখ্য আমি সেসব শরয়ী ফরযসমূহের কাযা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিনা, যা কোনো শরয়ী ওযরের প্রেক্ষিতে ছুটে যায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সেসব ফরয সম্পর্কে, যেগুলোর ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি জেনে বুঝে অকারণে জীবনের একটা অধ্যায় (পাঁচ, দশ, বিশ, কিংবা ত্রিশ বছর) উদাসীন থেকেছে। সে যদি এখন পূর্ণ জীবনের কৃতকর্মের জন্যে তওবা করে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে ভবিষ্যৎ জীবনে শরিয়ত অনুযায়ী জীবন যাপনের শপথ করে এবং পুরোপুরিভাবে শরিয়ত নির্ধারিত ফরযসমূহ আদায় করে, তবু কি তার জন্য পূর্বের ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা আবশ্যিক? তওবা দ্বারা তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবেনা? যদি তা না হয়, তবে তওবার কার্যকারিতা কোথায়? কুরআন মজীদ তো স্পষ্ট বলছে :

"পরন্তু তাদের পরে সেসব অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা ঈমানকে বিনষ্ট করলো আর নফসের লালসা বাসনার অনুগমন করলো। অতএব অচিরেই তারা গোমরাহির পরিণতির সম্মুখীন হবে। অবশ্য যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের অধিকার বিন্দুমাত্র নষ্ট হবেনা।" (সূরা মরিয়াম : ৫৯-৬০)। শুধু এ আয়াতটিই নয়, কুরআন মজীদের অন্যান্য বহু আয়াত এবং বহু হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"আত-তায়িবু মিনায যান্‌বি কামান লা যানবা লাহু। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তওবা করে সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোনো গুনাহ নেই।"

এখন বলুন এসব আয়াত এবং হাদিসের আলোকে বক্তব্যের ব্যাখ্যা কি?

ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা করার যে তরীকা আপনি প্রস্তাব করেছেন, সেটার উপর আমল করতে গেলেও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হবে। সুন্নত তো এ উদ্দেশ্যে পড়া হয় যে, ফরয আদায় করতে গেলে যেসব ক্রটি বিচ্যুতি হয়ে যায় সুন্নত ও নফল তা পূর্ণ করে দেবে। এখন অতীত জীবনের ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা করতে গিয়ে যদি সুন্নত নফল পড়ার সুযোগ নাই হলো, তাহলে তার সকল ফরয নামাযই ক্রটিপূর্ণ থেকে যাবে। রোযা এবং যাকাত সম্পর্কে একই কথা। উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর জীবনের বিশ-পঁচিশ বছর জাহিলিয়াতের মধ্যে অতিবাহিত করেছে, সে যদি আপনার প্রস্তাবিত পন্থায় ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা দিতে চায়ও তবু তা না পূর্ণ মাত্রায় আদায় হতে পারে আর না এতে তার মন সান্ত্বনা

www.icsbook.info

লাভ করতে পারে। সর্বোপরি তার জীবনের আর কতোদিন বাকি আছে তাও তো তার জানা নেই।

আমার ধারণা, প্রায় মুসলমানই এ ব্যাপারটির সাথে সম্পর্কিত। কারণ বর্তমান সমাজ পরিবেশে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বড় বড় দীনদার ঘরের সন্তানরা বেআমলিতে নিমজ্জিত। এখন কেউ যদি স্বীয় জীবনকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আপনার এই প্রস্তাব দ্বারা তার অন্তরে জটিলতা ও হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। মেহেরবানী করে এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট বক্তব্য রেখে সন্তুষ্ট করবেন।

এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আমার স্ত্রী' ৫০ সালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। দীনদার ঘরের মেয়ে হিসেবে ছোটবেলা থেকেই তিনি নামায রোযার পাবন্দ। প্রায় সাত বছর এ রোগে ভোগার পর এখন দুই তিন বছর থেকে তিনি নিজেকে রোযা রাখতে সক্ষম বলে মনে করেন। তাকে এখন একাজে বাধা দিলে আল্লাহর নিকট তিরষ্কৃত হবার আশংকা করছি। আর বাধা না দিলে তার পুনরায় এ চরম কষ্টদায়ক রোগে নিমজ্জিত হওয়া অনিবার্য। উল্লেখ্য, তার এই রোগে নিমজ্জিত হবার কারণসমূহের মধ্যে এটাও ছিলো যে, আমার বাধা সত্ত্বেও ক্ষরতপ্ত রোদের দিনে গর্ভ ও বাচ্চাকে দুধপান করানো অবস্থায় তিনি রমযান মাসের রোযা রাখতেন। এরই ফলে চরম দুর্বল হয়ে পড়েন এবং এই রোগে আক্রান্ত হন। এখন তার বক্তব্য হলো, সারা জীবন এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকলে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেবো আর এই কাযার বোঝা থেকেই বা কিভাবে মুক্ত হতে পারবো? ফিদিয়া হিসেবে মিসকীনকে খানা খাওয়ানো দ্বারা কি সারা জীবনের ছুটে যাওয়া রোযা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে? কেউ যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রতিদিন মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়াতে অক্ষম হয়, সেজন্যে কি তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে? মেহেরবানী করে বিস্তৃত আলোকপাত করবেন।

উত্তর : প্রথম প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, আমি নিজেও পূর্বে এ ধারণা পোষণ করতাম যে, জীবনের জাহিলী অধ্যায় ইচ্ছাকৃত কিংবা গাফলতির কারণে যেসব নামায ছুটে যায়, সেগুলোর জন্যে তওবা যথেষ্ট। কাযা করা জরুরি নয়। কিন্তু গবেষণা ও অনুসন্ধান করার পর বুঝতে পারলাম, ব্যক্তি যদি কাফির না হয় তবে জিহালত এবং গাফলতের কারণে নামায ছুটে গেলে সেজন্যে তওবা যথেষ্ট নয়। ছুটে যাওয়া নামাযসমূহের কাযাও করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, তওবার সাথে সাথে অতীতের ছুটে যাওয়া

www.icsbook.info

হুকুমসমূহের ক্ষতিপূরণ ও ভবিষ্যতের সংশোধন এ উভয়ই জরুরি। গুনাহ্ যদি এমন হয়, যার ক্ষতিপূরণের কোনো সুযোগই না থাকে, তবে সেটা ভিন্ন কথা। এমতাবস্থায় তওবা, অনুতাপ অনুশোচনা ও লজ্জিত হওয়া যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যেসব গুনাহ্র ক্ষতিপূরণ সম্ভব, সেগুলোর জন্যে তওবার সাথে ক্ষতিপূরণ ছাড়া চলতে পারেনা। যেমন ধরুন ,আপনি কারো নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘকাল পরও তা পরিশোধ করেননি, এমতাবস্থায় এ গুনাহ্ কেবল তওবা দ্বারা মাফ হতে পারেনা। তওবার সাথে সাথে ঋণ পরিশোধ করাও অপরিহার্য।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, সুন্নত ফরযের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে, সেগুলোকে ছুটে যাওয়া ফরযের কাযা হিসেবে পড়লে তো আর সে ক্ষতিপূরণের কাজ হতে পারবেনা।

এর জবাব হলো, ছুটে যাওয়া ফরযের কাযার সওয়াবই এ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে দেবে ইনশাল্লাহ। অতীত গুনাহর জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাটাই একটা অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ।

জীবন কতোটা বাকি থাকলো, সে খবর তো আর মানুষের জানা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যখন ছুটে যাওয়া বিধানের ক্ষতিপূরণ আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ্ পাক সেটার কদর করেন। সকল ছুটে যাওয়া বিধানের ক্ষতিপূরণের পূর্বেই যদি তার মৃত্যু এসে যায়, সেক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, মহান আল্লাহ তার এ প্রচেষ্টাকে এমনভাবে কবুল করবেন যে, ছুটে যাওয়া সকল শরয়ী বিধানের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাব এই যে, চিকিৎসক যদি এখন তার রোযা রাখাকে ক্ষতিকর বলে মত দিয়ে থাকে, তবে তিনি রোযা রাখবেননা। গোটা রমযান মাস একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবেন। তার জীবন যদি আপনার প্রিয় হয়ে থাকে, তবে এ ত্যাগ আপনার করা উচিত যে, তার জন্যে আপনি একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবেন। একাজ যদি না করেন, তবে আপনি গুনাহ্গার না হলেও সহধর্মিণীর জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, মার্চ : ১৯৫৯)

জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন : আজকাল জন্মনিয়ন্ত্রণকে পরিবার পরিকল্পনা শীর্ষক নতুন নাম দিয়ে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর সপক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াও কারো কারো পক্ষ থেকে ধর্মীয় যুক্তিও দেয়া হচ্ছে। যেমন বলা হচ্ছে যে, হাদিসে 'আযল' (বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া) এর অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকে তার

www.icsbook.info

উপর কেয়াস করা যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে পুরুষদেরকে বন্ধ্যাকরণের সুযোগ সুবিধাও সরবরাহ করা হচ্ছে। এমন এক ধরনের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে যা দ্বারা পুরুষদের বীর্য সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা হারায় কিন্তু যৌন আনন্দ বহাল থাকে। কারো কারো মতে এই পদ্ধতি শরিয়ত দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয় এবং তা সন্তান হত্যা বা গর্ভপাতের পর্যায়েও পড়েনা।

অনুগ্রহপূর্বক এ সম্পর্কে জানাবেন যে, আপনার মতে ইসলাম এই প্রক্রিয়া অনুমোদন করে কিনা।

উত্তর জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কয়েক বছর আগে 'ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ' নামক একখানা বই লিখেছি ঐ বইতে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়ের সকল দিক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি ঐ বই এর নতুন সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, আযল সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং তার জবাবে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী প্রচার ও আন্দোলন তার লক্ষ্য ছিলোনা। এর দ্বারা এ ধরনের কোনো আন্দোলনের বিশেষ কোনো দর্শন ও জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছিলনা। তখন সকল পুরুষ ও নারীকে এমন পদ্ধতিও শেখানো হচ্ছিলনা যদ্বারা তারা যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও গর্ভধারণ রোধ করতে পারে। সে সময়ে গর্ভরোধক ওষুধ সরঞ্জামাদি নির্বিচারে সকল নারী পুরুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থাও ছিলোনা। আযলের অনুমতি সংক্রান্ত যে বারটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার তাৎপর্য শুধু এতোটুকুই যে, কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা ও অসুবিধার কথা জানালো, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিশেষ অবস্থার আলোকে একটি উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিলেন। এ ধরনের যেসব জবাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে যদি আযলের অনুমতি প্রমাণিতও হয়, তবু তাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলিত সর্বব্যাপী আন্দোলনের পক্ষে ব্যবহার করা চলেনা। কেননা আজকাল যে আন্দোলন চলছে তার পেছনে সক্রিয় রয়েছে যথারীতি একটা নির্ভেজাল বস্তুবাদী ও স্বেচ্ছাচারবাদী দর্শন। এ ধরনের কোনো আন্দোলন যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় চালু হতো তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি তার প্রতি অভিসম্পাত দিতেন এবং শিরক ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তিনি যেমন জিহাদ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধেও তেমনি জিহাদ করতেন।

www.icsbook.info

যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযল সংক্রান্ত উক্তিসমূহের অপব্যবহার করে তাকে বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে, তাদের প্রত্যেককে আমি বলি আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে এমন ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকুন। পাশ্চাত্যের খোদাহীন কৃষ্টি ও চিন্তাধারা যদি কারো অনুসরণ করতেই হয় তাহলে তাকে সোজাসুজি পাশ্চাত্যের জীবন পদ্ধতি মনে করেই গ্রহণ করা উচিত তা না করে তাকে আল্লাহর ও রসূলের প্রকৃত শিক্ষারূপে আখ্যায়িত করে আল্লাহর অধিকতর গযব ডেকে আনার চেষ্টা কেন?

ইসলাম যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক আন্দোলনকে অনুমোদন করেনা, তেমনি তা স্বেচ্ছায় বন্ধ্যা হবার অনুমতিও দেয়না। জেনে শুনে বন্ধ্যা হওয়াতে দোষ নেই একথা বলা আত্মহত্যাকে বৈধ বলার মতোই ভ্রান্ত। আসলে যারা মনে করে যে, মানুষ নিজের শরীর ও শারীরিক শক্তিসমূহের স্বয়ং মালিক এবং এই শরীর ও তার শক্তিসমূহের সাথে যা খুশি তাই করার অধিকার তার রয়েছে, কেবলমাত্র তারাই এ ধরনের কথা বলে থাকে। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণেই জাপানিরা আত্মহত্যাকে বৈধ মনে করে থাকে। আর এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই কোনো কোনো সাধক সন্যাসী স্বীয় হাত পা বা জিহ্বাকে পংগু করে দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকেই নিজের মালিক ও প্রভু মনে করে এবং এই শরীর ও তার শক্তিসমূহকে আল্লাহর আমানত বলে বিশ্বাস করে, তার দৃষ্টিতে নিজেকে বন্ধ্যা করে দেয়া অপর কাউকে জোরপূর্বক বন্ধ্যা করা অথবা কারো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়ার মতোই পাপ। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৬০)

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও চক্ষুদান

প্রশ্ন : পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ইসলাম কি সমাধান পেশ করে? জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য রকমারি ওষুধ ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতিকে কি আজও শরিয়ত বিরোধী আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে? একজন মুসলমান কি জীবদ্দশায় নিজের চক্ষুদান করতে পারে, যাতে মৃত্যুর পর তা কোনো চক্ষুরোগীর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে? এই ত্যাগ গুনাহর কাজ গণ্য হবে না তো? আর কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তি অন্ধ হয়ে উঠবে না তো?

উত্তর : পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ইসলাম শুধু একটা সমাধানই পেশ করে। সেটি এই যে, আল্লাহ জীবিকার যেসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তা সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করাও পরিমিতভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। যেসব উপকরণ এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, তা উদঘাটন করতে ক্রমাগত চেষ্টা

www.icsbook.info

চালিয়ে যেতে হবে। জনসংখ্যা রোধের যে কোনো চেষ্টা চাই তা সন্তান হত্যা হোক অথবা গর্ভপাত অথবা গর্ভরোধ ভ্রান্ত এবং চরম ধ্বংসাত্মক। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের চারটা কুফল এমন যে, তা কোনো উপায়েই রোধ করা সম্ভব নয়।

১. ব্যভিচারের ব্যাপকতা।

২. মানুষের ভেতর স্বার্থপরতা ও নিজের জীবন মান উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা এতো তীব্র হয় যে, নিজের বৃদ্ধ মা-বাপ, এতিম ভাই এবং অন্যান্য অভাবী আত্মীয়-স্বজনের অস্তিত্বই তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি নিজের খাবারে নিজের সন্তানদেরকে পর্যন্ত ভাগ বসাতে দিতে প্রস্তুত হয়না সে অন্যদেরকে কিভাবে শরিক করতে পারবে?

৩. একটি জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কমপক্ষে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন, তাও বৃদ্ধি পায়না। কেননা কতো শিশু জন্ম দিতে হবে, আর কতো দিতে হবেনা, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা যখন ব্যক্তির হাতেই থাকবে এবং নতুন সন্তানের জন্ম দিয়ে জীবন যাপনের মান নামতে দেয়া যাবেনা এই মনোভাবের ভিত্তিতেই যখন সন্তানের সংখ্যা নির্ধারিত হবে, তখন শেষ পর্যন্ত তারা একটি জাতির জাতীয় জনশক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে পরিমাণ সন্তান জন্মানো দরকার তাও জন্মাতে প্রস্তুত হবেনা। এরূপ পরিস্থিতিতে কখনো কখনো জন্ম হার মৃত্যুর হারের চেয়েও কমে যায়। ফ্রান্স এ ধরনের পরিণতি ভোগ করেছে। ফলে তাকে 'বেশি সন্তান জন্ম দাও' আন্দোলন চালাতে হয়েছে এবং এজন্য পুরস্কার ঘোষণা করে জনগণকে উৎসাহিত করতে হয়েছে।

৪. জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। এই পরিণতিও বিশেষত: এমন একটি জাতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, যার আশেপাশে নিজের চেয়ে কয়েক গুণ বড় একটি শত্রু জনগোষ্ঠি বিদ্যমান। ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক কেমন, তা সকলেরই জানা। আমেরিকার বন্ধুত্বের কারণে কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর সাথেও তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে ভারত, চীন, রাশিয়া ও আফগানিস্তানের জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে ১৩ গুণ বেশি। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করার যোগ্য লোকের সংখ্যা কমানো কতোটা বুদ্ধিমত্তার কাজ, তা যে কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের নিজেরই ভেবে দেখা উচিত।

চক্ষু দান করার ব্যাপারটা শুধু চক্ষু পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনা। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও রোগীদের কাজে লাগা বিচিত্র নয়। এগুলো দিয়ে অন্যান্য হিতকর কাজও হতে পারে। এই দরজা খুলে দিলে মুসলমানদের কবরে দাফন হওয়াই কঠিন হয়ে পড়বে। তাদের সমস্ত শরীরই চাঁদার খাতে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যাবে। ইসলামের

www.icsbook.info

মূলনীতি এই যে, মানুষ নিজের দেহের মালিক নয়। মৃত্যুর আগে নিজের দেহকে ভাগ বাটোয়ারা করা বা চাঁদা দেয়ার ওছিয়ত করার তার কোনো অধিকার নেই। সে যতোক্ষণ বেঁচে থাকে, ততোক্ষণ দেহ তার ব্যবহারের আওতায় থাকে। মৃত্যুর পর এই দেহের আর তার কোনো অধিকার থাকেনা যে, তার সম্পর্কে তার ওছিয়ত কার্যকর হবে। ইসলামী বিধান অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেহকে সসম্মানে কবরস্থ করাই জীবিত লোকদের কর্তব্য।

ইসলাম মানুষের লাশকে সম্মান করার যে নির্দেশ দিয়েছে তা আসলে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানেরই একটা অপরিহার্য অংশ। একবার যদি মানুষের লাশের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা শুধু মৃত মানুষের দেহের কতিপয় হিতকর অঙ্গকে জীবিত মানুষের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হওয়া পর্যন্তই সীমিত থাকবেনা। বরং ক্রমান্বয়ে মানুষের দেহের চর্বি দিয়ে সাবান ও তৈরি হতে আরম্ভ করবে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা যেমন সত্যি সত্যিই তৈরি করেছিল)। মানুষের চামড়া তুলে জুতো, স্যুটকেস ও মানিব্যাগ বানানোর জন্য প্রক্রিয়াজাত করারও চেষ্টা চালানো হবে (মাদ্রাজের একটি ট্যানারী কয়েক বছর আগে এ পরীক্ষাও চালিয়েছে।) মানুষের হাড়, নাড়িভুড়ি ও অন্যান্য জিনিসও ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা হবে। এমনকি এরপরে এক সময় মানুষ সেই আদিম বর্বরতার যুগে ফিরে যাবে যখন মানুষ মানুষের গোশত খেতো। একবার যদি মৃত মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করাকে বৈধ করা হয়, তাহলে আপনি কোন্ পর্যায়ে সীমানা চিহ্নিত করে তার দেহের অন্যান্য 'হিতকর' ব্যবহার রোধ করতে পারবেন এবং কোন্ যুক্তি দ্বারা এই বিধি নিষেধ আরোপ করাকে সঙ্গত বলে প্রমাণিত করবেন, তা আমার বুঝে আসেনা। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬৬)

অপরাধের জরিমানা ও কুফু প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ১. কোনো অপরাধের (যেমন ব্যভিচার) শরিয়তবিহিত শাস্তি যদি কেউ ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে ভোগ করে, তাহলে সে কি আখেরাতে এ গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে?

২. হাদিস ও কুরআনে এ ব্যাপারে কি কোনো মৌলিক বিধান আছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কেবল নিজের বংশের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমি বর-কনের সমতাকে এই অর্থে সমর্থন করি যে, উভয়পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত এবং অপ্রয়োজনীয় মানের পার্থক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

www.icsbook.info

উত্তর ১. শরিয়তের বিধিসম্মত দণ্ড কার্যকরি হওয়ার পর আখেরাতে দণ্ডিত ব্যক্তির গুনাহ মাফ হতে পারে কেবল তখনই যখন সে সেই সাথে আল্লাহ কাছে তওবাও করবে এবং নিজেকে শুধরে নেবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি চুরি করলো এবং তার হাত কেটে দেয়া হলো। কিন্তু সে নিজের পাপের জন্য আল্লাহর সামনে অনুশোচনা প্রকাশ করলোনা, তওবা করলোনা এবং চুরি পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞাও করলোনা, বরঞ্চ উল্টো মনে মনে শরিয়তের হাতকাটার আইনকেই গালাগাল দিতে লাগলো তাহলে আল্লাহর দরবারে তার গুনাহ মাফ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

২. কুরআন বা হাদিসে এমন কোনো নির্দেশ নেই যে, প্রত্যেককে নিজ বংশের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এর বিপরীত কাজ করেছেন এমন নজীর রয়েছে। (তরজমানুল কুরআন ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)

ইসালে সওয়াব

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোর ব্যাপারে আপনার পথনির্দেশ প্রয়োজন। আশা করি আপনি যথারীতি সুস্পষ্ট জবাব দিবেন।

১. 'রাসায়েল ও মাসায়েল' দ্বিতীয় খণ্ডে ২৯৬ পৃষ্ঠায় 'মানত ও ইসালে সওয়াব' এই শিরোনামে আপনি যে জবাব দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায়, যে আপনার মতে আর্থিক ইবাদত দ্বারা মৃত ব্যক্তির রূহে সওয়াব পৌছনো যায়, কিন্তু শারীরিক ইবাদত দ্বারা পৌছানো যায়না। উপরন্তু আর্থিক দান সদকাও মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে কিনা সেটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলে রায় দিচ্ছেন। শারীরিক ইবাদত দ্বারা সওয়াব পৌছানো যায় এই মর্মে কুরআন ও হাদিসে কোনো সুস্পষ্ট উক্তি নেই বলেই কি আপনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন? না এর অন্য কোনো কারণ রয়েছে?

যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির আত্মায় সওয়াব পৌছাতে তৎপর তার দান সদকায় স্বয়ং সেই ব্যক্তির ফায়দা হবে বলে আপনি রায় দিচ্ছেন, কিন্তু মৃত ব্যক্তির ফায়দা হওয়া না হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলে অভিমত দিচ্ছেন। এরূপ পার্থক্য করার আসল কারণ কি?

২. প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোনো মৃত ব্যক্তির রূহকে (চাই সে তার আত্মীয় হোক বা না হোক কিংবা মৃত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার লালন পালনে অংশগ্রহণ করে থাকুক বা না থাকুক) আর্থিক দানের সওয়ার পৌছাতে পারে কি?

www.icsbook.info

না এর জন্য আপনার মতে কোনো শর্ত বা বিধি নিষেধ আছে? অনুগ্রহপূর্বক নিজের অভিমত লিখে দেবেন।

উত্তর : আপনার প্রশ্নাবলির সংক্ষিপ্ত উত্তর ক্রমিক নম্বর অনুসারে নিচে দেয়া হলো :

১. কুরআন ও হাদিস থেকে যে সাধারণ মূলনীতি জানা যায় সেটা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব আমলই তার জন্য উপকারি। এক ব্যক্তির আমল আখেরাতে আর একজনের কোনো কাজে আসবেনা। তবে কোনো কোনো হাদিস থেকে একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থার কথাও জানা যায়। সেটি এই যে, জীবিতরা মৃত ব্যক্তির রূহে সওয়াব পাঠাতে পারে। এ ধরনের যে ক'টা হাদিস আমাদের গোচরিভূত হয়েছে তাতে এমন ইবাদতের উল্লেখ নেই যা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক ইবাদত। শুধুমাত্র এমন ইবাদতের উল্লেখ পাওয়া যায় যা হয় শুধু আর্থিক ইবাদত, যেমন সদকা নচেত আর্থিক ও শারীরিক উভয়ের সমষ্টি, যেমন হজ্জ। এ কারণেই ফিকাহতত্ত্ববিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ ঘটেছে। এক গোষ্ঠির মতে শারীরিক ও আর্থিক উভয় ধরনের ইবাদতের সওয়াব পৌঁছানো যায়। অপর গোষ্ঠির মতে শুধুমাত্র আর্থিক ইবাদত অথবা শারীরিক ও আর্থিক উভয়টির সম্মিলিত ইবাদতই পৌঁছনো যায়। আমার মতে এই দ্বিতীয় মতটাই অগ্রগণ্য। কারণ সাধারণ মূলনীতিতে কোনো বিধি থেকে যদি কিছু ব্যক্তিক্রম বের হয়, তবে সেই ব্যতিক্রমকে সেই পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত, যে পর্যন্ত তা বিধি থেকে বেরিয়ে আসে। একে একটা সাধারণ বিধিতে পরিণত করা আমি সঠিক মনে করিনা। তবে কেউ যদি প্রথম গোষ্ঠির মত অনুসারে কাজ করে তবে তাকে নিন্দনীয় মনে করা চলেনা কেননা শরিয়তে তারও অবকাশ রয়েছে। খুব বেশি দ্বিমত পোষণ করলে তা কেবল অগ্রাধিকার নিয়েই করা যেতে পারে।

অবশ্য এই ইসালে সওয়াব মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে কি আসবেনা সেটা আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। এর প্রকৃত কারণ এই যে, ইসালে সওয়াব তথা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সওয়াব পাঠানোর কাজটা মূলতঃ একটি দোয়া ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ আমরা যখন ইসালে সওয়াব করি তখন আসলে আল্লাহর কাছে দোয়াই করে থাকি যে, হে আল্লাহ! যে নেক কাজটা আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তার সওয়াব তুমি অমুক মৃত ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। এই দোয়া আমাদের অন্যান্য দোয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আমাদের সকল দোয়াই আল্লাহ মর্জির উপর নির্ভরশীল। তিনি যে দোয়াকে চান কবুল করেন আর যে দোয়াকে কবুল করতে চাননা করেননা। এমনও হতে পারে যে, আমরা এমন এক ব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াব করছি, যে আল্লাহর দৃষ্টিতে মুমিনই নয়, অথবা এমন মারাত্মক ধরনের অপরাধী যে, আল্লাহ তাকে কোনো সওয়াবের উপযুক্ত মনে করেননা।

www.icsbook.info

যে ব্যক্তি ইসালে সওয়াবের কাজ করে সে যদি যথার্থই কোনো নেক আমল করে থাকে তবে সে কোনো অবস্থাতেই তার প্রাপ্য পুরস্কার বা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবেনা। আল্লাহ যদি মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব না পৌছান তবে যে ব্যক্তি উক্ত নেক কাজ করে, উক্ত নেক কাজের পুরস্কার অবশ্যই তার জন্য নির্ধারিত করে রাখবেন। এর উদাহরণ এ রকম যে আপনি কোনো ব্যক্তির নামে মানিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠালেন। সেই মানিঅর্ডার যদি তাকে না দেয়া হয় তবে আপনার টাকা আপনার কাছে নিশ্চয়ই ফেরত আসবে। অথবা মনে করুন আপনি জেলখানায় কোনো বন্দীকে খাবার পাঠালেন। সরকার যদি মনে করে যে এমন একজন জালেম অপরাধীকে মজাদার খাবার খাওয়ানো সমীচীন নয়, তাহলে আপনার প্রেরিত খাবার ফেলে দেয়া হবেনা, বরং তা আপনাকে ফেরত দেয়া হবে।

২. ইসালে সওয়াব সকলের জন্যই করা যায়, চাই মৃত ব্যক্তির সাথে তার আত্মীয়তা থাক বা না থাক এবং চাই ইসালে সওয়াবকারীর লালন পালনে মৃত ব্যক্তির কোনো অবদান থাক বা না থাকা। দোয়া যেমন যে কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য করা যায়, তেমনি ইসালে সওয়াবও প্রত্যেকের জন্য করা যায়। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)

আযান ও নামাযের দোয়া সম্পর্ক কয়েকটা সন্দেহ

প্রশ্ন : একদিন ফজরের আযান শুনছিলাম। এমন সময় মনে উদ্ভট ধরনের কিছু প্রশ্ন উদিত হতে লাগলো এবং সন্দেহ সংশয়ের ঝড় বয়ে গেলো। আযান থেকে মন চলে গেলো নামাযের দিকে এবং যখন ভাবতে আরম্ভ করলাম তখন নামাযের এক বিচিত্র রূপ সামনে এলো। এখন নামায কিভাবে পড়বো এবং কি পড়বো বুঝে উঠতে পারছিনা।

একজন মুসলমান মায়ের কোল থেকেই সর্বপ্রথম যে শিক্ষা লাভ করে তা হলো এই যে, "একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের উপযুক্ত এবং তার কোনো শরিক নেই।" এটা যদি সত্য হয় তাহলে-

১. আযান তো একমাত্র আল্লাহর ইবাদতেরই আহ্বান। এই ইবাদতে তার কোনো শরিক নেই। তাহলে اشهد ان لا اله الا اللّٰه এর সাথে সাথে اشهد ان محمد رسول اللّٰه বলার তাৎপর্য কি?

২. নামাযে সূরা ফাতেহা, ইখলাস অথবা অন্য কোনো সূরা যে আমরা পড়ি, এতে আল্লাহর প্রশংসা এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রুকু ও সাজদায় তারই তাসবীহ ও তাহলীল করা হয়। কিন্তু যখনই আমরা

www.icsbook.info

তাশাহ্হুদের জন্য বসি, অমনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ শুরু হয়ে যায়। যেমন তাশাহ্হুদ ও উভয় দরুদে লক্ষণীয়। এভাবে কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর ইবাদতে শরিক করা হয়না?

৩. যে দু'টো দরুদ আমরা পড়ে থাকি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই এ রকম পড়তেননা। কেননা আমরা তো পড়ি : اللهم صل على محمد (হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তার বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর) وعلى ال محمد এই উভয় দরূদ শরিফ মূলত: দোয়া ছাড়া কিছু নয়। অনুরূপভাবে তাশাহ্হুদ এবং তার পরবর্তী দোয়াও। দোয়াকে তো ইবাদত বলা হয় না বরং ইবাদত হলো আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তন। সুতরাং এই ইবাদত শেষ হওয়ার পর দোয়া করাই কি অধিকতর সঙ্গত নয়? ইবাদতের ভেতরেই দোয়া করতে আরম্ভ করা কি সমীচীন? আমার ধারণা এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাশাহ্হুদ ও দরুদ পড়তেননা। কেননা নামাযের মধ্যেই তিনি নিজের জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করবেন এটা তাঁর পক্ষে বেমানান। তাশাহ্হুদ সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন তো। দরুদের মতো তিনি যদি তাশাহ্হুদও পড়তেন, তাহলে সেটা ভিন্ন ধরনের তাশাহ্হুদই হবে। যেখানে বলা হয়েছে, "হে নবী! তোমার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক" সেখানে তিনি হয়তো পড়তেন "আমার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক।"

৪. আল্লাহর যে ইবাদত আমরা করি তার নাম সালাত অর্থাৎ নামায। তাহলে আবার ফরয, সুন্নত, বেতের, নফল ইত্যাদি এসব কি জিনিস? এগুলো পড়ে আমরা কার ইবাদত করি? আমরা যাই আল্লাহর ইবাদত করতে আর পড়ি সুন্নত নামায। আর এর নিয়তও করি "দু'রাকাত রসূলের সুন্নত" ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবেও কি আল্লাহর ইবাদতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরিক করা প্রমাণিত হয়না?

৫. নামাযের শেষে আমরা যে সালাম ফিরাই, এতে কাকে সম্বোধন করি?

৬. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কি প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়তেন? আমরা যতো রাকাত পড়ি তিনিও কি ততো রাকাতই পড়তেন? এ প্রশ্ন নিয়ে আমি নিজেই কিছুটা অনুসন্ধান করছি কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে এমন কোনো দলিল আপাততো: পাইনি। বরঞ্চ এর বিপরীত বুখারি শরীফে এই হাদিস চোখে পড়লো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আছরের নামায দু'রাকাত পড়েছেন। মুয়াত্তার নামায সংক্রান্ত অধ্যায়ে লিখিত দেখলাম যে, রাতদিনের নামায দুই রাকাত। এ উভয় হাদিস থেকে নামায দু'রাকাত করে প্রমাণিত হয়।

www.icsbook.info

উপরোক্ত সন্দেহ খটকা **মনকে** দিশেহারা করে দিয়েছে। প্রায়ই আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, আমাদের বর্তমান নামায রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেখানো সেই নামায নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার খট্কা দূর করে দিন এবং আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমি হয়তো আর নামায পড়তে পারবোনা।

উত্তর : আপনার মনে যদি কোনো কুচিন্তা আসে তাহলে তার কারণে নামায ছেড়ে দেবেননা। বরং নামায অব্যাহত রাখুন এবং আপনার কুচিন্তা সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিন্ত হোন।

আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব নিম্নে দেয়া হলো :

১. আযানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসূল হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয়ে থাকে- খোদা হওয়ার পক্ষে নয়। তাহলে আপনার মনে এ সন্দেহ কেনো সৃষ্টি হলো যে, রিসালাতের সাক্ষ্য দিলেও ইবাদতে শিরক করা হবে? রিসালাতের সাক্ষ্য তো এজন্য দেয়া হয়ে থাকে যে, আমরা রসূলের শেখানো নিয়ম পদ্ধতি ও আকীদা অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করবো। আমরা এই আকীদা বিশ্বাস ও নিয়মপদ্ধতি নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা থেকে উদ্ভাবন করিনি।

২. তাশাহ্হুদের পুরো কথাগুলো নিয়ে আপনি চিন্তা করুন। প্রথমে আপনি আল্লাহর সামনে নিজের সালাম পেশ করেন। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রহমত ও বরকতের দোয়া করেন। অতঃপর নিজের জন্য ও সকল নেককার বান্দার সুখ-শান্তির জন্য দোয়া করেন। তারপর আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। অতপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠান। এতে আসলে আল্লাহর কাছেই দোয়া করা হয় যে, তিনি যেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। এরপর আল্লাহর কাছে নিজের ও পিতামাতার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করেন। এই সমস্ত বক্তব্য আপনি নিজেই লক্ষ্য করুন। এর মধ্যে কোন্ জিনিসটি এমন যে, আপনি তাকে শিরক বলতে পারেন? এখানে তো আল্লাহর কাছেই সকল প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করা কি শিরক? আল্লাহর রসূলকে রসূল বলে স্বীকার করাও কি শিরক?

৩. শুধু আল্লাহর প্রশংসা করার নামই ইবাদত, আল্লাহর কাছে দোয়া করা ইবাদত নয়- এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আপনার কোথা থেকে জন্মালো? দোয়াই তো ইবাদতের প্রাণ। কুরআনে একাধিক জায়গায় আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু বা প্রাণীর কাছে প্রার্থনাকারী মুশরিকদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বস্তু বা প্রাণীর ইবাদতকারী বলে

www.icsbook.info

আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে "আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদত করে" না বলে "আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে প্রার্থনা করে" বলা হয়েছে। অতপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহর কাছেই দোয়া কর।

আমরা যে তাশাহ্হুদ পড়ি, এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সাহাবাদেরকে শিখিয়েছেন এবং তাদেরকে এটা পড়তে বলেছেন। তাই নামাযে আমাদের এটাই পড়া উচিত। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কি তাশাহ্হুদ পড়তেন, সে সম্পর্কে হাদিসে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাঁর তাশাহ্হুদের ভাষা কিছুটা ভিন্ন রকমের হলেও হতে পারে। আবার এটাও বিচিত্র নয় যে, তিনি এই তাশাহ্হুদই পড়তেন। নামাযে আমরা যদি নিজেদের জন্য দোয়া করতে পারি, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নামাযে নিজের জন্য দোয়া করবেন, এতে আপনার আপত্তির কি আছে? অনুরূপভাবে আমরা যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসূল হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেই, তাহলে তিনি নিজেও নিজের নবুয়্যতের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন, এতে অসুবিধার কি আছে?

৪. ফরয নামায অর্থ হলো আল্লাহর সেই ইবাদত, যা তার আরোপিত নামাযের অপরিহার্য কর্তব্য পালনের জন্য ন্যূনতমভাবে জরুরি এবং যা পালন না করলে নামাযের হুকুম পালন করাই হয়না। সুন্নত অর্থ হলো আল্লাহর সেই ইবাদত, যা ফরযের অতিরিক্ত কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময়ই পালন করতেন এবং আমাদেরকে তাকিদ দিয়েছেন তা পালন করার জন্য। নফল অর্থ হলো আল্লাহ সেই ইবাদত, যা আমরা স্বেচ্ছায় করি, যা আমাদের জন্য অপরিহার্যও করা হয়নি এবং তাকিদও দেয়া হয়নি। এখন বলুন, এতে শিরক কোত্থেকে এলো? "রসূলের সুন্নত" বলে নিয়ত করার অর্থ এই নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়া হচ্ছে। বরং এর অর্থ এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামায ফরযের অতিরিক্ত পড়তেন এবং তাঁর অনুকরণে আমরাও পড়ি।

৫. কোনো কাজ শেষ করার জন্য তার একটা পদ্ধতি থাকা দরকার। নামায শেষ করার পদ্ধতি এই যে, আপনি যে কেবলামুখী হয়ে বসে ইবাদত করছিলেন, এখন দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে কাজটা শেষ করুন। এখন মুখ ফেরানোর একটা পদ্ধতি এই যে, চুপচাপ মুখ ফিরিয়ে দিন। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে মুখ ফেরান। এই দু'টো পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টা আপনার বেশি ভালো লাগে?

www.icsbook.info

৬. আপনি যেসব হাদিসের উল্লেখ করেছেন, তা প্রাথমিক যুগের ব্যাপার। নামাযের বিধিসমূহ যখন পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করেছে। সেই সর্বশেষ পর্যায়ের নামাযে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াক্তে আমরা আজকাল যতো রাকাত পড়ে থাকি তাই পড়তেন। এ তত্ত্ব একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত। হযরত উমরের যে উক্তি আপনি উদ্ধৃত করেছেন, ওটা নফল সংক্রান্ত। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)

যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : আজকের এই স্বাধীন নাগরিক সভ্যতার যুগেও গরীব ও মিসকীনদের জন্য ধনী ও সচ্ছল লোকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করা কি সমীচীন হবে, যখন তারা অন্য বহু রকমের ট্যাক্স ছাড়া আয়করও দিয়ে থাকে?

উত্তর : যাকাত সম্পর্কে সর্বপ্রথম একথা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, এটা কোনো ট্যাক্স নয় বরং একটা ইবাদত এবং ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, ঠিক নামায, রোযা ও হজ্জ যেমন ইসলামের এক একটা স্তম্ভ। কুরআনকে খোলা চোখ নিয়ে যে ব্যক্তি পড়েছে সে দেখতে পায় যে, কুরআনে সাধারণভাবে নামায ও যাকাতকে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ বলে অভিহিত করেছে। সর্বযুগে সকল নবী যাকাতকে ইসলামের অংশরূপে মানতেন। কাজেই একে ট্যাক্স বা কর মনে করা এবং এর সাথে ট্যাক্সের মতো আচরণ করা সর্বপ্রথম মৌলিক ভ্রান্তি। একটি ইসলামী সরকার যেমন স্বীয় কর্মচারিদের কাছ থেকে অফিস সংক্রান্ত কাজ এবং অন্যান্য কাজ আদায় করে বলতে পারেনা যে, এখন আর নামায পড়ার দরকার নেই। কেননা তোমরা সরকারি কর্তব্য পালন করেছ। অনুরূপভাবে সরকারের এ কথাও বলার অধিকার নেই যে, যাকাত আর দিতে হবেনা। কেননা ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিরা সময়মত নামায পড়তে পারে এমনভাবে অফিসের কাজের সময় নির্ধারণ করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য। অনুরূপভাবে তাকে যাকাত দেয়ার অবকাশ সৃষ্টির জন্য কর আরোপ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

তাছাড়া একথাও জানা দরকার যে, বর্তমান করসমূহের মধ্যে কোনো কর সেসব খাতে ও সেই পদ্ধতিতে ব্যয়িত হয়না যার জন্য যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং যেভাবে তা বণ্টন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬১)

ইজতিহাদের সীমা

প্রশ্ন : আমার এক নওমুসলিম জার্মান বন্ধু আছেন। তার সাথে আমার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। তিনি মাঝে মাঝে নিজের কিছু কিছু তাত্ত্বিক ও বাস্তব সমস্যা

www.icsbook.info

তুলে ধরেন। সম্প্রতি তিনি একটা চিঠি লিখেছেন। এতে তিনি জানতে চেয়েছেন যে, "ইজতিহাদ"-এর মূলনীতির আওতাধীন ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় বিধিতে কতোটুকু পরিবর্তন আনা যেতে পারে? তার ধারণা এই যে, ইসলামের বহু সংখ্যক খুঁটিনাটি বিধি ফিকাহবিদগণ কর্তৃক রচিত এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরবর্তী সময়কার বিশেষ ভৌগোলিক ও তামাদ্দুনিক অবস্থার ফসল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী তো ইজতিহাদের (তথা কুরআন ও হাদিসের মূলনীতির আলোকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উপযোগী নীতি ও বিধি রচনার লক্ষ্যে চিন্তা গবেষণা) দ্বার উন্মুক্ত ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নীতিগতভাবে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কার্যত: তা বন্ধই রাখা হয়েছিল। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বর্তমান যুগে বিশেষত: ইউরোপের মুসলমানদের কিছু কিছু ইসলামী বিধি পালন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ তারা অযুর বিধি তুলে ধরেন এবং বলেন যে, প্রতিবার পা ধোয়া ইউরোপবাসীর জন্য দুরূহ এবং নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়। তাদের বক্তব্য এই যে, ইউরোপের লোকেরা সব সময় চামড়ার মোজা ও বন্ধ জুতা পরিধান করে থাকে। তাই পায়ে ধুলো বা নাপাক জিনিস লাগার অবকাশ খুবই কম। শীতকালে পা ধোয়া সহজও নয়। মুখ ধোয়াও তদ্রূপ। ইউরোপের শহরগুলোতে সাধারণত: বাতাস নির্মল ও ধুলোবালিমুক্ত থাকে। ঘামও কদাচিত হয়। এজন্য তাদের মতে মুখ ও পা ধোয়া দিনের মধ্যে একবারই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার উক্ত বন্ধুর এই চিন্তাধারার বিশুদ্ধ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করুন এবং এর যে দিকটা সংশোধন সাপেক্ষ হয় তা চিহ্নিত করুন, যাতে আমি তাকে একটা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারি।

উত্তর : আপনার জার্মান বন্ধু প্রশ্নের সূচনাতে যদিও বলেছেন যে, ফিকাহবিদগণের রচিত বিধিতে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কতোখানি রদবদল ঘটানোর অবকাশ আছে, কিন্তু পরবর্তীতে যেখানে তিনি একথার নির্দিষ্ট উদাহরণ পেশ করেছেন সেখানে ফিকাহবিদদের রচিত বিধিতে নয় বরং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশে রদবদল ঘটানোর প্রশ্ন ওঠে। অযুতে মুখ, কনুই সমেত হাত ও গোছা সমেত পা ধোয়া এবং মাথা মসেহ করার নির্দেশ তো কুরআনেই দেয়া হয়েছে। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৬)

অধিকন্তু মুখ ও হাত-পা ধোয়ার নির্দেশের যে কারণ আপনার বন্ধু বুঝেছেন সেটাও ঠিক নয়। তিনি মনে করেন যে, ধুলোবালি সাফ করার জন্যই এ নির্দেশ। তাই যেখানে ধুলোবালি নেই সেখানে এ নির্দেশ কার্যকরী করার প্রয়োজন নেই। অথচ তার আসল কারণ এটা মোটেই নয়। আসলে আল্লাহ যেটা চান তা হলো

www.icsbook.info

এই যে, তার ইবাদতের উপযুক্ত হওয়া ও উপযুক্ত না হওয়া- এ দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হোক। এতে করে মানুষ যখন তার ইবাদত করতে ইচ্ছা করবে তখন নিজের শরীর ও কাপড়ের অবস্থা দেখবে এবং চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য কিনা। ইবাদত করতে যাওয়ার আগে নিজেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে গুরুত্ব সহকারে যাবে। এভাবে ইবাদতের গুরুত্ব তার মনে বদ্ধমূল হয় এবং মানুষ তাকে নিজের সাধারণ মামুলি কার্যাবলী থেকে ভিন্নতর ও উচ্চতর কাজ মনে করে করবে। এজন্যই পানি যেখানে পাওয়া যায়না সেখানে তাইয়াম্মুম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ তাইয়াম্মুম দ্বারা দৃশ্যত: কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয়না।

এছাড়া অযুতে যে পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার একটা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য এও যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কারণে মানুষের পবিত্র থাকার অভ্যাস গড়ে উঠুক। মলিনতা ও অপরিচ্ছন্নতা সব সময় শুধু মাটি ও ধুলোবালি থেকেই জন্মে তা নয়। মানবদেহের লোমকূপ দিয়ে সব সময় কিছু না কিছু বর্জ্য পদার্থ নির্গত হতে থাকে। ওগুলো যদি ধোয়া না হতে থাকে, তাহলে ঐ বর্জ্য পদার্থ ক্রমাগত শরীরে পুঞ্জিভূত হয়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। এজন্যই ইউরোপীয় সাহেবদের মুখ থেকেও দুর্গন্ধ বেরোয়। আর তাদের শরীরেও এক ধরনের পচা গন্ধ থাকে। তাদের পায়ে তো ভয়ানক দুর্গন্ধ জন্মে। এমনকি তাদের জুতো ও মোজায়ও এক উৎকট গন্ধের সৃষ্টি হয়। ইসলামের অনুসারীরা কোনো পর্যায়েই নোংরা ও ঘৃণ্য অবস্থায় থাকুক, এটা ইসলামের মনোপুত নয়। ইউরোপীয়রা এ দুর্গন্ধকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য রকমারি সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। অথচ দুর্গন্ধকে বাহ্যিক সুগন্ধী দিয়ে ঢেকে রাখা কোনো পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা নয়।

শীতকালে অথবা শীতপ্রধান অঞ্চলে পা ধোয়ার কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য ইসলাম আগে থেকেই এ রেয়াতী ব্যবস্থা রেখেছে যে, একবার পা ধুয়ে মোজা পরে নিয়ে স্থায়ী আবাসস্থলে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং প্রবাস অবস্থায় ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত আর পা ধোয়া লাগবেনা। তবে শর্ত এই যে, এই সময়ের মধ্যে মোজা খোলা চলবেনা।

আপনার জার্মান বন্ধুকে বলবেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামের খুঁটিনাটি বিধিতে প্রয়োজনীয় রদবদল করার অবকাশ তো রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের রদবদল করার জন্য শরিয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। যাকে তাকে যেনো তেনোভাবে এ অধিকার দেয়া যায়না। (তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৬২)

www.icsbook.info

বীমার বৈধতা ও অবৈধতা

প্রশ্ন : বীমার ব্যাপারে আমি সংশয়ে ভুগছি। বীমা করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ তা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। বর্তমান বীমা ব্যবসা নাজায়েয হয়ে থাকলে তাকে জায়েয বানাবার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে? বর্তমান অবস্থায় বীমা পরিহার করলে দেশের লোকেরা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এ ব্যবসাটি সারা দুনিয়ায় চলছে। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতি ব্যাপকভাবে ইন্স্যুরেন্স সংগঠন করেছে। তারা এ থেকে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো এ ব্যাপারে দ্বিধা ও দোটানার ভাব রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আপনি সঠিক পথের সন্ধান দিলে কৃতজ্ঞ হবো।

উত্তর : ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন রয়ে গেছে, যার ভিত্তিতে তাকে বৈধ গণ্য করা যেতে পারেনা।

এক. ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলো প্রিমিয়াম হিসেবে যেসব টাকা আদায় করে থাকে তার বিরাট অংশ তারা সুদের ব্যবসায়ে খাটিয়ে লাভ করে। যেসব লোক যে কোনো আকারেই হোক নিজেদেরকে বা নিজেদের কোনো জিনিসকে তাদের কাছে ইনশিয়োর করায় তারা আপনা আপনিই ঐসব ব্যবসায়ে অংশিদার হয়ে যায়।

দুই. মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা ক্ষতির বিনিময়ে এ কোম্পানিগুলো যে অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব নেয় তার মধ্যে নীতিগতভাবে জুয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

তিন. এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে অর্থ প্রদান করা হয় ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে তা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিণত হয়, যা আসলে শরিয়ত নির্দেশিত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন হওয়া উচিত। কিন্তু এ অর্থ মীরাস হিসেবে বণ্টন করা হয়না বরং সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ অর্থ লাভ করে ইনশিয়োরকারী যাদেরকে এ অর্থ দান করার জন্য ওছিয়ত করে যায়। অথচ ওয়ারিসের নামে ওছিয়ত করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।

তবে ইন্স্যুরেন্সের ব্যবসাকে কিভাবে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা যেতে পারে, এ প্রশ্নটা যতোটা সহজ এর জবাব ততোটা সহজ নয়। এজন্য প্রয়োজন একটি বিশেষজ্ঞ দলের। এ দলটি যেমন একদিকে ইসলামের নীতি সম্পর্কে অবগত থাকবে তেমনি অন্যদিকে এর থাকবে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের জ্ঞান। এ বিশেষজ্ঞ দলটি সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসাটিতে এমন সব সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা পেশ করবেন যার ফলে এ ব্যবসাটি সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তের নীতিও লংঘিত হবেনা।

www.icsbook.info

যতোদিন এটা হচ্ছে না ততোদিন আমাদের অন্তত: একথা স্বীকার করা উচিত যে, আমরা একটা ভুল কাজ করে যাচ্ছি। ভুলের অনুভূতিটুকুও যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টার প্রশ্নই আসেনা।

নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগে ইন্স্যুরেন্স অত্যধিক গুরুত্ববহ। সারা দুনিয়ায় এর প্রচলন। কিন্তু এ যুক্তিটি কোনো হারামকে হালাল করে দিতে পারেনা। অথবা কোনো ব্যক্তি দাবি করতে পারেনা, দুনিয়ায় যা কিছু চলছে তা সব হালাল বা তার হালাল হওয়া উচিত। কারণ তা সারা দুনিয়ায় প্রচলিত। মুসলমান হিসেবে আমাদের অবশ্যি জায়েয নাজায়েযের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং নিজেদের বিষয়গুলো জায়েয পদ্ধতিতে পরিচালনা করার উপর জোর দিতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৬২)

পরিবার আইন ও শরিয়তের বিধান

প্রশ্ন : পরিবার আইন বলবত হওয়ার পর কেউ যদি শরিয়ত মুতাবেক কোনো রকম তালাক দেয় তবে তা কি কার্যকর হবে? পরিবার আইনে তো তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

উত্তর : কোনো সরকারের প্রবর্তিত আইন দ্বারা শরিয়তের বিধিতে যেমন কোনো রদবদল ঘটতে পারেনা, তেমনি তা শরিয়তের বিকল্পও হতে পারেনা। তাই শরিয়তের বিধি মুতাবেক যে তালাক দেয়া হবে তা আল্লাহর চোখে ও মুসলমানদের চোখে কার্যকর হয়ে যাবে, চাই সরকারি আইনে তা কার্যকর হোক বা না হোক। আর যে তালাক শরিয়ত অনুসারে কার্যকর হওয়ার যোগ্য নয়, সরকারি আইন তাকে কার্যকর সাব্যস্ত করলেও তা কখনো কার্যকর হবেনা। এখন মুসলমানরা বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের শরিয়ত মুতাবেক ফায়সালা করবেন, না সরকার প্রবর্তিত পরিবার আইন মুতাবেক- সেটা তাদেরই ভেবে দেখা কর্তব্য। (তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬২)

কয়েকটি বিভিন্ন ফিকহী মাসায়েল

প্রশ্ন : কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান করতে পারছিনা। আশা করি আপনি এগুলোর ব্যাপারে আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

১. এ পর্যন্ত ব্যবসায়ের শেয়ারে যাকাত সম্পর্কে আপনার যেসব লেখা আমার নজরে পড়েছে সেখানে যেনো একটি ইসলামী রাষ্ট্র অথবা কমপক্ষে যাকাত আদায়ের জন্য একটি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। এখন সেখানে যেনো সমস্যা কেবল এতোটুকু যে, যাকাত কোন্

www.icsbook.info

পর্যায়ে ও কার থেকে আদায় করা হবে? যতোদিন কোনো কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনা কায়েম হচ্ছে না ততোদিন শেয়ারের যাকাত গ্রহণ করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে?

আমি নিজের শেয়ারকে অর্থের প্রতিবদল হিসেবে কিয়াস করে তার মূল্য যে পরিমাণ অর্থ হয় তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু শেয়ারের বার্ষিক আয়কর বাদ দিয়ে তা থেকে যা পাই তা পুরোপুরি তার যাকাতে ব্যয় হয়ে যায়। এ অবস্থা তো একেবারেই অসন্তোষজনক।

২. আপনার তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় ৫০ ভলিউম ১ম সংখ্যায় মেরু অঞ্চলে ইফতারি ও সাহরির সময়সূচির উপর ডক্টর হামিদুল্লাহর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এ আলোচনাটি ডক্টর সাহেব তাঁর 'ইন্ট্রডাকশান টু ইসলাম' গ্রন্থে আরো বিস্তারিতভাবে করেছেন। প্রথমবার আমি মোটামুটি প্রবন্ধটা পড়ি। কিন্তু দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগসহকারে পড়ার পর ওটা আমার কাছে যথেষ্ট আপত্তিকর মনে হয়েছে।

ডক্টর সাহেবের যুক্তি হচ্ছে, ভূ-বিষুব রেখা থেকে দুই মেরুর দিকে যেতে থাকলে দিন ও রাতের মধ্যকার ব্যবধান বাড়তে থাকে। ৪৫° অক্ষরেখা পর্যন্ত যে ব্যবধান সহনীয় হয়। কিন্তু এরপরে এ ব্যবধান অসহনীয় হয়ে ওঠে। কাজেই এই অক্ষরেখার পরে মুসলমানদেরকে ৪৫° অক্ষরেখা অঞ্চলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় অনুযায়ী নামায-রোযার সময় নির্ধারণ করতে হবে।

এ প্রস্তাবটি মেনে নিলে কানাডা, আমেরিকার উত্তরাংশ, স্পেন ও ইটালি ছাড়া সমগ্র ইউরোপ এবং প্রায় সমগ্র রাশিয়ার মুসলমানদের নিজেদের এলাকার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের হিসাব অনুযায়ী ইসলামী অনুশাসন ও অনুষ্ঠানাদি পালন করার সূর্যাস্তের সময়ের হিসাব অনুযায়ী সমস্ত কাজ করতে হবে। আমি যতোদুর জানি প্যারিসের মসজিদের কর্তৃত্বাধীনে প্যারিসের মুসলমানরা রমযানে এমনটিই করে থাকে। তারা মরক্কো রেডিও ধরে বসে থাকে। যখনই মরক্কোয় ইফতারির আযান হয় সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্যারিসে বসে ইফতারি শুরু করে। প্যারিসের আকাশে তখন সূর্য দিগন্তরেখার অনেক উপরের দিকে থাকলেও তারা এর কোনো পরোয়া করেনা। এ বিষয়টার সঙ্গে কি আপনি একমত?

আমি লন্ডনের দীর্ঘতম রোযা দেখেছি। সাহরি শেষ হবার পর থেকে ইফতারি পর্যন্ত প্রায় ১৭ ঘন্টা হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের তের চৌদ্দ ঘণ্টার রোযা-এর

www.icsbook.info

চাইতে কঠিন মনে হয়। লন্ডনের এতো দীর্ঘ রোযার পরও ইফতারির সময় একদম পিপাসাই লাগতোনা। অবশ্য ক্ষুধা লাগতো। কিন্তু এতে পাঞ্জাবে রোযার সময় শরীর যেমন কাহিল হয়ে যেতো তেমন হতোনা। তাহলে এক্ষেত্রে ইউরোপের জন্য স্থানীয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচি না মেনে মরক্কোর সময়সূচি মেনে চলা কেমন করে সংগত হতে পারে?

আমার জনৈক বন্ধু ড. হামীদুল্লাহকে পত্র মারফত জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ৪৫° ডিগ্রি অক্ষরেখা তিনি কিভাবে নির্ধারণ করেছেন। জবাবে তিনি বলেছেন, সাহাবাগণ এ পর্যন্ত গিয়েছেন। এজন্যই তিনি একে সীমানা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এ ব্যাপারে আপনার মত জানতে চাই। রাসায়েল ও মাসায়েলে আপনার জবাব পড়েছি। কিন্তু তা সাধারণ পর্যায়ের। এখানে ড. সাহেব বিস্তারিত আলোচনায় পৌঁছে গিয়ে সাধারণ ও অসাধারণ অক্ষাংশের প্রশ্ন সৃষ্টি করেছেন। লন্ডনে এ প্রশ্নটা বড় হয়ে দাঁড়াবার কারণ এই যে, ইউরোপীয় নওমুসলিমরা সূর্যের পরিবর্তে ঘড়ির সময় অনুসারে ইবাদত করতে চান। বরং তাদের ইচ্ছাধীন হলে তারা জুমার নামায শুক্রবারের বদলে রবিবারে পড়ার ব্যবস্থা করতেন। এ প্রস্তাবটি আমার কাছে এসেছে।

৩. এখানে লন্ডনে একজন মুসলমান ছাত্র একজন জার্মান মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল। মেয়েটি মুসলমান হতে চায়নি। তাই আমি তাদের বিয়ে আটকাবার চেষ্টা করি। ছেলেটিকে বুঝালাম, তার ঘরে যখন শূয়োরের গোশত খাওয়া হবে এবং শরাব পান করা হবে তখন সে তা বরদাশত করবে কেমন করে? মেয়েটি যদি অমুসলিম থাকে তাহলে আমাদের হারামগুলোর কোনো পরোয়াই সে করবে না। এতে সংসার জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে। ছেলেটি একথা বুঝতে পারে। সে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এ সময় তার সাক্ষাত হয় ইসলামিক সেন্টারের মিসরীয় ডাইরেক্টরের সাথে। তিনি আবার ডক্টর আরবেরির সাথে মিলে একটি বই প্রকাশ করেছেন এবং বর্তমানে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়ত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে মিসর ফিরে গেছেন। তিনি এ ছেলেটিকে বলেন, তার স্ত্রী যদি খৃষ্টান থেকে থাকে তাহলে তাকে শরাব পান ও শূয়োরের গোশত খেতে বাধা দেবার কোনো অধিকারই তার নেই। কারণ এগুলো তার ধর্মে বৈধ। আর যেসব কাজ তার ধর্মে বৈধ সেগুলো করার ব্যাপারে ইসলাম তাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। মুসলমান স্বামী তার এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে গুনাহগার হবে।

একথা কি ঠিক? রসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরান সন্ধি থেকে

www.icsbook.info

কি একথা প্রমাণ করা যেতে পারেনা যে, কোনো মুসলমানের আহলে কিতাব স্ত্রী ইসলামের বিশিষ্ট কবিরা গুনাহের কাজগুলো করতে পারবেনা?

৪. এই মিসরীয় আলেম সাহেব মোহরানা ছাড়া বিয়ে বৈধ হবার দাবিদার ছিলেন। সত্যিই কি মোহরানা ছাড়া বিয়ে জায়েয?

৫. আমার কয়েকজন ইরাকী বন্ধু কয়েক বছর থেকে লন্ডনে আছেন। তারা এখনো কসর নামায পড়েন। তারা বলেন, যে দূরত্ব অতিক্রম করলে একজন লোক মুসাফির হয় তার কোনো সীমা কুরআনে ও হাদিসে বর্ণিত হয়নি। দূরত্বের এ নির্ধারিত সীমা আসলে ফকীহদের নিজস্ব উদ্ভাবন। কাজেই এটা মানতে তারা প্রস্তুত নন। যতোদিন তারা নিজেদের স্বদেশের বাইরে থাকবেন ততোদিন মুসাফির থাকবেন। ততোদিন তারা কসর করবেন। এমনকি সারা জীবন লন্ডনে থাকলেও তারা কসর করে যাবেন। এখন বলুন তাদের ভুলটা কেমন করে বুঝাই।

৬. তারা একথাও বলে থাকেন যে, রোযার কাযা আছে কিন্তু নামাযের কাযা নেই। রোযা কাযা হয়ে গেলে পরে তা পূরণ করার হুকুম কুরআনে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে নামায একবার হারিয়ে যায় তা চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। কুরআনে কোথাও কাযা নামাযের কথা নেই, হাদিসেও নেই। একথা কি সত্য?

৭. ব্যবসায়ের শেয়ার সম্পর্কে আর একটা কথা বলতে চাই। এতোদিন অন্যেরা এবং আপনিও একথা বলে এসেছেন যে, শেয়ার ক্রয়ের পর বছর পূর্ণ হলে তবেই যাকাত দিতে হবে। কিন্তু সাধারণভাবে লোকেরা এক বছরে একই শেয়ার রাখেনা। কখনো দাম কমে গেলে শেয়ারটি বেঁচে দেয়। কখনো অন্য শেয়ারগুলো বেশি লাভজনক মনে হলে নিজেরটা বেঁচে দিয়ে অন্যগুলো কিনে নেয়। এ ধরনের আরো অনেক ব্যাপার ঘটে থাকে। আমাদের দেশে হয়তো এখনো এটা ততোটা ছড়িয়ে পড়েনি কিন্তু এখানে লন্ডনে এটাই হচ্ছে। এ অবস্থায়ও কি কোনো একটি কোম্পানির অংশের উপর এক বছর পূর্ণ হবার পরই যাকাত আরোপিত হবে? এভাবে কি লোকেরা স্থায়ীভাবে যাকাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে? যাকাত প্রদান করার নিয়ত সত্ত্বেও কি তারা যাকাত দিতে পারবেনা।

উত্তর: আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি :

ব্যবসায়িক শেয়ারের যাকাত

১ ও ৭. ব্যবসায়ে শেয়ারের যাকাত এমন কোনো নীতির ভিত্তিতে আদায় করা যাবেনা যার ফলে একথা মনে হয় যেনো শেয়ারের অর্থ আপনার কাছে জমা আছে এবং আপনি জমা টাকার যাকাত আদায় করে চলেছেন। বরং ব্যবসায় পণ্যের

www.icsbook.info

যাকাত আদায়ের যে নীতি নির্ধারিত রয়েছে তার ভিত্তিতে এরও যাকাত আদায় করতে হবে। সে নীতিটি হচ্ছে, ব্যবসা শুরু করার দিন থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর দেখতে হবে মওজুদ পণ্য (Stock in Trade) কি পরিমাণ আছে। তার মূল্য কতো। আর হাতে নগদ (Cash in hand) কতো টাকা আছে। উভয়ের সমষ্টির উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। এ নীতির ভিত্তিতে একটি কোম্পানি বা বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে আপনার যে শেয়ারগুলো রয়েছে বর্তমান বাজারদর হিসেবে তার মূল্য কতো দেখতে হবে। বছরের মাঝখানে এক ব্যক্তি তার শেয়ার বা শেয়ারগুলো যতোবারই বিক্রি করুক না কেন তাতে কিছু যায় আসেনা। আপনি কোম্পানির প্রথম শেয়ারটি যখন কেনেন তখন থেকেই বছর গণনা করা হবে এবং বছরের শেষে আপনার শেয়ারের বাজার দর (Market Price) যা হবে তার প্রেক্ষিতে যাকাত নির্ধারণ করা হবে। এই সঙ্গে আপনার কাছে নগদ কতো আছে তাও দেখা হবে। উভয়ের সমষ্টির উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। তবে একথা স্বতন্ত্র যে, ট্যাক্স প্রদানের পর আপনার লাভের অর্থের পরিমাণ এতো কমে যায় যে, তা থেকে যাকাত আদায় করলে হাতে আর কিছুই থাকেনা। এ অবস্থার কোনো সুরাহা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা তো এমন একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকার শাস্তি যে রাষ্ট্র ট্যাক্স আদায় করার সময় যাকাতের প্রতি কোনো নজরই দেয়না। এ শাস্তি আমাদের অবশ্যি ততোদিন পর্যন্ত ভোগ করা উচিত যতোদিন না আমরা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলে দেই যার অধীনে আমরা বাস করে আসছি।

মেরু এলাকায় ইবাদতের সময়সূচি

২. দুই মেরুর নিকটবর্তী এলাকায় ইবাদতের সময়সূচির ব্যাপারে ড. হামীদুল্লাহর ইজতিহাদের সাথে আমি মোটেই একমত নই। আমার মতে যেসব এলাকায় ২৪ ঘণ্টায় দিন রাতের আবর্তন হয় সেসব এলাকায় রাত বা দিন মাত্র দু' ঘণ্টার জন্য স্থায়ী হলেও নামায-রোযার সময়সূচি বিষুব রেখার নিকটবর্তী এলাকাসমূহের ন্যায় হওয়া উচিত। তবে তারও আগে যেখানে রাত ও দিন ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় স্থায়ী হয়ে থাকে সেখানে ঘড়ির মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করা উচিত। এসব এলাকার সময় নির্ধারণ মক্কা মুয়ায্যমা ও মদিনা মুনাওয়ারার স্ট্যান্ডার্ডকে সামনে রেখে করা উচিত।

আহলে কিতাব স্ত্রীর কর্মের স্বাধীনতার সীমা

৩. আহলে কিতাবের যেসব মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া

www.icsbook.info

হয়েছে কুরআন মজীদে তাদের জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এক, তাদের মুহসানাত (সতী-সাধ্বী) হতে হবে। দুই, তাদেরকে বিয়ে করে একজন মুসলমান যেনো তার ঈমানকে বিপদের আবর্তে নিক্ষেপ না করে। (দেখুন, সূরা মায়েদা ৫ আয়াত)। এ শর্তগুলোর প্রেক্ষিতে ফাসেক ও দুশ্চরিত্র আহলে কিতাব মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয নয়। একজন মুসলমান যে মেয়েটাকে বিয়ে করছে সে যেনো তার সংসারে, তার পরিবারে এবং তার সন্তানদের মধ্যে এমনসব কাজকর্ম প্রচলন না করে যা ইসলামে হারাম, এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা তার জন্য ফরয। নিঃসন্দেহে সে তাকে ধর্মত্যাগ করার জন্য বাধ্য করতে পারেনা। তাকে গীর্জায় যেতে বাধা দিতে পারেনা। কিন্তু বিয়ের পূর্বে অবশ্যি এ শর্ত করে নিতে হবে যে, তার স্ত্রী হবার পর সে শরাব, শূয়োরের গোশত এবং এ ধরনের অন্যান্য হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবে। এই ধরনের শর্ত পূর্বাহ্নে আরোপ করার অধিকার তার আছে এবং এমনটি করা তার জন্য ফরযও। এমনটি না করলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দীনের ব্যাপারে সে গাফলতি দেখিয়েছে। এরপর তার সন্তানরা যদি ঐসব হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায় (আর বলাবাহুল্য সন্তানদের মায়ের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়) তাহলে সে নিজেও এজন্য দায়ি হবে।

মোহরানা ছাড়া বিয়ে

৪. মোহরানা ছাড়া বিয়ে হতে পারে। তবে ইসলামী ফিকাহর দৃষ্টিতে এ ধরনের বিয়েতে 'মোহরে মেসেল' (অর্থাৎ মা-ফুফুদের যে পরিমাণ মোহরানা ছিলো একই পরিমাণ মোহরানা) স্বতস্ফূর্তভাবে আরোপিত হবে।

নামাযে কসর

৫. দুঃখের বিষয় আরব দেশগুলোর যুব সমাজ নিজেরা দীনের যথেষ্ট জ্ঞান রাখেনা আবার মুজতাহিদ ফকীহগণের কারোর মতামত মেনেও চলেনা। তাই আজকাল তাদের অদ্ভুত সব ইজতিহাদের খবর শুনা যায়। মুসাফিরের ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ এবং এক বর্ণনায় ইমাম মালিক এ মত প্রকাশ করেছেন যে, কোনো মুসাফির কোনো স্থানে চার দিন বা তার চাইতে বেশি দিন অবস্থান করার নিয়ত করলে সে মুকীমে পরিণত হয়। ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আবু হানিফা পনেরো দিনের সীমা নির্ধারণ করেছেন। মুসলিম আলেমদের একজনও এ মত পোষণ করেননা যে, নিজের শহর থেকে বাইরে বের হয়ে অন্য কোনো স্থানে গিয়ে এক ব্যক্তি মাসের পর মাস বছরের পর বছর থাকলেও সে মুসাফির থেকে যাবে এবং কসর করতে থাকবে। তবে ফকীহগণ অবশ্য একটা কথা বলেছেন, তা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কোনো এক স্থানে গিয়ে যদি এমনভাবে অবস্থান করতে

www.icsbook.info

থাকে যে, সব সময় তার সেখান থেকে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং তার অবস্থানের নিয়তও নেই, তাহলে সেখানে সে মাসের পর মাস অবস্থান করলেও কসর করতে থাকবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে পনেরো দিন এবং মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় আঠার দিন কসর করেন (মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ)। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের সেনাবাহিনী আজারবাইজান অভিযানে দু'মাস কসর করতে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

নামাযের কাযা ওয়াজিব

৬. বিস্ময়ের ব্যাপার, এরা নামাযের 'কাযা' মানতেও প্রস্তুত নয়। অথচ অসংখ্য হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত। সকল ফকীহও এ প্রশ্নে একমত। ইসলামের সমগ্র ইতিহাসে এমন একজন ফকীহের সন্ধান পাওয়া যাবেনা যিনি রোযার কাযা ওয়াজিব বলেন, কিন্তু নামাযের কাযা ওয়াজিব মানতে প্রস্তুত নন। বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে অসংখ্য হাদিস হযরত আনাস (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কোনো নামায পড়তে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে এবং নামাযের সময় চলে যায় তাহলে মনে পড়ার বা জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার সেই নামাযটি পড়ে নেয়া উচিত। এ হচ্ছে রসূলের মৌখিত নির্দেশ। এ ব্যাপারে তিনি বাস্তবে কি করেছেন তাও দেখা যাক। আবু সাঈদ খুদরী (রা.), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এবং ইমরান ইবনে হুছাইন (রা.) থেকে বহু ঘটনা মুসনাদে আহমদ, বুখারি, মুসলিম ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ কাযা নামায পড়েছেন। এক সফরে সারা রাত চলার পর রাতের শেষের দিকে কাফেলা এক স্থানে অবস্থান করে। বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সাথে সাথেই সবাই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে। এমনকি সূর্য আকাশের বেশ উপরে উঠে। রোদের ছটায় শরীর উত্তপ্ত হতেই সবাই জেগে উঠে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গেই আযান দেবার ব্যবস্থা করেন এবং জামাতের সাথে ফজরের নামায পড়েন। খন্দকের যুদ্ধে একবার আসরের নামায কাযা হয়। মাগরিবের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পড়ে নেন। আর একদিন ঐ একই যুদ্ধে যুহর, আসর ও মাগরিব কাযা হয়ে যায়। এমন সময় ঐ তিনটি নামায এক সঙ্গে পড়া হয় যখন এশার নামাযের সময় শুরু হতে যাচ্ছিলো। এরপরও কি যে নামাযগুলো কাযা হয়ে গেছে সেগুলো আর পড়তে

www.icsbook.info

হবেনা, সেগুলো মাফ হয়ে গিয়েছে, একথা বলার কোনো অবকাশ আছে? (তরজমানুল কুরআন, জুলাই ১৯৬২)

বাণিজ্যিক শেয়ার ও ভাড়া দেয়া জিনিসের যাকাত

প্রশ্ন : বাণিজ্যিক শেয়ারের যাকাত সম্পর্কে ১৯৬২ সালের জুলাই এবং ১৯৫০ সালের নভেম্বরের তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত আপনার লেখা এ মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে।

ইসলামী আইনের মূলনীতির আলোকে যৌথ কারবারে বিনিয়োগকৃত মূলধনের যাকাত একবার মাত্র আদায় করতে হয়। এই মূলনীতির আলোকে আপনার নভেম্বর ৫০-এর লেখা অনুসারে যদি কোম্পানির কাছ থেকে একত্রে যাকাত আদায় করা হয়, তাহলে ঐ কোম্পানির অংশিদারদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য বাণিজ্যিক শেয়ারের যাকাত আলাদাভাবে আদায় করা উচিত নয়। এ কথাটাও লক্ষণীয় যে, "যে অংশিদার যাকাতযোগ্য পরিমাণের চেয়ে কম শেয়ারের অধিকারী অথবা যে অংশীদার এক বছরের চেয়ে কম সময়ব্যাপী স্বীয় শেয়ারের মালিক থাকে......" তাকে বাদ দিয়ে কোম্পানির কাছ থেকে শেয়ারসমূহ বাবদ যাকাত আদায় করতে হবে। যে অংশিদার কোনো কোম্পানিতে যাকাত যোগ্য পরিমাণের চেয়ে কম শেয়ারের অধিকারী, সে নিজে যাকাতযোগ্য অর্থের অধিকারী কিনা, সেটা জানা প্রায়ই দুরূহ হয়ে থাকে।

এ সমস্যার আর একটা দিক বিবেচনা সাপেক্ষ। অংশিদারদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য শেয়ারের বাবদে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করা এবং কোম্পানির শেয়ারসমূহের বাবদ সমষ্টিগতভাবে যাকাত আদায় করার অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হবে। এমন হতে পারে যে, কোম্পানি স্বীয় বার্ষিক যাকাতের অর্থকে স্বীয় ব্যয়ের একটি স্থায়ী অংশ ধরে নিয়ে সেই অনুপাতে নিজের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবে। কেননা সমগ্র যাকাত লভ্যাংশ থেকেই দেয়া সব সময় সম্ভব হবে, এটি নিশ্চিত নয়। অনুরূপভাবে, যাকাত দেয়ার পরও অংশিদারদেরকে লভ্যাংশ বাবদ কিছু দেয়া যাবে- একথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু অংশিদারদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত দেয়া হলে তা দ্বারা পণ্যমূল্যের উপর এ ধরনের প্রভাব পড়েনা।

তরজমানুল কুরআনের একই সংখ্যায় ২২ পৃষ্ঠায় ভাড়া দেয়া জিনিসকে যাকাতযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এ মত যদি সঠিক হয়, তাহলে ভাড়ায় চালানো ট্যাক্সি, ট্রাক ও বাসের সামগ্রিক মূল্যমানের উপরও এই বিধি

www.icsbook.info

কার্যকর হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি একাধিক বাড়ি ও দোকানের মালিক এবং তার ভাড়া পায়, তার কাছ থেকে বাড়ি ও দোকানসমূহের সামগ্রিক মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগ ট্যাক্স আদায় করা উচিত। এই দু'টো ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমার দু'টো কারণে সংশয় রয়েছে। প্রথমতঃ পূর্বতন মনীষীদের থেকে শুরু করে এ যাবত কেউ ভাড়া দেয়া ঘরবাড়ির সমগ্র মূল্যমানের উপর যাকাত জরুরি হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন বা তদনুযায়ী কাজ করেছেন, এমন কথা শুনিনি। দ্বিতীয়তঃ "কিতাবুল আমওয়াল" গ্রন্থের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় লায়স বিন সা'দের বরাতে যে হাদিস আপনি উদ্ধৃত করেছেন, তাকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা এখানে সঠিক বলে মনে হয়না। ভাড়ার উট ভাড়ায় খাটোনোর কারণে যাকাত দেয়া জরুরি হয় তা নয়, বরং শুধুমাত্র উট হওয়ার কারণেই তা যাকাতযোগ্য। আশা করি সমস্যাটার উপর আরো কিছু আলোকপাত করে এ খট্কা দূর করবেন।

উত্তর : যাকাত সম্পর্কে নভেম্বর, ৫০-এর তরজুমানে যে লেখা ছাপা হয়েছে তা সরকারের প্রশ্নপত্রের জবাব ছিলো। সে জবাব দেয়া হয়েছিল এরূপ ধারণার ভিত্তিতে যে, সরকারি পর্যায়ে কোম্পানির যাকাত আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে জুলাই, ৬২-এর তরজুমানে একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছিল এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, কোম্পানিকে যাকাত দিতে হবেনা, বরং অংশিদারদেরকে নিজ নিজ যাকাত আপন উদ্যোগে দিতে হবে। এই পার্থক্যটা নজরে রেখে আপনি উভয় জবাব পড়ে দেখুন। কোম্পানি যখন যাকাত দিয়ে দেবে তখন এক একজন অংশিদারের আলাদা আলাদাভাবে যাকাত দেয়ার আর প্রশ্নই ওঠেনা। তবে অংশিদাররা ব্যক্তিগতভাবে যাকাতযোগ্য অর্থের অধিকারী কিনা, সেটা অনুসন্ধান করা কোম্পানির পক্ষে দুঃসাধ্য। এটা অংশিদারদেরই দায়িত্ব যে, তারা কোম্পানিকে নিজের যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক না হওয়ার কথা জানাবে, যাতে তাদের জিম্মার যাকাত হিসাবে ধরা না হয়।

যাকাত আদায় করা যদি সরকারের ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত হয়, তাহলে যাকাত আদায়কারীর একথা অজানা থাকা সম্ভব নয় যে, কোম্পানি স্বীয় যাকাত বাবদ প্রদেয় অর্থকে বাণিজ্যিক ব্যয়ের অংশ গণ্য করে পণ্যের দাম বাড়িয়েছে। সরকারি উদ্যোগে এ প্রবণতা রোধ করা সম্ভব। কিন্তু যদি সরকারি ব্যবস্থাপনা না থেকে থাকে তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে শুধু সেই কোম্পানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত দেবে, যার পরিচালকদের কিছু না কিছু ইসলামী চেতনা বিদ্যমান। এরূপ লোকেরা এক হাতে যাকাত দিয়ে অন্য হাতে তা ফেরত নেয়ার ফন্দি আঁটবে বলে মনে হয়না। আর যদিবা তারা এমন করে তবে পরবর্তী বছর তাদের উপর আরো বেশি যাকাত

www.icsbook.info

ধার্য হবে। পুনরায় যদি মূল্য বৃদ্ধি করে তবে যাকাত আবারও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি করা আর সম্ভব হবেনা।

ভাড়ায় খাটানো সম্পদের ব্যাপারে যা লেখা হয়েছিল তা ছিলো সংক্ষিপ্ত। তাই বিষয়টা পরিষ্কার হয়নি। আমার বক্তব্য এই যে, যারা আসবাবপত্র বা মোটরগাড়ি বা এ ধরনের অন্যান্য জিনিস ভাড়ায় খাটানোর ব্যবসা করে তাদের ব্যবসায়ের মূল্যমান ঐ ব্যবসায়ে লব্ধ মুনাফার অনুপাতে নিরূপণ করা হবে। তার অর্থ এ নয় যে, এই ভাড়ায় খাটানো আসবাবপত্র বা মোটর গাড়ির মূল্যের উপর যাকাত ধার্য করা হবে। কেননা এগুলো তো তাদের অর্থোপার্জনের উপকরণ। উপকরণের উপর যাকাত ধার্য হয়না। অর্থাৎ, একটা কারবারে যে মুনাফা অর্জিত হয়, তার ভিত্তিতে স্থির করা হবে যে, এ পরিমাণ মুনাফা অর্জনকারী কারবারের মূল্যমান কি নিরূপিত হওয়া উচিত। আর ভাড়া দেওয়া বাড়ি সম্পর্কে আমারও এজন্য সংশয় রয়েছে যে, অতিতের ফিকাহবিদগণের পক্ষ থেকে এসবের উপর যাকাত ধার্য করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না।

ভাড়ায় খাটা উটের উপর যাকাত ধার্য না হওয়ার কারণ আমি যা বলেছি তাই। অর্থাৎ অর্থোপার্জনের উপকরণ বা প্রাণীর উপর যাকাত আরোপিত হয়না, যেমন হালের বলদ বা পরিবহনের প্রাণী। এগুলোর উপর বিধিবদ্ধ পশুর যাকাত আরোপিত হবেনা। অনুরূপভাবে ডেইরি ফার্মের পশুর উপর যাকাত আরোপিত হবেনা। কেননা এগুলোর দ্বারা যে পণ্য উৎপাদিত হয়, তার উপর যাকাত আরোপিত হওয়ার মাধ্যমেই এগুলোর যাকাত আদায় হয়ে যায়। ভাড়ায় খাটানো উটও অর্থোপার্জনের উপকরণ পদবাচ্য। তাই পশুর যাকাতের বিধির আওতায় অথবা মূল্য নির্ধারণপূর্বক এদের যাকাত আরোপিত হবেনা। বরং এই ভাড়ায় খাটানো ব্যবসায়ের যে বাজারমূল্য নিরূপিত হবে তার উপর যাকাত আরোপিত হবে। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)

প্রশ্ন-২ : বাণিজ্যিক শেয়ার সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণের পরও একটা বিষয় অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। সেটি এই যে, যাকাত আদায়ের দিক দিয়ে এ দু'টি বিকল্প প্রক্রিয়াকে এক পর্যায়ে ফেলা যায়না। শেয়ারহোল্ডারদের নিকট থেকে শেয়ারের বাজারমূল্য অনুপাতে যাকাত আদায় করা অথবা কোম্পানির নিকট থেকে ব্যবসায়ের যাকাত সংক্রান্ত বিধির আলোকে যাকাত আদায় করা- এই উভয় প্রক্রিয়ায় আদায়কৃত যাকাতের পরিমাণে বিরাট পার্থক্য হওয়া অনিবার্য।

যাকাতের হিসাবের এই পার্থক্যের প্রেক্ষাপটে এটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায় যে, উক্ত দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনটি অনুসারে যাকাত আদায় করা হবে, তা নির্দিষ্ট করা হোক।

www.icsbook.info

ভাড়ার ভিত্তিতে পরিচালিত সম্পদের যাকাতের ব্যাপারটাও স্পষ্ট হলোনা। আপনি যে পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব দিয়েছেন, অর্থাৎ কারবারের (goodwill) তথা সুনাম এবং মুনাফার আলোকে তার সামগ্রিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বেশ-ক'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। এ পদ্ধতিতে যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত ন্যূনপক্ষে ঐ সকল জিনিসের সামগ্রিক মূল্যের সমান এবং কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি হবে। কেননা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যদি প্রাচীন ও ভালো হয়ে থাকে তাহলে সুনামের (goodwill) মূল্য বিপুল হবে। দ্বিতীয়ত: এই পদ্ধতি অবলম্বনের শরিয়তসম্মত যুক্তি কি? নৌকা, ভারবাহী পশু, বাড়ি ও দোকান ইত্যাদির ভাড়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া সুপ্রাচীন প্রথা। অথচ এসব সম্পর্কে প্রাচীন ফিকাহবিদদের পক্ষ থেকে এ জাতীয় কোনো ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা যায়না। তৃতীয়ত: শরিয়ত কতিপয় বোধগম্য কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্পদে পার্থক্য স্বীকার করেছে এবং অপ্রকাশ্য সম্পদের পরিমাণ ঘোষণার দায়িত্ব সম্পদের মালিকের হাতে অর্পণ করেছে। যাকাত আদায়কারী ও ভাড়ায় খাটানোর কারবারের মালিকের মধ্যে যদি এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে মীমাংসা কিভাবে হবে?

আশা করি, বিষয়টির এ সকল দিক বিবেচনা করত: নিজ মতামত ব্যক্ত করবেন।

উত্তর : যৌথ কারবারের যাকাতের ব্যাপারে দু'টো অবস্থাই সম্ভব। হয় ইসলামী সরকার থাকবে এবং যাকাত আদায়ের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা কোনো সামষ্টিক ব্যবস্থা থাকবেনা এবং দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তিবর্গকে স্বউদ্যোগে যাকাত প্রদান করতে হবে। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় কোম্পানির যাবতীয় হিসাবপত্র পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে এবং যেসব আসবাবপত্র যাকাতযোগ্য নয়, তা হিসাব বহির্ভূত রাখতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় অংশীদার ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এ ধরনের হিসাব জানা কঠিন ব্যাপার। তারা যে নিজ নিজ বিনিয়োগকৃত মূলধনের যাকাতই বের করবে, এটা স্বাভাবিক।

ভাড়ার কারবারে যাকাতের ব্যাপারটা খুবই জটিল। এতে একাধিক মৌলিক বিধিগত সমস্যা যে রয়েছে তা আমিও নিজেও অনুভব করি। এ ক্ষেত্রে হাদিস বা সাহাবায়ে কেরামের এমন কোনো কথা বা কাজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না যা দ্বারা কোনো সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করা যায়। এখানে একটা বড় সমস্যা এই যে, যে জিনিসকে ভাড়ায় খাটানো হয় তা বাণিজ্য পণ্যের সংজ্ঞায় পড়েনা। বরং তা উৎপাদনের উপকরণের সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। এজন্য তার মূল্যের উপর যাকাত আরোপ করা সঠিক মনে হয়না। আর এটা বাদ দেওয়ার পর এই কারবারে বছর

www.icsbook.info

শেষে "নগদ অর্থ" (Cash in Hand) অথবা ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকেনা, যার উপর যাকাত আরোপ করা যায়। অথচ কারবারটা লক্ষ লক্ষ টাকার। বর্তমানে তো এ ধরনের কারবার ব্যাপকভাবে চলছে। এ কারণে আমি কারবারের সামগ্রিক মূল্য নির্ণয় করে যাকাত দেয়ার ফর্মূলা উদ্ভাবন করেছি। তবে এটা সম্পূর্ণ ইজতিহাদ প্রসূত জিনিস। এ নিয়ে অন্যান্য আলেমদেরও ভেবে দেখতে হবে।

প্রকাশ্য সম্পদ ও অপ্রকাশ্য সম্পদে পার্থক্য দেখিয়ে আপনি যে আপত্তি তুলেছেন, তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো সম্পদ গোপন সম্পদ কিনা তা নিয়ে যদি মতভেদ ঘটে অথবা সম্পদের মালিক যে জিনিসকে গোপন সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে, যাকাত আদায়কারী যদি তা না মানে, তাহলে এ উভয় বিরোধের মীমাংসা একটা নিরপেক্ষ আদালত করতে সক্ষম। এটা এমন কোনো জটিলতা নয়, যার সুরাহা করা যায়না। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)

শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রাইজবন্ড

প্রশ্ন : আজকাল সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যমূলক ঋণ গ্রহণের জন্য প্রাইজবন্ড জারি করা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করা এবং আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার লাভ করা জায়েয কিনা? বাহ্যত মনে হয় এটা জুয়া নয়। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির ঋণ হিসেবে প্রদত্ত আসল টাকা জমা আছে। তা পরে পাওয়া যাবে। বন্ডদাতা পরবর্তীকালে যখন এ টাকা ফেরত পাবে তখন তার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধিও ঘটবেনা, যাকে সুদ বলা যায়। মেহেরবানী করে এ ব্যবসাটি শরিয়তের দিক দিয়ে কোন্ পর্যায়ের তা জানাবেন। কারণ অনেকেই এ ব্যাপারে দ্বিধার মধ্যে রয়েছে।

উত্তর : প্রাইজবন্ডের ব্যাপারে যথার্থই বলা যায়, সরকার বিভিন্ন সময় নিজের বিভিন্ন কাজ করার জন্য জনগণের কাছ থেকে যে ঋণ নেয় এবং তাতে সুদ দেয় এও ঠিক সেই ধরনেরই একটা ঋণ। পার্থক্য শুধু এতোটুকু   ওসব ঋণে ঋণদাতাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সুদ দেয়া হয় আর এ ঋণে সমস্ত টাকার সুদ এক জায়গায় জমা করে মাত্র কয়েকজন ঋণদাতাকে বড় বড় পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। আর এ "পুরস্কার" কাদেরকে দেয়া হবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য লটারী করা হয়। ওসব ঋণ প্রত্যেক ঋণদাতাকে সুদের লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে ঋণ নেয়া হয় আর এখানে এর পরিবর্তে প্রত্যেককে লোভ দেখানো হয়- 'হয়তো হাজার হাজার টাকার পুরস্কার তুমিই পাবে, কাজেই একবার ভাগ্যটা পরীক্ষা করে দেখো।'

www.icsbook.info

এ পরিস্থিতি সুস্পষ্ট ভাষায় একথা ব্যক্ত করছে যে, এর মধ্যে সুদ আছে এবং জুয়ার গন্ধও। যে ব্যক্তি এ ঋণপত্র কেনে সে প্রথমত সুদ আছে জেনেই এ ধরনের কাজে নিজের টাকা ঋণ দেয়। দ্বিতীয়ত যার নামে "পুরস্কার" উঠে সে আসলে পুরস্কার হিসেবে সেই একত্রিত সুদের টাকা পায় যা সুদী কারবারে প্রত্যেক ঋণদাতা পৃথক পৃথকভাবে লাভ করতো। তৃতীয়ত যে ব্যক্তিই এ ঋণপত্র কেনে সে নিছক ঋণ দেয়না, বরং এই লোভের বশবর্তী হয়ে ঋণ দেয় যে, আসল টাকার চাইতে অনেক বেশি সে "পুরস্কার" হিসেবে পাবে। আর এ লোভ দেখিয়ে ঋণ গ্রহণকারীও তাকে ঋণ দানে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই এক্ষেত্রে সুদী লেন-দেনেরই নিয়ত করা হয়। চতুর্থত সুদের একত্রিত অর্থ "পুরস্কার" আকারে ঋণদাতা লাভ করে এমন পদ্ধতিতে যাতে লটারীতে লোকদের নামে পুরস্কার বের হয়। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, লটারীতে পুরস্কার লাভ করার ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভকারী ছাড়া বাকি সবার টিকিটের টাকা মারা যায় এবং সবার টিকিটের টাকা একজন পুরস্কার লাভকারী পেয়ে যায়। আর এখানে পুরস্কার লাভকারী ছাড়া বাকি সকল ঋণদাতার ঋণের আসল টাকা মারা যায়না। কেবল সেই সুদের টাকাটুকু মারা যায়, যা প্রত্যেক ঋণদাতা তার ঋণের টাকার সাথে পায়। বরং লটারীর মাধ্যমে নাম উঠে আসার আকস্মিক ঘটনা তাদের সবার অংশের সুদকে একজন বা কয়েকজনের কাছে পৌঁছাবার মাধ্যমে পরিণত হয়। এজন্য এটা প্রকৃত জুয়া না হলেও এর মধ্যে জুয়ার গন্ধ ও প্রাণসত্তা রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬৩)

www.icsbook.info

বিবিধ প্রসঙ্গ

কতিপয় ফিকহী ও আকীদাগত বিরোধ এবং তার ধরন

প্রশ্ন : কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিষয়ে প্রশ্ন পাঠাচ্ছি। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে আশ্বস্ত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ক. শয়তান ও 'নফসে আম্মারা' (কুপ্ররোচনাদায়ক প্রবৃত্তি) থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কি কি শরিয়তসম্মত নীতি ও বিধি অবলম্বন করা উচিত, যাতে ঈমানের মজা পাওয়া যায় এবং কুফরী ও নাফরমানীর প্রতি মন বিরূপ হয়। মাতৃভাষায় 'দোয়া দরূদ'ও কি এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে?

খ. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী যদি ইসলামের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং তা থেকে ইসলামী আইনের বিধিমালা রচনা করা যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর জীবদ্দশায় এ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হলোনা কেন?

গ. একথা সর্বজনবিদিত এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামী গ্রন্থাবলী অনন্তর কিয়াস ইজতিহাদের বিরুদ্ধে ইবনে হাজমের আক্রমণ থেকেও এটা সমর্থিত হয় যে, তিনি ইমাম দাউদ জাহেরী এবং তাদের অনুসারীগণ ইজতিহাদ, ইসতিমবাত, কিয়াস ও ইসতিহ্সানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং ইবনে হাজমের গ্রন্থাবলী থেকে এও জানা যায় যে, তিনি নিজেও ইজতিহাদে অভ্যস্ত। জিজ্ঞাসা এই যে, আসল ব্যাপার কি? এটা কি কেবল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পার্থক্য না আসলেই তিনি ইজতিহাদের বিরোধী? তা যদি হয় তাহলে তাঁর নিজের ইজতিহাদের ব্যাখ্যা ও পটভূমি কি?

ঘ. শিয়াদের হাদিস গ্রন্থাবলী ও তার লেখকদের মান কিরূপ?

ঙ. হাদিসকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে সর্বপ্রথম কে অস্বীকার করেছিল। এই অস্বীকৃতির ধরন ও কারণ কি ছিলো?

উত্তর : আপনার কথামত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি :

ক. নফসে আম্মারা থেকে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র কার্যকর উপায় এই যে, সর্বদা আল্লাহর ভয় মনে জাগরুক রেখে আত্মসমালোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। মাতৃভাষায় দোয়া-দরূদ এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে দুটো শর্তে প্রথমত দোয়া উচ্চারণের সাথে সাথে তা নিয়ে চিন্তা এবং ধ্যানও চালিয়ে যেতে হবে।

www.icsbook.info

দ্বিতীয়ত বিদআত তথা মনগড়া দোয়া-দরূদ পড়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদিস থেকে প্রাপ্ত দোয়া-দরূদ পড়তে হবে।

খ. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ না করার কারণ বুঝতে হলে তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরি। সে সময়ে লিখতে ও পড়তে জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিলো, আর লেখার উপকরণ ছিলো আরো দুর্লভ। আপনি তো জানেন যে, কুরআনকে লিপিবদ্ধ করার জন্যও খেজুরের পাতা, গাছের ছাল ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। রসূল (সা.)-এর সাথে সবসময় একজন লেখক কাগজ-কলম নিয়ে লেগে থাকবে এবং তাঁর প্রতিটি তৎপরতা লিপিবদ্ধ করতে থাকবে, এটা কিভাবে সম্ভব? একজন মানুষের সাথে স্বদেশে-বিদেশে, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বদা লেখকরা লেগে থাকবে এবং প্রত্যেকটা কথা, কাজ, নীরবতা ও নিষ্ক্রীয়তা ইত্যাদি লিখতে থাকবে, এটা আসলেই কিছুটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, লিপিবদ্ধ করার কাজটা একবার বাধ্যতামূলক করে দিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথা ও কাজকে বাদ দেয়া সম্ভব হতোনা। অথচ সকল কথা ও কাজ পুরোপুরিভাবে লিপিবদ্ধ করা কার্যত: সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিলো। তাঁর সকল কথা ও কাজ যে অকাট্য দলিল, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আসলে সে রকম হওয়াও উচিত। কিন্তু অকাট্য দলিল হলেই যে প্রতিটি জিনিস প্রতি মুহূর্তে লিখে রাখতে হবে এটা কবে থেকে বাধ্যতামূলক হলো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কাজ ও কথাকে সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক অকাট্য দলিল মানার ব্যাপারটা যখন প্রমাণিত, তখন এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত যে, তারা তাঁর প্রত্যেকটা আচরণকে মনোযোগ সহকারে দেখতেন ও শুনতেন, পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে তারা সেসব কাজ ও কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখতেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কোন্ বিষয়টা সমর্থিত এবং কোন্টা সমর্থিত নয়। রসূলের সুন্নতকে সংরক্ষণের জন্য এটাই ছিলো স্বাভাবিক পন্থা এবং উম্মত এ পন্থাই অবলম্বন করেছে। কুরআন তো একটা লেখার যোগ্য জিনিস ছিলো এবং সংক্ষিপ্ত ছিলো। তাই তা লিখে রাখা হয়েছে। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের জীবনের ঘটনাবলী, কার্যকলাপ এবং যে পরিবেশে তিনি এসব কাজ সম্পন্ন করেছেন, তা সংঘটিত হওয়া মাত্রই লিখে ফেলা অসম্ভব ছিলো। সংঘটিত হওয়ার সময় তো এসব ব্যাপার কেবল মনমগজে ও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করাই সম্ভব ছিলো এবং দর্শকরা শ্রোতাদের কাছে কেবল মৌখিকভাবেই

www.icsbook.info

পৌঁছাতে সক্ষম ছিলো। বৃহত্তর মানবগোষ্ঠির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, অটুট ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবং প্রতিটি ছোট বড় বিষয়কে অবিকলভাবে সংরক্ষণ করে এ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলতে থাকে। অবশেষে একদিন নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম ও উপায় উপকরণ সংগৃহীত হলো এবং সংগৃহীত হওয়া মাত্রই সুন্নতের এই বিশাল ও বিপুল ভাণ্ডার স্মৃতি থেকে কাগজে স্থানান্তরিত হলো।

গ. ইজতিহাদ, ইসতিমবাত, কিয়াস ও ইসতিহসান এমন জিনিস যা কোনক্রমেই এড়িয়ে চলার উপায় নেই। কুরআন ও হাদিসে কিছু বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। ঐসব সীমিত বিধানকে মানুষের সীমাহীন সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে গেলেই এসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। কার্যত: এসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাবে কিনা, আসল মতভেদ তা নিয়ে দেখা দেয়নি। বরং এসব প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাত্রা নিয়েই মতভেদ ঘটেছে। ক্ষেত্রবিশেষে এসব পরিভাষার মর্ম বা ব্যাখ্যা নিয়েও মতান্তর হয়েছে। একজন আর একজনের ব্যাখ্যার সমালোচনা করলেই রাষ্ট্র হয়ে যায় যে, অমুক এ জিনিসটাই স্বীকার করেনা। এক ব্যক্তি ইজতিহাদ ও কিয়াস ইত্যাদির ব্যাপক প্রয়োগের পক্ষপাতী। অপর ব্যক্তি এতে এমন ভঙ্গীতে আপত্তি জানায় যে, মনে হয়, সে ঐ জিনিসের ব্যাপক প্রয়োগেই শুধু আপত্তি তুলছেনা, বরং সে আদৌ তা প্রয়োগ করারই পক্ষপাতী নয়। এই ক'টি কথা মনে রাখতে আপনি ইমাম দাউদ জাহেরী ও ইবনে হাজমের অনুসৃত নীতি, ইজতিহাদপন্থী ও আহলে হাদিসের মতভেদ এবং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের ইসতিহসান ও মাসালেহে মুরছালা সংক্রান্ত বিতর্কের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন।

ঘ. শিয়াদের ফিকাহ ও হাদিস নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করা ছাড়া এ সম্পর্কে বিশদভাবে ও সূক্ষ্মভাবে কোনো মত স্থির করা কঠিন ব্যাপার। মোটামুটিভাবে এতোটুকু বলা যায় যে, আমাদের হাদিসের কিতাবাদি ও তাদের হাদিসের কিতাবাদিতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য এই যে, তারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'আহলে বাইত' (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারভুক্ত লোকজন)-এর বর্ণিত হাদিসের উপর নির্ভর করে থাকে। আর এই আহলে বাইত সম্পর্কেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমরা যারা আহলে সুন্নত, তারা আহলে বাইতসহ সকল সাহাবির হাদিস গ্রহণ করি। তাছাড়া শিয়াদের হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে অভ্যস্ত এবং ধ্যান ধারণায় তারা মাত্রাতিরিক্ত গোঁড়া ও

www.icsbook.info

চরমপন্থী। এজন্য ঘটনাবলীকে তারা নিজস্ব বিশেষ ঝোঁকপ্রবণতার রঙে রঞ্জিত করে ফেলেছে।

ঙ. মনে হয়, হাদিসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে সর্বপ্রথম অস্বীকার করেছিল খারেজী ও মুতাজিলাদের গোষ্ঠী। খারেজীরা এজন্য হাদিস অস্বীকার করে যে, তাদের অনুসৃত নীতি ও চিন্তাধারার অধিকাংশ বিষয় হাদিসের বিরোধী ছিলো। আর মুতাজিলাদের অস্বীকার করার কারণ এই যে, অন্যান্য বাতিল ধর্ম ও দর্শনের অনুসারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হতে তারা ইসলাম ও তার আকীদা বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি প্রমাণকে অপরিহার্য মনে করে নিয়েছিল, তার বেশির ভাগ হাদিসের সাথে সংঘর্ষশীল ছিলো। অনুরূপভাবে ক্রমাগত বিতর্কের পর তারা ইসলামের আকীদা বিশ্বাসকে যেরূপ দিয়েছিল তাও হাদিস মুতাবেক ছিলনা। কতিপয় হাদিস দ্বারা সত্য বলে সাব্যস্ত বিষয়গুলোকে তারা যুক্তিনির্ভর বিতর্কের মাধ্যমে সত্য বলে সাব্যস্ত করার কোনো পথ খুঁজে পেতো না। নিজেদের যুক্তিভিত্তিক ধ্যান ধারণার কারণে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত নিয়েও তারা এ ধরনের সমস্যায় পড়তো। অথচ কুরআনকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিলনা। এজন্য তারা আয়াতগুলোর উদ্ভট ও কৌতুকপ্রদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এবং হাদিসগুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। (তরজমানুল কুরআন, জমাদিউস সানী ১৩৭৩ হি:, মার্চ ১৯৫৪)

মুজাদ্দিদ এবং অহি ও কাশ্‌ফ

প্রশ্ন তরজমানুল কুরআন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ ঈসায়ী সংখ্যার ২২৬ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে আপনি লিখেছেন :

"নিঃসন্দেহে অতীতের কোনো কোনো বুযুর্গ নিজের সম্পর্কে কাশ্‌ফ ও ইলহামের তরীকায় এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা নিজ যুগের মুজাদ্দিদ। কিন্তু তারা এ অর্থে দাবি করেননি যে, তাদেরকে মুজাদ্দিদ স্বীকার করে নেয়া অবশ্য কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি তাদের মুজাদ্দিদ স্বীকার করবেনা সে গুমরাহ।"

আপনার এ বক্তব্য সঠিক মনে হয়না। কারণ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.) তাঁর তাফহীমাতে ইলাহিয়া গ্রন্থে অত্যন্ত জোরের সাথে এ দাবি করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তুমি এ যামানার ইমাম। তোমার অনুসরণকে মুক্তির উপায় মনে করা লোকদের কর্তব্য। তিনি লিখেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা আমার ও আমার যামানার লোকদের উপর অনুগ্রহ করে আমাকে এমন একটি আচরণ পদ্ধতি দান করেছেন যা সকল তরীকার নিকটতর। এতে পাঁচ প্রকার নৈকট্যের উপায় রয়েছে। এক. প্রকৃত ঈমানের নৈকট্য, দুই.

www.icsbook.info

নফলসমূহের নৈকট্য, তিন. ওয়াজিবসমূহের নৈকট্য, চার. ফরযসমূহের নৈকট্য, পাঁচ. মালাকৃতের নৈকট্য। এটাকে তিনি এমন এক উত্তমপন্থা বানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তিই তা অবলম্বন করবে, লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আমার রব আমাকে অবগত করিয়েছেন যে; আমি তোমাকে এ তরীকার ইমাম মনোনীত করেছি, এর উচ্চ শিখরে সমাসীন করেছি এবং আজ থেকে অন্য সকল তরীকার দ্বারা নৈকট্যের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি। কেবল তোমাকে প্রদত্ত এ তরীকাকেই খোলা রেখে দিয়েছি। এখন লোকদের কর্তব্য হলো তোমাকে মহব্বত করা এবং তোমার অনুসরণ অনুবর্তনকে নাজাতের উপায় মনে করা। এখন থেকে আর ঐ ব্যক্তির উপর আসমানী বরকত হবেনা যে তোমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করলো এবং তোমার সাথে দুশমনী করলো। এমন ব্যক্তি যমীনের বরকতও লাভ করবেনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকদেরকে তোমার প্রজা বানিয়ে দিয়েছি। তোমাকে তাদের বাদশাহ নিয়োগ করেছি। লোকেরা তোমার এ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হোক কিংবা না হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। অবগত হলে কামিয়াব হবে। আর অবগত না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আসালু মুসাফফা ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫)

শাহ্ সাহেবের উপরোক্ত দাবি সঠিক ছিলো কিনা? যদি তাঁর দাবি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তরজমানুল কুরআনের উল্লেখিত বাক্য সঠিক নয়। অতপর আপনি তরজমানুল কুরআনে লিখেছেন "দাবি করে তা মেনে নেয়ার জন্যে দাওয়াত দেয়া এবং তা মানানোর কোশেশ করা কোনো মুজাদ্দিদের কাজ নয়।"

আপনি আরো লিখেছেন : "যে এ ধরনের কাজ করে সে তার একাজ দ্বারাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে সে মুজাদ্দিদ নয়।"

আপনার এসব কথার ভিত্তি কি কুরআন মজীদ, নাকি হাদিসে নববী, নাকি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ ফতোয়া দিয়েছেন?

পত্রিকাটির উক্ত সংখ্যায় আপনি আরো লিখেছেন "কাশ্ফ ও ইল্হাম অহির মতো কোনো নিশ্চিত জিনিস নয়। এগুলোর অবস্থা এমন নয় যে, ব্যক্তি সূর্যালোকের মতো একথা জানতে পারবে যে, এ কাশ্ফ ও ইলহাম আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকেই হচ্ছে।"

উম্মতে মুহাম্মদীর কামিলগণের ইলহাম ও কাশ্ফের অবস্থা যদি এই হয়, তবে তাদের 'খায়রে উম্মত' হওয়ার অবস্থা তো বুঝা গেলো। অথচ অতীত উম্মতের মহিলাগণ পর্যন্ত নিশ্চিত অহি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আল্লাহর এমন বান্দাও ছিলেন যার কাশ্ফ ও ইলহাম এমন উচ্চ মর্যাদার ছিলো

www.icsbook.info

যে, একজন 'উলুল আয্‌ম্‌' নবীকে পর্যন্ত প্রশ্ন করে লজ্জায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীর কামিল ব্যক্তিগণের কাশ্‌ফ ও ইলহাম তো আশ্চর্য ধরনের যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলো কিনা সে ব্যাপারে তারা নিজেরাই নিশ্চিত ছিলেননা! তাহলে তাদেরকে এরূপ কাশ্‌ফ ও ইলহাম দেখাবার কি প্রয়োজন আল্লাহর পড়েছিল, যার মধ্যে কোনো দীনি কল্যাণের ধারণা ছিলোনা। তাছাড়া তা কাশ্‌ফ ও ইলহাম ওয়ালার ঈমান বৃদ্ধির কারণ তো নয়ই বরঞ্চ উল্টো সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার ফলে তা ছিলো তার এক প্রকার মুসীবতের কারণ।

উত্তর আপনার পত্র থেকে বুঝা যাচ্ছে, আপনি অহি এবং ইলহামের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। এক প্রকার অহিকে 'অহিয়ে জিবিল্লী' বা 'তিবীয়ী' (প্রাকৃতিক অহি) বলা যেতে পারে এ অহির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে তার কর্তব্য কাজ শিখিয়ে দেন। মানুষের চাইতে এ অহি জীব-জন্তুর উপর অধিক মাত্রায় এবং সম্ভবত তার চাইতেও অধিক মাত্রায় উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের উপর নাযিল হয়। দ্বিতীয় প্রকারের অহিকে বলা যেতে পারে 'অহিয়ে জুয্‌য়ী' (আংশিক অহি)। এরি মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো বান্দাকে জীবন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অবস্থায় জ্ঞান বা হিদায়াত দান করেন, অথবা কোনো কৌশল শিক্ষা দেন। এ অহি প্রতিদিন সাধারণ মানুষের উপর নাযিল হতে থাকে। পৃথিবীর যতো বড় বড় আবিষ্কার তা সবই এ অহির মাধ্যমে সংঘটিত হয়। বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনসমূহ এ অহির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ অহিরই কার্যকর ভূমিকা থাকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পিছনে। দেখা যায় বড় বড় ঘটনা প্রবাহের মধ্যে চিন্তা ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ কোনো একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে গেছে এবং ইতিহাসের গতি প্রবাহের উপর তা সিদ্ধান্তকারী প্রভাব বিস্তার করেছে। এরূপ অহিই নাযিল হয়েছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের উপর। এ দু'ধরনের অহি থেকে ভিন্ন ধরনে আরেক প্রকার অহি আছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার কোনো বান্দাকে অদৃশ্য জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁকে হিদায়াত দান করেন, যেনো তিনি এ জ্ঞান ও হিদায়াত সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেন এবং তাদের অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন। শুধুমাত্র নবীদের উপরই এ অহি অবতীর্ণ হয়। কুরআন পাক থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, এ ধরনের জ্ঞানের নাম ইলকা, ইলহাম, কাশ্‌ফ কিংবা পারিভাষিক অর্থে অহি- যাই রাখা হোক না কেন রসূল ও আম্বিয়ায়ে কিরাম ছাড়া অপর কাউকেও তা দেয়া হয়না। আর এ জ্ঞান কেবল আম্বিয়ায়ে

www.icsbook.info

কিরামকে এমন পর্যায়ে দেয়া হয় যার ফলে তাঁরা পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে যান যে, এ জ্ঞান আল্লাহরই পক্ষ থেকে এসেছে, শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। তাছাড়া এ জ্ঞানই শরিয়তের 'প্রামাণ্য দলিল'-হুজ্জত। এর আনুগত্য করা প্রতিটি মানুষের জন্যে অবশ্য কর্তব্য-ফরয। আর নবীগণ এরই প্রতি সমস্ত মানুষকে ঈমান আনার দাওয়াত দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এটাই হলো সেই অহি, পরকালীন মুক্তির জন্যে যার প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য শর্ত, আর যার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পরকালীন ধ্বংস অনিবার্য করে দেয়।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অপর কোনো মানুষকে এই তৃতীয় ধরনের অহির কোনো অংশ যদি দান করা হয়, তবে তা এতোটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের পর্যায়ে থাকে যাকে পুরোপুরি অনুধাবনের জন্যে নবুয়্যতের অহির আলোকের সাহায্য গ্রহণ করা (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তার ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি যাচাই করা এবং অভ্রান্ত হলে তার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা) অপরিহার্য। কেউ যদি নিজের ইলহামকে হিদায়াতের একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম মনে করে এবং সেটাকে নবুয়্যতের অহির মানদণ্ডে যাঁচাই না করেই নিজে সে অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে এবং অন্যদেরকেও তার অনুসরণ করার আহ্বান জানায়, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তার এহেন কাজের কোনো বৈধতা স্বীকৃত হতে পারেনা। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সূরা আল জিনের শেষ আয়াতে ব্যাপারটি একেবারে খোলাখুলি বলে দেয়া হয়েছে :

"তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। নিজের গায়েব সম্পর্কে কাউকেও জ্ঞাত করেননা। তবে কেবলমাত্র সেই রসূলকে জ্ঞাত করেন যাকে তিনি গায়েবের কোনো জ্ঞান দানের জন্যে মনোনীত করেন। তখন তিনি তার সামনে পিছনে সংরক্ষক নিযুক্ত করেন, যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা তাঁদের রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছে। আর তিনি তাদের সমগ্র পরিবেশ ঘিরে আছেন আর প্রতিটি বস্তু গুণে রেখেছেন।"

উম্মতের মুজাদ্দিদগণকে কেনো নবীর সমপর্যায়ের কাশ্‌ফ ও ইলহাম দেয়া হয়নি এবং কেনো তাদের এর চাইতে নিম্নমানের এমন ধরনের অনুগত ও অধীন কাশ্‌ফ ও ইলহাম দেয়া হয়েছে, ক্ষণিক চিন্তা করলেই সহজে এর কারণ অনুধাবনে আসতে পারে। প্রথম জিনিসটি না দেবার কারণ হচ্ছে, এটাই নবী ও উম্মতের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা সংরক্ষণ করে। এ সীমারেখা কোনোক্রমেই উঠিয়ে দেয়া যেতে পারেনা। আর পরেরটি দেয়ার কারণ হলো, যারা নবীর পরে তাঁর কাজকে জারি রাখার প্রচেষ্টা চালাবেন, তাঁরা দীনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে

www.icsbook.info

বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এবং দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশ লাভের মুখাপেক্ষী হন। অচেতনভাবে দীনের প্রত্যেক একনিষ্ঠ ও নির্ভুল চিন্তার অধিকারী খাদেমকে তো এ জিনিসটি দান করা হয়েই থাকে। আর কাউকেও যদি সচেতনতার সাথে এ জিনিসটি দান করা হয়, তবে তা আল্লাহ তায়ালার পুরস্কার।

কুরআনের দৃষ্টিতে এ মর্যাদা কেবল একজন নবীই লাভ করে থাকেন যে, শরিয়ত প্রণয়নের জন্যে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হন এবং জগদ্বাসীকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর আনুগত্যের আহ্বান জানানোর বৈধ কর্তৃপক্ষ মনোনীত হন। এমনকি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে কাফির হয়ে যায়। দীন ইসলামের কাঠামোর মধ্যে নবী ছাড়া অন্য কেউ এ মর্যাদা লাভ করেননা। কেউ যদি এরূপ মর্যাদার দাবি করে থাকেন তবে তার দাবির সপক্ষে দলিল প্রমাণ তারই পেশ করা উচিত। এ দায়িত্ব আমাদের নয় যে, আমরা তার দাবি অসত্য হওয়ার দলিল প্রমাণ পেশ করবো। এটা বলে দেয়া তারই দায়িত্ব যে, কুরআন ও হাদিসের কোন্‌খানে নবী ছাড়া অন্য কারো জন্যে এ মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে যার ভিত্তিতে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে দাবি করতে পারেন এবং এ দাবি মেনে নেয়ার জন্যে জনগণকে আহ্বান করতে পারেন? আর যে তার এ দাবি মেনে নেবে না সে কেবল একারণেই কাফির এবং জাহান্নামী হবে?

কেউ যদি "মানইউজাদ্দিদু লাহা দীনাহা...." হাদিসটিকে কিংবা মাহদীর আগমন সংক্রান্ত হাদিসসমূহকে এ ধরনের দাবির সপক্ষে পেশ করতে চায়, তবে তার জবাব হলো, এসব হাদিসে কোথাও মুজাদ্দিদ কিংবা মাহদীর পদমর্যাদাকে সেই মর্যাদার সমকক্ষ বলা হয়নি, যার আলোচনা এখানে হচ্ছে। এসব হাদিসের কোন্‌খানে একথা লেখা হয়েছে যে, এ লোকেরা নিজেদের মুজাদ্দিদ এবং মাহদী হবার দাবি করবেন? যারা তাদের দাবি স্বীকার করবে তারাই মুসলমান থাকবে আর বাকিরা সব কাফির হয়ে যাবে?

এখানে একথা টেনে আনাও হাস্যোম্পদ হবে যে, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে দীনের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার কাজ করছে তার সহযোগিতা না করা কিংবা তার বিরোধিতা করা কিভাবে নাজাতের উপায় হতে পারে? নিঃসন্দেহে এ ধরনের কাজ যেখানেই এবং যখনই হয়, তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয় আর তখন কোনো ব্যক্তির সত্যপন্থী হওয়ার পরিচয় এটাই যে, তিনি এ ধরনের কাজের সাথি হয়ে যাবেন। কিন্তু এই ধরনের পার্থক্যের ভিত্তি মূলতঃ এই যে, কোনো

www.icsbook.info

দাবিদার ব্যক্তি দীনের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার দাবি করলেন এবং তার দাবি মেনে নেয়াটাই ঈমানের দাবি আর শুধুমাত্র তার মুজাদ্দিদ ও মাহদী হবার দাবিকে অস্বীকার করার কারণেই একজন মুসলমান নাজাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

এবার শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) এবং মুজাদ্দিদে সরহিন্দী (রহ.) এর দাবি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, উভয় বুযুর্গের যাবতীয় ইসলাহ ও সংস্কারের অবদান ও কর্মকাণ্ডসমূহকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও একথা বলা ছাড়া উপায় নেই যে, তাঁদের নিজেদের মুজাদ্দিদ হবার দাবি করা এবং নিজেদের বক্তব্যকে বারবার কাশ্‌ফ ও ইলহামের সূত্রে পেশ করাটা তাঁদের এ দাবি পরবর্তীকালে অনেক অযোগ্য লোকদের বিভিন্ন প্রকার দাবি করার এবং উম্মতের মধ্যে নতুন নতুন ফিতনা দাঁড় করানোর সাহস যুগিয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন কাজের কোনো খিদমত আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক লাভ করে থাকেন তবে তাঁর উচিত সে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাওয়া এবং একাজে তাঁর মর্যাদা নির্ণয়ের ভার আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়া। কোনো ব্যক্তির প্রকৃত মর্যাদা তো তাই, যা আল্লাহ তায়ালা আখিরাতে তাঁর নিয়ত ও আমল দেখে এবং মেহেরবানী করে তা কুবল করে তাঁকে দান করবেন। তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সেটা নয় যা সে নিজে দাবি করে কিংবা লোকেরা তাকে দিয়ে থাকে নিজের জন্যে লকব ও উপাধি নির্ধারণ করা এবং দাবি করে সেগুলো বয়ান করা এবং নিজের মর্যাদার কথা নিজ জবানে আলোচনা করা কোনো ভালো কাজ নয়। উত্তরকালে সুফিবাদী জযবা তো এটাকে এতোটা সহ্য করে নিয়েছে যে, তা এখন সুস্বাদু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বড় বড় ব্যক্তিরা পর্যন্ত এ কাজে কোনো দোষ অনুভব করেননা। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে এ ধরনের কাজ মোটেই নযরে পড়েনা।

আমরা শাহ সাহেব (রহ.) এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের (রহ.) কাজের সীমাহীন কদর করি এবং আমাদের অন্তরে তাঁদের প্রতি তাঁদের কোনো মু'তাকিদের চাইতে কম শ্রদ্ধা বর্তমান নেই। কিন্তু তাঁদের যে ক'টি কাজে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি তন্মধ্যে একটি হলো এটি। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোনো কথাকে আমরা এজন্যে মেনে নেইনি যে, তাঁরা তা কাশ্‌ফ এবং ইলহামের ভিত্তিতে বলেছেন, বরং তাঁদের যে কথাই আমরা মেনে নিয়েছি তা কেবল এজন্যেই যে, তার পিছনে মজবুত দলিল প্রমাণ রয়েছে, কিংবা কথাটি বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে সঠিক মনে হয়। একইভাবে আমরা যে তাঁদের মুজাদ্দিদ বলে মানি তা আমাদের একটি মত যা তাঁদের অবদান ও কর্মকাণ্ড দেখে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি, তাদের মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবির ভিত্তিতে গৃহীত আকীদা নয়। (তরজমানুল কুরআন : সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ ইং)

www.icsbook.info

অনুকরণ ও অন্ধ অনুকরণ

প্রশ্ন 'জায়েযা' নামক একখানা পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্নের জবাবে আপনার নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আমার মতে একজন আলেমের পক্ষে 'তাকলিদ' করা শুধু অবৈধ ও গুনাহর কাজ নয়, বরং তার চেয়েও মারাত্মক।" এখন ভেবে দেখুন যে, হযরত সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানি, ইমাম গাজ্জালী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর মত ব্যক্তিগত সকলেই 'তাকলিদ' করতেন। আপনার উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে এই ব্যক্তিবর্গ কি ব্যতিক্রম? আপনার মতে কি তাঁরা আলেম নন? আশা করি আপনি ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজ হাতে জবাব লিখবেন।

উত্তর : আপনার হয়তো জানা নেই যে, 'জায়েযা' নামক পুস্তকখানা আমার লেখা নয় এবং তা আমার পরমার্শেও লেখা হয়নি। এতে যে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ওটা নিঃসন্দেহে আমার। কিন্তু আমার কোনো লেখা থেকে কোনো আলোচনা প্রসঙ্গে কথিত একটা বাক্য যদি উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে, তবে তা তাকলিদের ব্যাপারে আমার মতামতকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করেনা। আপনার মতো আলেমের একথা অজানা থাকার কথা নয় যে, কোনো ব্যক্তির মতামত এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বাক্য উদ্ধৃত করে তুলে ধরা ঠিক নয়। বিশেষত: যখন সেই ব্যক্তি নিজের মতামতকে নিজের বই কিতাবে অন্যত্র বিশদভাবে ব্যক্ত করেছে। এভাবে যদি অন্যদের আলোচনার মধ্যে আমার বিচ্ছিন্ন এক একটা বাক্য দেখে আমাকে প্রশ্ন করা চলতে থাকে তাহলে আমার সারাটা জীবন কেবল জবাব দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাবে।

আপনি যেহেতু কষ্ট করে আমার কাছে প্রশ্নটা করেছেন, তাই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি :

আমি 'তাকলিদ' (শর্তহীন অনুকরণ) ও ইত্তিবা (প্রমাণ সাপেক্ষে অনুকরণ) এক জিনিস মনে করিনা। যদিও আজকাল আলেমগণ তাকলিদ নিছক অনুকরণ অর্থে প্রয়োগ করে চলেছেন। কিন্তু প্রাচীন যুগের আলেমগণও তাকলিদ ও ইত্তিবা'তে পার্থক্য করতেন। তাকলিদ অর্থ হলো, যুক্তিপ্রমাণের তোয়াক্কা না করে কোনো ব্যক্তির কথা বা কাজের অনুকরণ ও অনুসরণ করা। আর ইত্তিবা অর্থ হলো, কারো নীতিকে যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে পছন্দ করে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করা। প্রথম জিনিসটা অজ্ঞ লোকদের জন্য। আর দ্বিতীয়টা আলেমের জন্য। একজন আলেমের জন্য কোনো ইমামের শর্তহীন ও নির্বিচার আনুগত্য ও অনুকরণ অনুসরণ করার কসম খেয়ে বসা জায়েয নয়। কোনো বিষয়ে ঐ ইমামের অভিমতকে নিজের স্থান মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী ও অধিকার সংগতিশীল মনে

www.icsbook.info

না হলেও তার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে থাকা তার পক্ষে অবৈধ। স্বয়ং মুজতাহিদ ইমামগণও একথা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাদের কোনো মতামতের অনুকরণ ও অনুসরণ করা কোনো আলেমের পক্ষে ততোক্ষণ জায়েয নয়, যতক্ষণ কুরআন ও সুন্নাহতে তার পক্ষে কি প্রমাণ আছে তা জেনে না নেয়।[১] তবে কোনো কোনো আলেম যদি কোনো ইমামের মতামতকে শরিয়তের দলিল প্রমাণের আলোকে বিশুদ্ধ বলে বুঝতে পারে তবে তা অনুসরণ করা তার জন্য বৈধ।

আপনি যে মনীষীদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বই পুস্তক পড়ে আমি একথাই বুঝতে পেরেছি যে, তাঁরা যে ইমামেরই অনুকরণ ও অনুসরণ করেন, শরিয়তের দলিলের আলোকে নিশ্চিত হয়েই করেন এবং এই অনুকরণ ও অনুসরণের পক্ষে তারা প্রমাণাদিও পেশ করে থাকেন। অবশিষ্ট যেসব মনীষী কোনো বিশেষ মত ও পথের অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকেন, তাদের সম্পর্কেও আমি এরূপ সুধারণা পোষণ করি যে, তাঁরাও এ ধরনের অনুসরণই করে থাকেন। (তরজমানুল কুরআন, মুহররম, সফর ১৩৭৬ হি:, অক্টোবর ১৯৫৬)

বিদ'আতের সংজ্ঞা ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়

প্রশ্ন : বিদ'আত কি দুই প্রকার হাসানা ও সাইয়েআহ? কেউ কেউ হযরত উমরের (রা.) বাণী نعمت البدعة هذه এটা কী চমৎকার একটা বিদ'আত- থেকে বিদ'আতের 'হাসানা' অর্থাৎ 'ভালো' হবার দলিল পেশ করে থাকেন। তাহলে হাদিস শরিফে কোন্ ধরনের বিদ'আতকে গোমরাহী হয়েছে?

উত্তর ঃ শরিয়তের পরিভাষায় যাকে বিদ'আত বলে তার মধ্যে হাসানা বা ভালো বলে কোনো বিভাগ নেই। বরং প্রত্যেকটি বিদ'আতই হচ্ছে 'সাইয়েআহ' খারাপ এবং গোমরাহী। যেমন, হাদিসে বলা হয়েছে কুল্লু বিদ'আতিন দালালাহ্ –'প্রত্যেকটি বিদ'আতই গোমরাহী'। তবে শাব্দিক অর্থে নিছক 'নতুন কথা' হিসেবে বিদ'আত 'হাসানা' হতে পারে আবার 'সাইয়েআহও হতে পারে। সাইয়েদিনা উমর রাদিআল্লাহু আনহু জামাতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার ব্যাপারে 'নি'মাতিল বিদআতু হাযিহী' (এটা কি সুন্দর একটা নতুন কাজ) বলে যে 'বিদআত' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন তার অর্থ পারিভাষিক বিদ'আত নয় বরং শাব্দিক বিদ'আতই হতে পারে। কাজেই একে 'বিদ'আতে হাসানা' বলে এক ধরনের বিদ'আতের যৌক্তিকতার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারেনা।

---

১. 'আল-বাহরুর রায়েক'–এ ইবনে আবেদীন লিখিত টীকা, ২৯৩ পৃষ্ঠায় এবং 'রসমুল মুফতী' গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফার নিম্নোক্ত কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আমাদের মতামত গ্রহণ করা কারো পক্ষে বৈধ নয় যতোক্ষণ উক্ত মতের উৎস কি, তা অবগত না হয়।"

www.icsbook.info

একথাটি বুঝার জন্য প্রথমে শরিয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আতের অর্থটা বুঝে নেয়া উচিত। তারপর দেখা উচিত জামাতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার পদ্ধতির প্রচলনও এই অর্থে বিদ'আতের সংজ্ঞাভুক্ত হতে পারে কিনা?

বাংলায় 'অভিনব' শব্দটির যে অর্থ হয় আরবিতে 'বিদ'আত' শব্দের অর্থ প্রায় তাই। অর্থাৎ একটা নতুন কথা, নতুন ব্যাপার, যা আগে ছিলোনা অথবা যার কোনো নজীর নেই। কিন্তু শরিয়তে একথাটি এতোটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়না এবং এই অর্থে প্রত্যেকটি নতুন কথা, নতুন বিষয়, নতুন পদ্ধতি ও নতুন কাজকে বিদ'আত আখ্যায়িত করাও হয়নি। শরিয়তের পরিভাষায় বিদ'আত অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত বিষয় ও মাসায়েলকে দীন ইসলাম নিজের গণ্ডির মধ্য নিয়ে নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোনো পদ্ধতি বা চিন্তাধারার প্রচলন করা যার সপক্ষে দীনের মূল উৎসে কোনো প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে এমন সব মাসায়েল ও বিষয়াবলী বা মাসায়েল ও বিষয়াবলীর এমন সব দিক যেগুলো সম্পর্কে দীন ইসলাম ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি, যেগুলো সম্পর্কে শারেহ আলাইহিস সালাম (শরিয়তের ব্যাখ্যাতা রসূল) নিজেই বলে দিয়েছেন : انتم اعلم بامور دنياكم তোমাদের পার্থিব বিষয়াবলী সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই ভালো জানো), সেগুলো স্বত:স্ফূর্তভাবে বিদ'আত ও সুন্নতের আলোচনা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কোনো কিছুর বিদ'আত হওয়ার বা না হওয়ার প্রশ্ন কেবলমাত্র এমন সব বিষয়ে উঠতে পারে যেগুলোর ক্ষেত্রে মানুষকে পথনির্দেশ দেবার দায়িত্ব দীন ইসলাম নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে এবং যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল বিধান দিয়েছেন অথবা নীতিগত পথনির্দেশনা দান করেছেন। সে বিধান ও পথ নির্দেশনা আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। চরিত্র ও নৈতিকতার সাথে সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। অথবা সম্পর্কিত হতে পারে ইবাদত ও ধর্মীয় আচার–আচরণ, রীতি, নীতির সাথে বা সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য এমন সব বিষয়ের সাথে যেগুলোকে সাধারণভাবে পার্থিব বিষয়াবলী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এগুলোর ব্যাপারে যখন এমন কোনো কথা বলা হবে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের শিক্ষা ও হেদায়েতে যার কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া যাবেনা অথবা যেগুলোর সপক্ষে দীনের উক্ত আসল উৎসগুলোর কোনো যুক্তিসংগত দলিল প্রমাণ পাওয়া যাবেনা, তখন সেগুলোই হবে বিদ'আত। আর যদি সেগুলো কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার বিরোধী হয় তাহলে তা কেবল বিদ'আতই হবেনা বরং ফাসেকী ও গুনাহের পর্যায়ভুক্ত হবে।

www.icsbook.info

শরিয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আতের এই ব্যাখ্যার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ অর্থে যে বিষয়কে বিদ'আত বলা হবে তার 'হাসানা' হবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। তা তো নিঃসন্দেহেই হবে 'সাইয়েআহ' এবং তার সাইয়েআহ হওয়াই উচিত। কারণ দীন হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থার নাম যার ভিত গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা ও হেদায়েতের উপর। আর এমন কোনো জিনিস এ ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনা এ শিক্ষা ও হেদায়েতের উপর যার ভিত গড়ে ওঠেনি। এ ধরনের কোনো জিনিস এর মধ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তা এ ব্যবস্থার প্রকৃতি ও গঠনাকৃতি বিগড়ে দেবে। এক্ষেত্রে কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, কোনো বিকৃতি সৃষ্টিকারী বস্তু আবার 'হাসানা'ও হয়?

এবার আসুন এ আলোচনায়, হযরত উমর (রা.) যে জিনিসটিকে 'ভালো বিদ'আত' বলেছিলেন তা কি সেই অর্থে বিদ'আত ছিলো যাকে শরিয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়?

তারাবীহর ব্যাপারে বলা যেতে পারে, রমযানে এশার নামাযের পরে কিয়ামে লাইল (অর্থাৎ তারাবীহ) কেবল বৈধই নয়, সুন্নতও। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। অন্য সময়ের কিয়ামে লাইল (রাত জেগে ইবাদত করা) এর তুলনায় একে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজেও এর উপর আমল করেছেন। জামাতের সাথে তারাবীহ পড়ার ব্যাপারেও বলা যেতে পারে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এবং তাঁর জ্ঞাতসারেই এটা কার্যকর হয়েছে। তিনি এটাকে জায়েয গণ্য করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আয়েশার (রা.) একটি রেওয়ায়েত দেখা যায়। তাতে তিনি বলেছেন : মসজিদে নববীতে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন জায়গায় রমযানের রাতে নামায পড়তেন। যার যতোটুকু কুরআন মুখস্থ ছিলো তিনি ততোটুকুই পড়তেন। কারোর সাথে একজন, কারোর সাথে পাঁচজন, কারোর সাথে সাতজন অথবা কমবেশি মুক্তাদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তারপর সবাইকে এক জামাতে শামিল করে একজন ইমামের পেছনে দাঁড় করিয়ে তারাবীহ পড়ার কাজ তো রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কয়েকবার করেছেন। তিরমিযি, আবু দাউদ ও অন্যান্য কয়েকটি হাদিস গ্রন্থে হযরত আবু যার রাদিআল্লাহু আনহুর একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি একটি রমযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন : রমযান মাস শেষ হবার আর মাত্র সাতদিন বাকি এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামায পড়াতে পড়াতে রাতের তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেলো। তারপর একদিন বাদ দিয়ে একদিন সাহরীর সময় পর্যন্ত নামায পড়াতে থাকলেন।

www.icsbook.info

বুখারি ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহ্ আনহা আর একটি রমযানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই বা তিনদিন পর পর তারাবীহ্র নামায পড়ান। নামায পড়াতে পড়াতে এক তৃতীয়াংশ রাত পার হয়ে গেলো। তারপর তৃতীয় বা চতুর্থ দিন লোকেরা জমা হয়ে গেলো। কিন্তু তিনি নামায পড়াতে বের হলেননা। পরে তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ এটাকে যেনো ফরয বলে ঘোষণা না করে দেন এই আশংকা করে তিনি হুজরা থেকে বের হননি।

এ থেকে জানা গেলো, এসবগুলোই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। তাহলে যাকে নতুন কথা বলা যেতে পারে তা কেবল এতোটুকুই ছিলো হযরত উমর (রা.) এ পদ্ধতিটিকে চিরকালের জন্য জারি করে দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় জামাতের সাথে তারাবীহ্ না পড়াবার কারণ হিসেবে কেবল একথাই বলেছিলেন যে, এর ফলে এটি লোকদের উপর ফরয হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। কাজেই হযরত উমরের (রা.) এ কাজটি করাকে বিদ'আত বলা যেতে পারেনা। এ কারণটি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, এ পদ্ধতিটির প্রচলন হওয়া আর সবদিক দিয়েই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পছন্দনীয় ছিলো, তবে ফরয গণ্য হবার আশংকাটাই ছিলো এ পথে বাধা, এজন্যেই তিনি এ প্রচলন করেননি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর এ আশংকাটির আর কোনো অবকাশই ছিলোনা। কারণ অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো আমল কোনো জিনিসকে শরিয়তে ফরয করার দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারেনা। কাজেই হযরত উমর (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে দিলেন, যা তাঁর এই ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত ছিলো। অর্থাৎ এ প্রথার প্রচলন হয়েছে ঠিকই শরিয়ত ও সুন্নত হিসেবে, কিন্তু ফরয হিসেবে নয়। এটার উপর কোনো কোনো লোক যখন বিদ'আত হবার সন্দেহ পোষণ করলো তখন হযরত উমর (রা.) এই বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন : "এটা ভালো বিদ'আত" অর্থাৎ এটা নতুন কথা ঠিকই কিন্তু এমন ধরনের নতুন কথা নয় যা শরিয়তে নিন্দনীয়। এ কারণেই সকল সাহাবা সম্মিলিতভাবে এ প্রথার প্রচলন মেনে নিয়েছেন। আর তাঁদের পর সমগ্র উম্মত এর উপর আমল করে চলছে। অন্যথায় শরিয়তের পরিভাষায় যাকে বিদ'আত বলা হয় হযরত উমর (রা.) তার প্রচলন করার সংকল্প করবেন আর সাহাবাদের সমগ্র দল চোখ বন্ধ করে তা মেনে নেবেন, এটা কি কখনো কেউ কল্পনাও করতে পারে? **(তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫৭)**

www.icsbook.info

দোয়া কবুলের উদ্দেশ্যে কবরে চিল্লা দেয়া

প্রশ্ন-২ : সুফী ও পীর মাশায়েখদের কারো কারো জীবনীতে দেখা যায় যে, অমুক বুজুর্গ অমুক বুজুর্গের কবরে মুরাকাবা ও চিল্লা (চল্লিশ দিন অবস্থান) করেছেন। এমনও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, অমুক বুজুর্গ বলেছেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন যে, অমুক কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। ইসলামে এসব ধারণার ভিত্তি কি?

উত্তর : পয়লা কথা এই যে, ইসলামে আসল জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ বুজুর্গদের কথা বা কাজ নয়। দ্বিতীয়ত: খোদ বুজুর্গদের কথা ও কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এতোটা প্রামাণ্য নয় যে, তার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, যেসব কথা ও কাজ তিনি বলেছেন ও করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সত্যই তিনি তা বলেছেন ও করেছেন। এ ধরনের বিবরণগুলোকে হেদায়েতের উৎস মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করা আমার মতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একমাত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত পথ ও পন্থাই নিরাপদ ও নিশ্চিত। কেননা এ পন্থাটাই সাহাবা ও তাবেঈনদের আমলে চালু ছিলো এবং মুসলিম উম্মতের হাদিসবেত্তা ও ফিকাহবিদগণ এ পন্থাটাকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য ও সঠিক সাব্যস্ত করে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য পথ অনুসরণ করতে চায়, তার এই প্রামাণ্য পথ পরিহার করার কথা চিন্তা করাও উচিত নয়। কেননা এ পথের বাইরে যা কিছু আছে তা অন্ততপক্ষে বিপদমুক্ত তো নয়ই। এবার আপনি যে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছেন আসুন সে বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করি। যেসব জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অমুক বুজুর্গ কাজ করেছিলেন, সেসব গ্রন্থের এই বর্ণনাগুলো হাদিসের যে কোনো দুর্বল থেকে দুর্বলতর রেওয়াতের তুলনায়ও বা কি মর্যাদা রাখে? কোন্ সনদ বা সূত্রের ভিত্তিতে এরূপ বিশ্বাস বা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, ঐ বুজুর্গগণ সত্যিই অমন কাজ করেছেন? ধরুন, তারা যদি আসলে অমন কাজ না করে থাকেন, তাহলে ঐসব ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের অনুসরণ করে আমরা আখেরাতে কিসের দোহাই দিয়ে জবাবদিহি করতে পারবো? আখেরাতের চিন্তা যদি আমাদের থাকে এবং আমরা যদি নিজেদের কল্যাণ চাই, তাহলে এ কাজ করার আগে আমাদের ইসলামের নির্ভুল ও নিরাপদ বিধানের শরণাপন্ন হয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, দোয়া কবুল বা সিদ্ধি লাভের জন্য সেখানে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে কিনা। সাহাবায়ে কিরাম স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে গিয়ে কি কখনো চিল্লা দিয়েছেন

www.icsbook.info

বা মুরাকাবা করেছেন! তাবেঈন কি কখনো কোনো সাহাবির কবরে এ কাজ করেছেন? ফিকাহবিদ ও হাদিসবেত্তাগণের কেউ কি এটাকে শরিয়তসম্মত পন্থা বলে নির্দেশ করেছেন? সর্বোপরি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কি কুরআনে কোথাও এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন যে, সিদ্ধি লাভ অথবা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কবরে কবরে হাজিরা দাও? অথবা আল্লাহর রসূল কি এই কর্মপন্থা অনুসরণ করার জন্য কোনো রকম আভাস-ইঙ্গিত দিয়েছেন? এসব প্রক্রিয়া দ্বারা যদি এটা সঠিক প্রমাণিত হয় তাহলে নির্দ্বিধায় একাজ করা যেতে পারে। অন্যথায় একাজ একেবারে ভ্রান্ত না হোক, অন্ততঃ তা যে সন্দেহজনক তাতো না মেনে উপায় নেই। এমন সন্দেহজনক কাজ করে আখেরাতের ঝুঁকি নেওয়া কি আমার উচিত হবে? এটা হয়তো আখেরাতে ভুল প্রমাণিত হবে এবং আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবেন যে, ইসলামের প্রকৃত ও নির্ভুল পথ ও পন্থা জানার জন্য প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য উপায় উপকরণ যখন বিদ্যমান ছিলো, তখন আমি সন্দেহজনক উপায় উপকরণের আশ্রয় কেনো নিলাম, তখন এ প্রশ্নের তো কোনো জবাবই দিতে পারবোনা।

পীর বুজুর্গদের মর্যাদার দোহাই দিয়ে দোয়া করা

প্রশ্ন-৩ কোনো পীর ওলীর কবরে গিয়ে এরূপ বলা জায়েয কিনা যে, হে আল্লাহর ওলী! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।"

উত্তর : কোনো বুজুর্গের কাছে গিয়ে নিজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করা এমন কোনো আপত্তিকর ব্যাপার নয়। মানুষ নিজেও আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে, অন্যকেও দোয়া করতে অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু মৃত লোকদের কাছে এরূপ আবেদন করলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নেয়। কবরের উপর দাঁড়িয়ে একথা বলা দু'রকমের হতে পারে। প্রথমত মনে মনে অথবা চুপিসারে বলা। এর অর্থ এই হবে যে, আপনি উক্ত বুজুর্গকে আল্লাহর মতোই গোপন কিংবা প্রকাশ্য কথাবার্তা শোনার ক্ষমতাশালী মনে করেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ –

"তোমরা কথা গোপনেই বলো বা প্রকাশ্যে বলো, তিনি মনের কথা পর্যন্ত জানেন।"

দ্বিতীয়ত: চিৎকার করে আল্লাহর সেই ওলীকে ডেকে একথা বলা। এ অবস্থায় আকীদা বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি না থাকলেও এটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার শামিল। আপনার চিল্লানো সত্ত্বেও তিনি নাও শুনতে পারেন। কেননা মৃত ব্যক্তিরা কথা শুনতে পায় কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যদি তিনি শুনতে পানও, তবু এমন হতে পারে যে, তাঁর রূহ ঐ মুহূর্তে সেখানে নেই এবং আপনি বৃথাই একটা

www.icsbook.info

শূন্য স্থানে হাঁকডাক করছেন। আবার এও হতে পারে যে, তার রূহ সেখানে আছে কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আলাপ বা তাঁর ধ্যানে মশগুল। সে অবস্থায় আপনার চিৎকার রূহকে খানিকটা কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হবেনা। আপনি দুনিয়ার কোনো নেককার ব্যক্তির কাছে দোয়া চাইতে গেলে প্রথমে তাঁর সাথে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তারপর তার কাছে নিজের আবেদন পেশ করেন। গিয়েই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করা শুরু করলেন তিনি ঘরে আছেন না বাইরে, আর ঘরে থাকলেও বিশ্রামরত আছেন, না কর্মরত, না আপনার কথা শোনার মতো অবসরেই তিনি আছেন, এ ঘরের কোনো খোঁজ খবরই নিলেন না– এমনটি তো কখনো করেননা।

এবার একটু ভাবুন তো দেখি, মৃত ব্যক্তির অবস্থা জানা বা তার সাথে সামনাসামনি সাক্ষাতের সুযোগ যখন নেই, তখন তার বাসস্থানে গিয়ে আন্দাজে চিৎকার জুড়ে দেয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে কি? দোয়া চাইবার এ রীতি যদি কুরআন ও হাদিসে শেখানো হতো, অথবা সাহাবাদের আমলে এ রীতি চালু থাকার কোনো প্রমাণ থাকতো, তাহলে তো ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকতো। নির্দ্বিধায় এটা করা যেতো। কিন্তু এর কোনো নামগন্ধও যখন সেখানে পাওয়া যায়না, তখন এমন পন্থা অবলম্বনের কি হেতু থাকতে পারে যার একটা রূপ তো সরাসরি আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্যের সাথেই সংঘর্ষশীল, আর অপরটা সুস্পষ্টভাবে অযৌক্তিক?

চার ইমাম ও আহলে বাইত

প্রশ্ন-৪ : কখনো কখনো দোয়ার মধ্যে 'অমুক বুজুর্গের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের ওছিলায়' এ কথাটা সংযুক্ত করা হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা কেমন? রসূলের সুন্নাহর এ সম্পর্কে বক্তব্য কি? সাহাবায়ে কিরামের রীতি কি ছিলো? এভাবে (দোহাই পেড়ে) দোয়া করাতে ধর্মীয় দিক দিয়ে দূষণীয় কিছু নেই তো?

উত্তর : দোয়া করার সময় আল্লাহকে কারো সম্মান ও মর্যাদার দোহাই দেয়া আল্লাহ রসূলের শেখানো পদ্ধতি নয়? কুরআন যে এরূপ ধ্যান ধারণা থেকে একেবারেই মুক্ত সেকথা তো আপনার জানাই আছে। আমার জানা মতে হাদিসেও এর কোনো ভিত্তি নেই। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও কারো সম্পর্কে আমার এরূপ জানা নেই যে, তিনি এ পদ্ধতি নিজে অবলম্বন করেছেন কিংবা আর কাউকে অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। আমি জানিনা, মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ধারণা কোথেকে এলো যে, নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের কাছে দোয়া করার

www.icsbook.info

সময় কোনো বান্দার মর্যাদা ও সম্মানের দোহাই দিতে হয় অথবা 'তোমার অমুক বান্দার ওছিলায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো' এই বলে মিনতি করতে হয়। এমনটি করা যে নিষিদ্ধ সেকথা আমি বলছিনা। আমি শুধু দুটো কথা বলছি। প্রথমত: রব্বুল আলামীন স্বয়ং আমাদেরকে দোয়া করার যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন, এটা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবিগণকে প্রত্যক্ষভাবে যে নিয়ম শিখিয়েছেন, এটা তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই এ পদ্ধতিটি পরিহার করাই উচিত। কেননা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্কের সঠিক রূপ কি, সেটা বলে দেয়ার জন্যই তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম এসেছিলেন। তাঁরা যখন এ পদ্ধতি নিজেরাও অবলম্বন করেননি এবং অন্যদেরকেও তা শেখাননি, এখন যে ব্যক্তিই তা অবলম্বন করবে, সে প্রামাণ্য জিনিস বাদ দিয়ে অপ্রামাণ্য জিনিসই গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় যে কথাটা আমি বলতে চাই তা এই যে, দোয়া করার এ পদ্ধতিটা আমার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। তার তাৎপর্য উপেক্ষা করে কেউ যদি আমার মতো তা অপছন্দ না করে তবে সেকথা আলাদা। আমি যখন দোয়ার এ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ভাব নিয়ে চিন্তা করি তখন আমার সামনে এ রকম একটা চিত্র ভেসে উঠে যেনো একজন বিরাট দানশীল ব্যক্তি রয়েছেন, তার কাছ থেকে ছোট বড় সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়, সব ধরনের মানুষের প্রতি তার কল্যাণময় হাত প্রসারিত, সকলের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত সবাই তার কাছে যা ইচ্ছা চাইতে পারে। কাউকে তিনি বঞ্চিত করেননা। এহেন মহানুভব ব্যক্তির কাছে এক ব্যক্তি এলো। সে সোজাসুজি একথা বললোনা যে, হে করুণাময় ও দানশীল! তুমি আমাকে সাহায্য করো। বরং সে বললো, তোমার অমুক বন্ধুর খাতিরে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।" চাওয়ার এই ভঙ্গিতে এরূপ খারাপ ধারণা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যেন তিনি নিজ দয়া ও উদারতার গুণে কারো সাহায্য করতে প্রস্তুত নন, বরঞ্চ নিজের বন্ধুবান্ধব, পাত্রমিত্র ও সভাসদদের খাতিরে দয়া দাক্ষিণ্য করে থাকেন। তাদের দোহাই না পাড়লে যেনো তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশা করা যায়না। আর 'অমুকের মান মর্যাদার খাতিরে' বলে দোয়া করাতে তো ব্যাপারটা খারাপ ধারণা পোষণের চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি তার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং বলতে চাইছেন যে, আমি অমুক প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন নিয়ে এসেছি। আমার আবেদন অন্যান্য অসহায় কৃপা প্রার্থীদের আবেদনের মতো ভেবে অগ্রাহ্য করবেননা। দোয়ার এই ভাষা ও ভঙ্গিতে যদি এই ধরনের

www.icsbook.info

মনোভাব নিহিত না থেকে থাকে, তাহলে কিভাবে নেই সেটা আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হোক। কেউ যদি আমার মনের এ খটকা দূর করে দেয় তবে আমি খুবই খুশি হবো। কিন্তু যদি সত্যিই এই ভাবধারা ওতে থেকে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণতার গুণে বিশ্বাসী, সে দোয়া করার এ রীতি গ্রহণ করার কথা কল্পনায়ও আনতে পারে কিভাবে, তা আমি বুঝতে অক্ষম।

উপরোক্ত ভাবধারা প্রচ্ছন্ন থাকার কারণেই ফিহাক শাস্ত্রবিদগণ দোয়ার এই রীতি অবাঞ্ছিত বলে মত দিয়েছেন। হানাফী ফিকাহর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হেদায়া'-তে বলা হয়েছে :

ويكره ان يقول الرجل فى دعاءه بحق فلان او بحق انبياءك ورسلك لانه لاحق للمخلوق على الخالق - (كتاب الكراهية - مسائل متفرقة)

"অমুকের খাতিরে' অথবা তোমার নবী ও রসূলদের ওছিলায় এ জাতীয় কথা বলে দোয়া করা মাকরূহ। কেননা স্রষ্টার উপর সৃষ্টির কোনো দাপট চলেনা।" (ফারান, তাওহীদ সংখ্যা, তরজমানুল কুরআন, মুহাররম-সফর ১৩৭৭ হি., অক্টোবর - নভেম্বর ১৯৫৭)

মৃত লোকদের কাছে দোয়া চাওয়া

প্রশ্ন : ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন যে, 'চার ইমাম তাঁদের আমলে ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ যেসব লোক বেঁচে ছিলেন অথবা যাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব ছিলো, তাদের সকলের কাছ থেকে ইসলামের জ্ঞান আহরণ করেছেন। শুধুমাত্র আহলে বাইত (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর বা পরিবারের সদস্য) এর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে, স্বয়ং আহলে বাইতও এ মত অবলম্বন করেননি। ইসলামের জ্ঞান যার কাছেই পাওয়া যেতো, তাঁরা তার কাছ থেকেই তা গ্রহণ করতেন। কোনো ধরনের গোড়ামিতে লিপ্ত নয় এমন যে কোনো লোকের এই পথই অনুসরণ করা কতর্ব্য।

আমি সামান্য যা কিছু পড়াশুনা করেছি, তাতে আজ পর্যন্ত এ ধরনের কথা কোথাও পাইনি বা শুনিনি। আপনি এর সমর্থনে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বরাত দেবেন, যাতে কথাটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আর একটি প্রশ্ন এই যে, সহীহ বুখারিতে 'কিতাবুল ফিতান' শীর্ষক অধ্যায়ে 'বাবুল ইসতিখলাফ' (খলিফা নিয়োগ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ) এ একটি হাদিস নিম্নরূপ :

www.icsbook.info

عن جابر ابن سمرة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر اميرا فقال كلمة لم اسمعها فقال ابى انه قال كلهم من قريش -

ঐ হাদিসে যে ১২ জন আমিরের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাঁরা কারা? শীয়াদের মধ্যে যারা ১২ ইমামের পক্ষাবলম্বী, তারা এ হাদিস দ্বারা নিজেদের ১২ ইমামকেই বুঝান। তাদের এ যুক্তি কি আপনি সঠিক মনে করেন?

উত্তর : শিয়াদের হাদিসের কিতাব সম্পর্কে আমার এতোটা ব্যাপক জ্ঞান নেই যে, আমি সে সম্পর্কে নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলতে পারি। তবে আহলে সুন্নতের হাদিসের কিতাবে এমন বহু হাদিস রয়েছে, যা আহলে বাইতের মনীষীগণ, আহলে বাইত বহির্ভূত সাহাবি, তাবেঈন অথবা তাবেতাবেঈন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বুখারি ও মুসলিমের একাধিক হাদিস ইমাম জাফর সাদেক কর্তৃক মুহাম্মদ বিন মুনকাদির ও আতা বিন আবি রাবাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ বাকের বহু সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন জাবের বিন আবদুল্লাহ, আকীল বিন আবু তালেবের মুক্ত গোলাম আবু মুররাহ, আবদুল্লাহ বিন আবু রাফে, সাঈদ বিন মুসাইয়াব এবং এজিদ বিন হারুন থেকে। ইমাম যয়নুল আবেদীন উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়া থেকে, মিসওয়ার বিন মাখরামা থেকে, সাঈদ বিন মারজানা থেকে, উমর বিন উসমান থেকে এবং আরো বহু ব্যক্তি থেকে বহু সংখ্যক হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। স্বয়ং হযরত আলী (রা.) মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি মুসলিম শরিফে রয়েছে। এতো গেলো শুধু বুখারি ও মুসলিমের হাদিসের কথা। অন্যান্য হাদিসের কিতাব খুঁজলে এ ধরনের আরো বহু হাদিস পাওয়া যাবে। মোটকথা, এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে, আহলে বাইতের মনীষীবৃন্দ ইসলামী জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে কখনো কোনো গোড়ামি বা বংশীয় আভিজাত্য ও অহংকার প্রদর্শন করেননি।

বুখারির যে হাদিসটি সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন করেছেন, ওটা কিতাবুল ফিতানে নয়, বরং কিতাবুল আহকামে আছে। এ হাদিসটি বাবুল ইসতিখলাফে নয় বরং তার পরবর্তী একটি শিরোনাম বিহীন বাবের বা পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বুখারিতে এ রেওয়ায়েতটি খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, তাবারানী গ্রন্থসমূহে এই মর্মে একাধিক বিস্তারিত হাদিস রয়েছে, যা দ্বারা হাদিসের আসল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায়। এই হাদিসসমূহের সারসংক্ষেপ এই যে, বারো জন আমীর বা খলিফার আমল পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী ও শক্তিশালী থাকবে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সংঘবদ্ধ থাকবে এবং কারো শত্রুতায় তাদের

www.icsbook.info

কোনো ক্ষতি হবেনা। মুসলমানদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে বিভিন্ন শাসকের উপর প্রয়োগ করা যায় এবং কেউ কেউ তার চেষ্টাও করেছে। তবে এসব বিশদ বর্ণনার আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই ১২ আমির বা খলিফা আর যেই হোক, ১২ ইমাম হতে পারেনা, কেননা তাঁরা শাসক ছিলেননা। (তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল, ১৩৭৬ হি: নভেম্বর : ১৯৫৬)

শিয়া সুন্নি

প্রশ্ন : পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী একটা অত্যন্ত মহৎ ও উচ্চতর লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলনরত। পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিজয় সূচিত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর চেষ্টা সফল হোক, আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করি।

যে বিষয়টির দিকে আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, সেটাও ইসলামের একটা মৌলিক বিষয়। পরিতাপের বিষয় যে, আপনি এবং আপনার দল এ দিকে লক্ষ্য করেননি। এজন্যই ব্যাপারটা আপনার গোচরে আনছি। আশা করি আপনি প্রফুল্ল মনে এর জবাব দেবেন।

বর্তমান যুগে শিয়ারা অত্যন্ত সংগঠিত এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বত্র নিজেদের বক্তৃতা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছে। শিয়া ফের্কাভুক্ত মন্ত্রীরাও আমাদের উদাসীনতার সুযোগ গ্রহণ করে এ অভিযানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করছে। অপরদিকে আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আলেম সমাজ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে ইসলামের মূলোৎপাটন করে চলেছেন।

তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার আড়ালে সর্বত্র নতুন নতুন শোক সভার লাইসেন্স নিয়ে এবং সেসব লাইসেন্সের সুযোগ গ্রহণ করে প্রকাশ্যে সুন্নি বিরোধী বিদ্বেষাত্মক প্রচারণা চালাচ্ছে। কেউ আপত্তি তুললে তা সরকারের বিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়, কেননা তাদের কাছে লাইসেন্স রয়েছে। অর্থাৎ কিনা, সরকার নিজেই ছাড়পত্র দিয়ে সুন্নি বিরোধী প্রচারণা করাচ্ছে। লাইসেন্সের কারণেই সরকার তাদের পাহারা দিচ্ছে।

পরিস্থিতি এতোদূর গড়িয়েছে যে, তাদের প্রতিটি লোক নিজ ফের্কার উন্নতির জন্য বৈধ ও অবৈধ পন্থায় নিজেদের বিশেষ আকীদা বিশ্বাসের প্রসার ঘটাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। সকল শিয়া সংবাদপত্র উক্ত অপপ্রচার সম্বলিত লেখা ছাপছে। তাদের আলেমরা সর্বত্র শোকসভার ছদ্মাবরণে 'সাকিফাতে হোসেন হত্যা' বিষয়ে বক্তৃতা করছে। অজ্ঞ জনসাধারণ তাদের বক্তৃতা শুনে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং শিয়া মত এক অদম্য প্লাবনের আকারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে।

www.icsbook.info

এসবের পরও আমাদের অবস্থা এই যে, মুষ্টিমেয় সংখ্যক আলেম অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সাহাবায়ে কিরামের অবমাননা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে, তবে তাদের তৎপরতার খানিকটা তো জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর খানিকটা ক্ষতি স্বয়ং সরকারের তরফ থেকে আসে। এর প্রধানতম কারণ হলো আপনাদের বিরোধিতা। আপনাদের বিরোধিতার ফলে সরকার মনে করে যে, মোল্লারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দিচ্ছে। এজন্য তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়, গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

যেমন 'আলমুনীর' পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ৩৬তম সংখ্যা, অর্ধ সাপ্তাহিক 'দাওয়াত' এর ১৭ই সেপ্টেম্বর লাহোর, সংখ্যার জামানত বাজেয়াপ্ত করায় কেবল সাংবাদিকতার মান বজায় রাখার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছে এবং তার পরে এভাবে সমালোচনা করেছে যে, "এরূপ কর্মপদ্ধতি আমাদের মতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি সুফলদায়ক নয় এবং আমাদের ধর্মীয় নীতি এ ব্যাপারে সমকালীনদের থেকে ভিন্ন।"

এহেন নোংরা পরিবেশে আপনি নিজেই ভেবে দেখুন যে, এই সমালোচনা দ্বারা কি শিয়া প্রচারণার উৎসাহ বৃদ্ধি করা হয়নি? অথচ আলমুনীর পত্রিকা স্বীয় নিবন্ধে নিজেই একথা 'স্বীকার করেছে যে, শোক প্রকাশের কর্মসূচি সুন্নি বিরোধী অপপ্রচারণায় রূপান্তরিত হয়েছে।

আমি আপনার কাছে সবিনয়ে জানতে চাই যে, আমাদের আলেম সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংবাদপত্র বিশেষত আপনি স্বয়ং ও জামায়াতে ইসলামী নিরব কেন? একটা পারস্পরিক ও সর্বসম্মত কর্মসূচি কেন গ্রহণ করা হচ্ছেনা? ইসলামী আইনে কি সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কোনো অবকাশ আছে? অধিকাংশ জায়গায় প্রকাশ্যভাবে বিষোদগার করা হয়েছে এবং লাউড স্পিকারে জনসমক্ষে নিম্নরূপ মাতম করা হয়েছে :

'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা ছেড়ে বন্ধুরা সকিফায় কেন ছুটলো?

কুরআনের হাফেজ বন্ধুরা কেন জানাযা ত্যাগ করলো?

নবীর তিরোধানের পর বন্ধুরা কেনো সেই বাড়িতে এসে বেআদবি করলো?

কুরআনের দাবিদাররা নবীর বংশধরের অধিকার কেন গ্রাস করলো?

যে গৃহ থেকে বরকত লাভ করতে হবে সে ঘরে কেন আগুন লাগানো হলো? দুনিয়াবাসী তোমরা কেন সত্যকে ভুলে গেলে? কেনই বা নবীর বংশধরের মন কাঁদালে?

www.icsbook.info

বন্ধুরা যখন গেল সকিফায়, পরস্পরে মিলে করলো সলাপরামর্শ, নিজেদের শাসন মজবুত করো ....'ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব মাতম লিখিতভাবে বিদ্যমান।

এ ঘটনা যখন এসডিও ও ডিএস সাহেবদ্বয়কে জানানো হলো তখন তারা বললেন, আমরা ডাইরীতে লিখে নিচ্ছি। তারপর বললেন, ওদের কাছে শোকানুষ্ঠানের লাইসেন্স আছে। তিনি আমাদেরকে এই বলে অভিযুক্ত করলেন যে, তোমরা মিছিলে হট্টগোল বাধাতে চাও। এরপর তিনি আমাদের নাম লিখে নিলেন। অতপর যথানিয়মে আছরের আযান নির্দিষ্ট সময়ে লাউড স্পীকারে দেওয়া হলো। তখন শিয়াদের প্রধান প্রচারক মুহাম্মদ ইসমাইল গুজরী বক্তৃতার মধ্যে আমাদের আযানকে এজিদের সময়কার আযানের মতো বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন, এটা সেই আযান, যা ইমাম হোসেনের কাফেলার উপর হামলা চালানোর সময় কুফায় হচ্ছিলো। এরপর তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকার উপর অবৈধ আক্রমণ শুরু করলেন, যা ভাষায় ব্যক্ত করাই অশোভন। অতপর বক্তৃতায় ফাদাকের বাগান, খেলাফত ও কিরতাস সংক্রান্ত হাদিস নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

জনাব! ভারতে যদি ভিন্ন ধর্মের লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) অবমাননা সম্বলিত বই প্রকাশ করে, তাহলে আপনি, আপনার দল, অন্যান্য দল ও আলেমগণ আপনার অনুরোধক্রমে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস করে। এই বই বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিদেশী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান এবং আল্লাহর রহমতে সফলও হয়ে যান। আলোচ্য প্রচারপত্রে কি অন্য কোনো আয়েশার অবমাননা করা হয়েছে এবং শিয়ারা কি অন্য কোনো আয়েশার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে?

উত্তর : আপনি যে ঘটনাবলী লিখেছেন তা বাস্তবিক অত্যন্ত দু:খজনক। শীয়াদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তারা নিজস্ব তরীকায় সম্পন্ন করুক, এ অধিকার তো মেনে নেয়া যায় এবং মানাও উচিত। কিন্তু তারা অন্যদের মান্যগণ্য নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জনসমক্ষে সমালোচনা করবে, এ অধিকার কিছুতেই মেনে নেয়া যায়না। অন্যদের ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করারও অধিকার তাদের নেই। তাদের আকীদা বিশ্বাসে যদি ইসলামের ইতিহাসের কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব আপত্তিজনক হয়ে থাকে, তবে তারা এ ধরনের আকীদা বিশ্বাস পোষণ করতে পারে। নিজ নিজ ঘরে বসে তাদেরকে যা ইচ্ছা বলুক, তাতে আমাদের বলার কিছুই নেই। কিন্তু প্রকাশ্য জনসমক্ষে অন্যদের ধর্মীয়

www.icsbook.info

নেতৃবৃন্দ তো দূরের কথা, কারো পিতাকেও গালি দেওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার কোনো ইনসাফপূর্ণ আইন বা রীতিনীতি অনুসারে তারা একে নিজেদের অধিকার বলে প্রমাণ করতে পারেনা। এ ব্যাপারে সরকার কোনো শৈথিল্য দেখালে সেটা তার মারাত্মক ত্রুটি। এ ধরনের শৈথিল্য দেখানোর ফল এছাড়া আর কিছু হতে পারেনা যে, এখানে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবদমিত না হয়ে আরো বিস্ফোরিত হবে। কুৎসা রটিয়ে বেড়ানোর লাইসেন্স দেওয়া এবং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে জনগণকে কুৎসা শুনতে বাধ্য করা শুধু নির্বুদ্ধিতাই নয়, বাড়াবাড়িও বটে। শিয়াদের শোক ও মাতমের অনুষ্ঠানাদি পালন ও এ সংক্রান্ত মিছিল ও সভা-সমিতির জন্য যুক্তিসঙ্গত ও ইনসাফভিত্তিক সীমা নির্ধারণ না করা এবং লাগামহীন লাইসেন্সের অপব্যবহারের দরুন ঝগড়া ফাসাদ সংঘটিত হলে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ধুয়া তুলে উদ্বেগাকুল হওয়া সরকারের পক্ষে মারাত্মক অন্যায়। এ ব্যাপারে শিয়া ও সুন্নিদের অবস্থানে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই উভয়পক্ষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেই পার্থক্যটা এই যে, যেসব মহান ব্যক্তিত্বকে শিয়ারা নিজেদের নেতা ও মুরুব্বী মানে তাঁরা সুন্নিদের মুরুব্বী। সুন্নিদের পক্ষ থেকে তাদের উপর কটাক্ষ করা বা কুৎসা রটানোর প্রশ্নই ওঠেনা। পক্ষান্তরে সুন্নিদের আকিদা বিশ্বাস অনুসারে যেসব ব্যক্তিবর্গ মর্যাদা ও মাহাত্মের আসনে অধিষ্ঠিত, তাদের একটি বিরাট অংশকে শিয়ারা শুধু খারাপ মনে করে তা নয়, বরং তাদেরকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেয়াকে তারা নিজেদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অপরিহার্য অংশরূপে গণ্য করে। কাজেই সীমা নির্ধারণের প্রশ্নটা কেবল শিয়াদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কুৎসা রটানো ও অপপ্রচার চালানো যদি তাদের ধর্মমতের কোনো অপরিহার্য অংশ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তাদের ঘরের মধ্যে সীমিত রাখতে তাদেরকে বাধ্য করা উচিত। জনসমক্ষে এসে অন্যদের নেতৃবৃন্দের নিন্দাবাদ করাকে কোনোভাবেই তাদের অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়া যায়না।

আমার ধারণা এই যে, এ বিষয়টা যদি যুক্তিসংগতভাবে তোলা হয় তাহলে খোদ শিয়াদেরই মধ্যকার সকল ইনসাফপ্রিয় লোকজন তা সমর্থন করবে এবং তাদের মধ্যকার নৈরাজ্যবাদীদের নীতি অচল হয়ে পড়বে। সরকারকেও একথা অনায়াসে বুঝানো যাবে যে, শিয়াদেরকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের ব্যাপারে বিশেষত: প্রকাশ্যে উদযাপনের ব্যাপারে, কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে বাধ্য করা দরকার। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এসব বিধিনিষেধও স্থির করা যেতে পারে।

www.icsbook.info

এ সমস্যাটাকে কোনো আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানোর পরিবর্তে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় তার সমাধান করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। একাজ সমাধা করার জন্য আমি নিজে যা কিছু করতে সক্ষম, তাতে ইনশাল্লাহ বিন্দুমাত্র কসুর করবোনা। (তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল ১৩৭৬ হি., নভেম্বর ১৯৫৬)

হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-র বিরোধ

প্রশ্ন : জনৈক শিয়া আলেম আমাকে বলেছেন, হযরত ফাতেমা (রা.) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি নারাজ ছিলেন এবং তাঁকে বদ দোয়া দিতে থাকেন। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ ইবনে কুতাইবার- 'আল ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাতু' (ইমামত ও রাজনীতি) গ্রন্থের বরাত দেন। তিনি একথাও বলেন যে, ইবনে কুতাইবাকে সুন্নী আলেমগণ নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মওলানা শিবলী নো'মানীর 'আল ফারুক' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দেখিয়েছেন, তাতে এই লেখককে খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে। উপরন্তু শিয়া আলেমটি এও বলেছেন, আপনিও নাকি নিজের 'ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন' পুস্তিকায় 'আল ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাতু' থেকে একটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন, যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) হযরত আয়েশাকে (রা.)-কে লিখেছিলেন। মেহেরবানী করে জানান হযরত ফাতিমার নারাজী সম্পর্কিত প্রকৃত ব্যাপারটি কি ছিলো এবং ইলম ও ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ইবনে কুতাইবার স্থানটিও নির্দেশ করবেন।

উত্তর : ইবনে কুতাইবা (রহ.) ছিলেন নি:সন্দেহে একজন গবেষক আলেম। কিন্তু শিয়া আলেম সাহেব তাঁর যে রচনার বরাত দিয়েছেন তার মধ্যে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে, যা বুদ্ধিগতভাবে অগ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমার যে চরিত্র চিত্রন তিনি করেছেন, তা যদি সত্য বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এই দু'জন শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা তাঁদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করাও দুরূহ হয়ে পড়বে। এই গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে তা একবার আপনি নিজে পড়ে দেখুন এবং মত প্রকাশ করুন। এ ধরনের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা আপনিই বলুন। গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, এ ধরনের বক্তব্য উদ্ধৃত করারও অযোগ্য বলে আমি মনে করি। এসব বিষয় প্রত্যক্ষ করেই অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে, এ গ্রন্থটি আদৌ ইবনে কুতাইবার নয় অথবা তার হলেও এর মধ্যে কমপক্ষে কিছু বিষয় অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। আমি যে পত্রটির বরাত দিয়েছি সেটি ইবনে আবদে রাব্বিহি 'ইকদুল

www.icsbook.info

ফরীদে'ও উদ্ধৃত করেছেন। তাই এ ব্যাপারে আমি একমাত্র আল ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাতু'-এর উপর নির্ভর করিনি।

খেলাফতের বিষয়টি বাদ দিলে হযরত ফাতিমার (রা.) মীরাসের দাবির ব্যাপারটির জন্য ইবনে কুতাইবার 'আল ইমামত' গ্রন্থটির উপর নির্ভর করার এমনকি প্রয়োজন আছে? এর বিস্তারিত বিবরণ তো সহীহ্ বুখারি ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থগুলোয় উল্লেখিত হয়েছে। এ কিতাবগুলোর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত ফাতিমা (রা.) মীরাসের ব্যাপারে হযরত আবু বকরের (রা.) প্রতি নারাজ অবশ্যি ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) যে কারণে হযরত ফাতিমার (রা.) মীরাসের দাবি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন তার মূলে ছিলো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

"নবীদের মীরাস তাঁদের ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হয়না, বরং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হচ্ছে সাদকা।" একথাটি ইবনে কুতাইবার গ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নবীর যে ফরমান উদ্ধৃত করেছিলেন তা যথার্থ নয় অথবা হযরত ফাতিমা (রা.) নবীর এই ফরমানের সত্যতায় সন্দিহান ছিলেন। এখন আপনি নিজেই ফায়সালা করুন, হযরত আবু বকরের (রা.) জন্য নবীর ফরমান কার্যকর করা অথবা হযরত ফাতিমার (রা.) মন জয় করা কোন্‌টা জরুরি ছিলো? আমরা তো একথা কল্পনাই করতে পারিনা, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শুনার পর হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহ আনহা তা মেনে নেয়ার পরিবর্তে এমন নারাজ ও ক্রুদ্ধ হয়ে যেতে পারেন যেমন ক্রুদ্ধ হবার চিত্র ইবনে কুতাইবা অংকন করেছেন। যদি তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে এবং কোনোভাবে নিজের এ ক্ষোভ প্রকাশও করে থাকেন তাহলে বড় জোর আমরা এর এ সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করতে পারি যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করে থাকবেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু এর যে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন তার সাথে তিনি একমত ছিলেননা। এ ঘটনাটির যদি এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যা না করা হয় তাহলে হযরত ফাতিমাকে (রা.) এই অভিযোগ থেকে বাঁচানো যাবেনা যে. সম্পদের মোহ তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যার ফলে নিজের মহান পিতা আল্লাহর রসূলের বাণীর কোনো পরোয়াই তিনি করেননি। সাইয়েদাতুন নিসা ফাতিমা যোহরা রাদিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে এমন বাজে কথা কি কোনো মুসলমান কল্পনা করতে পারে? খোলাফায়ে রাশেদীন ও আহলে বাইতের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের এমন কোনো চিত্র আমরা কেমন করে গ্রহণ করতে পারি, যা উভয় দলের কারোর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেনা?

www.icsbook.info

হযরত ফাতিমা (রা.) এ ঘটনার পর শেষ পর্যন্ত নারাজই ছিলেন, না পরে তিনি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে আমাদের এখানে বিভিন্ন বর্ণনার অস্তিত্ব রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি শেষ পর্যন্ত নারাজ ছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) নিজেই তাঁর সাথে মোলাকাত করতে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে রাজি করিয়ে নিয়েছিলেন। আমার মতে এই শেষোক্ত কথাটাই সত্য ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৬৭)

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : ফাদাকের বাগান সংক্রান্ত বিতর্কের ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত অভিমত কি? ব্যাপারটা এমনভাবে উত্থাপন করা হয়ে থাকে যে, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর উপর জুলুম করা হয়েছে বলে ধারণা জন্মে। আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে হযরত ফাতেমাকে উত্তরাধিকার না দেওয়া কি প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার জন্য ন্যায়সঙ্গত ছিলো?

উত্তর ফাদাকের বাগান সংক্রান্ত বির্তকের ব্যাপারে আলোচনা করার আগে খতিয়ে দেখা দরকার যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর ইন্তেকালের সময় কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি আদৌ ছিলো কি- যা উত্তরাধিকারিদের মধ্যে বণ্টন করা যেতো? একথা সবার জানা যে, নবুয়্যত লাভের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সময় দীনের দাওয়াতের কাজেই ব্যয় হতো এবং তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক আগে থেকেই যেটুকু পুঁজি তাঁর কাছে ও হযরত খাদিজা (রা.) এর কাছে সঞ্চিত ছিলো, মক্কায় থাকাকালে তা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ হতো। যখন হিজরত করলেন, তখন সবকিছুই পরিত্যাগ করে খালি হাতে বেরিয়ে গেলেন। মদিনা পৌঁছে তিনি একেবারেই সহায়-সম্বলহীন হয়ে গেলেন। প্রাথমিক সময়টা তাঁর চরম অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে কাটলো। পরে যখন সশস্ত্র জিহাদের পালা শুরু হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-এর এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করার নির্দেশ দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই এক-পঞ্চমাংশ থেকে যতোটুকু সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় মনে করেন, নিজের জন্য ও নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যয় করার অনুমতি দিলেন। আর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা আল্লাহর রাহে এবং এতিম, মিসকীন ও প্রসাবীদের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করার নির্দেশ দিলেন।

www.icsbook.info

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

"জেনে রেখো, তোমরা যুদ্ধে জিতে যে সম্পদ লাভ করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ রসূলের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, এতিম, মিসকিন ও প্রবাসীদের জন্য।" (সূরা আনফাল : আয়াত ৪১)

এটাই ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া প্রথম জীবিকার উপকরণ।

এরপর হিজরতের ৪র্থ বছরে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মদিনার ইহুদী গোত্র বনু নজীরের উপর বিজয় দান করেন এবং তারা নিজেদের যাবতীয় সম্পত্তি ত্যাগ করে শহর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। এ সময় নিম্নোক্ত আয়াত দু'টো নাযিল হয় :

وَمَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

"আর যা কিছু আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তার রসূলকে আদায় করে দিয়েছেন, তা তোমরা ঘোড়া ও উট দাবড়িয়ে অর্জন করোনি। তবে আল্লাহ তার রসূলদেরকে যার উপর ইচ্ছা বিজয়ী করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (এভাবে) আল্লাহ তার রসূলকে বস্তিবাসীদের থেকে যাকিছু আদায় করে দিয়েছেন তা আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এতিম, মিসকিন ও প্রবাসীদের জন্য। যেন এ সম্পদ কেবল তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী, তাদের মধ্যেই ঘূর্ণায়মান না থাকে।" (সূরা হাশর : আয়াত ৬-৭)।

এ আয়াত দু'টোর আলোকে যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও এলাকা প্রত্যক্ষ সামরিক কার্যক্রমের ফলে নয় বরং কেবল ইসলামী সরকারের দাপটে ও ভয়ে বিজিত হয় আল্লাহ তাকে গনিমতের সম্পদ থেকে আলাদা করে সরকারের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুমতি দিলেন যে, তিনি নিজের ও নিজের আত্মীয়দের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই সরকারি সম্পত্তি থেকে যতোটুকু সমীচীন মনে করেন নিতে পারেন।

www.icsbook.info

এই বিধি অনুসারে তিনি মদিনায় বনু নজীরের পরিত্যক্ত বাগান থেকে কয়েকটি খেজুরের বাগান, খয়বর থেকে কিছু জমি এবং ফাদাক থেকে কিছু জমি নিজের জন্য বরাদ্দ করে নিয়েছিলেন। এই ভূ–সম্পত্তির উৎপন্ন ফসলাদি থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ও নিজের পরিবার–পরিজনের জীবিকা নির্বাহ করতেন, আত্মীয়–স্বজনকে সাহায্য করতেন, আর বাদ বাকি অংশ আল্লাহর দীনের কাজে ব্যয় করতেন।

চিন্তা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই দু'টো খাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গনিমত এবং বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ তথা ফায়') থেকে যেটুকু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছিল, তা তার নিজস্ব কারবার থেকে অর্জিত সম্পত্তি ছিলনা এবং তার ইন্তেকালের পরও তার মালিকানাভুক্ত থাকবে এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হবে এমন সম্পত্তি ছিলনা। বরঞ্চ যেহেতু তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নিজের সমগ্র সময়টা সরকারি কাজে ব্যয় করতেন এবং তার ব্যক্তিগত আয়ের কোনো উৎস ছিলনা, এজন্য তাকে এ অধিকার দেয়া হয়েছিল যে, সরকারি সম্পত্তির ততোটুকু অংশ নিজের ব্যবহার ও ভোগের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে পারেন, যা দ্বারা তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আল্লাহর রসূল নিজের জন্য সম্পত্তি ও জমিদারী অর্জনের জন্য নবুয়্যতের এতো বড় দায়িত্ব আঞ্জাম দেননি। নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খেদমত হিসেবেই একাজ করেছিলেন এবং এর প্রতিদান আল্লাহর কাছেই সমর্পিত ছিলো। রাষ্ট্রের সম্পদে তাঁর প্রাপ্য শুধু এতোটুকুই ছিলো, যা দিয়ে তিনি নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে ও পরিবার পরিজন ও অভাবি আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য দিতে পারেন। এ অংশ তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রাপ্য থাকতে পারে। তার ইন্তেকালের পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করার কোনো কারণ ছিলনা। এ বিষয়টা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকতেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন :

لاتقسم ورثتى دينارا ولادرهما - ماتركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة -

'আমার উত্তরাধিকারীরা কোনো সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করতে পারবেনা। আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা আমার স্ত্রীদের খোরপোশ ও আমার কর্মচারির পারিশ্রমিক দেওয়ার পর বাদ বাকি সব সদকা হয়ে থাকবে (বুখারি, মুসলিম মুয়াত্তা, মুসনাদে আহমদ)।

لانورث ماتركنا فهو صدقة - انما يأكل آل محمد من هذا المال ليس لهم ان يزيدوا على الماكل -

www.icsbook.info

“আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী থাকেনা। আমি যাকিছু রেখে যাবো তা সদকা। মুহাম্মদের পরিবার পরিজন এ সম্পদ থেকে কেবল খাদ্য পাবে। খাদ্যের চেয়ে বেশি কিছু নেওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই।” (বুখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)।

ان الله عزوجل اذا اطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذى يقوم بعده –

“আল্লাহ কোনো নবীকে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য যাকিছু দেন তা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্তের হাতে অর্পণ করেন।” (মুসনাদে আহমদ, আবু বকরের বর্ণনা)।

এ সম্পত্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব নির্দেশ গোপন ছিলনা, বরং সকল বড় বড় সাহাবি তা জানতেন। এসব হাদিস শুধু হযরত আবু বকর ও হযরত উমর বর্ণনা করেননি। হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হযরত উসমান, হযরত আবু হুরায়রা এবং সকল উম্মুল মুমিনীনগণের এ সাক্ষ্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারে এ ব্যবস্থাই করে গেছেন। এ নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এমন ধারণা কে করতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফাগণ তাঁর রেখে যাওয়া জমি জায়গা সম্পর্কে অন্য কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখেন?

এবার দেখা যাক, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর উত্তরাধিকারের দাবি কিভাবে উঠলো এবং তাঁর খলিফাগণ এ দাবির ব্যাপারে স্ব স্ব শাসনামলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শরিয়তের বিধি অনুসারে উত্তরাধিকারের দাবি তিনটি পক্ষ তুলতে পারে। এক হলো, হযরত ফাতিমা কন্যা হিসেবে। দ্বিতীয় হযরত আব্বাস চাচা হিসেবে। তৃতীয় সকল উম্মুল মুমিনীন স্ত্রী হিসেবে। প্রথম দুই পক্ষ অর্থাৎ হযরত ফাতিমা ও হযরত আব্বাস হযরত আবু বকরের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খায়বর, ফাদাক ও মদিনার যেসব জমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভোগদখলে ছিলো, তার সম্পর্কে দাবি পেশ করলেন। কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে হযরত ফাতিমা এরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করলেন যে, তোমাদের মৃত্যুর পর যদি তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি তোমাদের পরিবার পরিজন ও বংশধরের মধ্যেই বণ্টিত হয়ে থাকে, তাহলে আমার পিতার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমি কেনো উত্তরাধিকার পাবনা? এর জবাবে হযরত আবু বকর নিম্নরূপ বক্তব্য রাখেন :

www.icsbook.info

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ماتركنا صدقة وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به فانى اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ -

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমাদের উত্তরাধিকার চলেনা। যাকিছু আমরা রেখে যাই সবই সদকা। অতপর হযরত আবু বকর বললেন আমি এমন কিছু করতে বাদ রাখবোনা যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। কেননা আমার আশংকা হয় আমি যদি তার কোনো নির্দেশ ত্যাগ করি তাহলে গোমরাহ হয়ে যাবো।" (বুখারি, এক পঞ্চমাংশ ফরয হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়, মুসনাদে আহমদ, হযরত আবু বকরের বর্ণনা)।

ولكن اعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه -

"তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের খোরপোষ বহন করতেন, আমি তাদের খোরপোষ বহন করবো এবং তিনি যাদের উপর অর্থ ব্যয় করতেন আমিও তাদের উপর অর্থ ব্যয় করবো" (তিরমিযি, কিতাবুস সিয়ার, বাব মা জাআ ফী তারকাতি রসূলুল্লাহ (সা.), মুসনাদে আহমদ)

والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل من قرابتى -

"আল্লাহর কসম! আমার কাছে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সন্তুষ্টির চেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় স্বজনের সন্তুষ্টি বেশি প্রিয়।" (বুখারি, কিতাবুল মাগাযী)

হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) এর এই কথোপকথন সম্পর্কে যতোগুলো বিশুদ্ধ বর্ণনা আমাদের কাছে এসেছে, তার কোনোটিতে আভাস ইঙ্গিতেও একথার উল্লেখ নেই যে, হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.) হযরত আবু বকরের একথা শোনার পর জবাবে এমন কোনো পাল্টা অভিযোগ করেছেন যে, আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দিয়ে একটা ভুল কথা বলছেন। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তি যখন সঠিক ছিলো, তখন রসূলের সেই উক্তি থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তা কার্যকর করাই রসূলের খলিফার অবশ্যই করণীয় ছিলো। লক্ষণীয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশের কার্যকারিতা দ্বারা শুধু হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্বার্থ প্রভাবিত হয়না, স্বয়ং খলিফার কন্যা হযরত

www.icsbook.info

আয়েশা (রা.)-র স্বার্থও এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলো। কেননা এ নির্দেশের ফলে তিনিও স্বীয় স্বামীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক মহান খলিফা কেবল তাঁকেই এ আইনের আওতা থেকে বাদ দেবেন, তা কিভাবে সম্ভব? [১]

এবার আসা যাক তৃতীয় পক্ষের প্রসঙ্গে। অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীনদের প্রসংগে। বস্তুত: এ পক্ষটিও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, হযরত উসমান (রা.)-কে স্বীয় প্রতিনিধি বানিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)–এর কাছে পাঠাবেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্বীয় প্রাপ্য এক-অষ্টমাংশের দাবি জানাবেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) এর বিরোধিতা করলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বললেন :

اِلاَّ تَتَّقِيْنَ اللّٰهِ الم تعلمن اِنَّ النَّبِىَّ صَلّٰى اللّٰهُ عليه وسلم كان يقول لانورث فاتركنا صدقة (يريد بذالك نفسه) انما ياكل ال محمد فى هذا المال-

“আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেননা? আপনাদের কি জানা নেই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে বলতেন যে, আমাদের উত্তরাধিকার চালু হয়না। আমি যা কিছু রেখে যাবো তা হবে সদকা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজন এ সম্পদ থেকে শুধু নিজেদের খোরাকী পাবে।’

হযরত আয়েশা (রা.)–এর বক্তব্য শুনে উম্মুল মুমিনীনদের সকলে নিজেদের দাবি পরিত্যাগ করলেন।[২]

এ প্রসঙ্গে একটা জনশ্রুতির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সেটি এই যে, ফাদাক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবদ্দশায়ই ফয়সালা করে দিয়েছিলেন যে, ওটা হযরত ফাতিমা (রা.)–কে দেওয়া হবে। হযরত ফাতিমা

---

১. এ ঘটনায় বিস্তারিত বিবরণ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েতসমূহের জন্য দেখুন, বুখারি, ফারদুল খুমুছ, ফাযায়েল আসহাবিন্নবী, মাগাযি, ফারায়েজ সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ। মুসলিম : জিহাদ ও ফায় সংক্রান্ত অধ্যায়। নাসায়ী : ফায় বণ্টন সংক্রান্ত অধ্যায়। তিরমিযি : কিতাবুস সিয়ার, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। মুসনাদে আহমদ হযরত আবু বকরের বর্ণনা।

২. বুখারি : কিতাবুল মাগাযী, বনু নজীর প্রসঙ্গ, কিতাবুল ফারায়েয 'আমাদের উত্তরাধিকার হয়না'– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তি প্রসঙ্গে। মুসলিম : কিতাবুল জিহাদ, ফায় সংক্রান্ত বিধি। মুয়াত্তা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদ প্রসঙ্গে।

www.icsbook.info

(রা.) বিশেষভাবে সেটার জন্যই হযরত আবু বকর (রা.)–এর কাছে দাবি জানিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) ও হযরত উম্মে আয়মন (রা.) কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন না এবং ফাদাকের জমিও তাঁদের হাতে অর্পণ করলেননা।

তবে এ কাহিনীর কোনো প্রমাণ হাদিসে নেই, কেবল ঐতিহাসিক বালাজুরী ও ইবনে সা'দ এর উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাদের বর্ণনায় যথেষ্ট হেরফের রয়েছে। ইবনে সা'দের বর্ণনা এই যে, হযরত ফাতিমা (রা.) একথা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শোনেননি, বরং উম্মে আয়মনের কাছ থেকে শুনেছিলেন এবং তাকেই তিনি সাক্ষী হিসেবে পেশ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বালাজুরীর বর্ণনা মোতাবেক হযরত ফাতিমা নিজেই দাবি করেছিলেন যে, আমার পিতা ফাদাক আমাকে দিয়েছেন। আবার অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি হযরত আলী (রা.) এবং উম্মে আয়মনকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন। আর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে উম্মে আয়মন ও রাবাহকে (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত করা গোলাম) পেশ করেন।[১]

বর্ণনার দিক থেকে কাহিনীটির অবস্থা উপরে বর্ণিত হলো। এবার আইনগত দিক থেকে যদি বিচার বিবেচনা করা হয় তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কাজ 'হেবা' (দান) অথবা ওছিয়ত এই দুটো'র একটা হতে পারে। যদি বলা হয় যে, এটা হেবা বা দান ছিলো, তাহলে সেটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় ফাদাকের দখল ফাতিমা (রা.)কে দিয়ে দিলেই গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কেবল মৌখিকভাবে কোনো জিনিস কারোর জন্য মনোনীত করা এবং যাকে দেওয়া হলো সে মালিকের মৃত্যুর পর পাবে এরূপ নিয়ত করা হেবা নয়, বরং ওছিয়ত। আর যদি বলা হয় যে, ওটা ওছিয়ত ছিলো, তাহলে কুরআনে উত্তরাধিকারের বিধান নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং একথা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, لاوصية لوارث 'কোনো উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওছিয়ত করা যাবেনা।' এমতাবস্থায় একথা কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেরই ঘোষিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে অন্যান্য উত্তরাধিকারীকে বাদ দিয়ে কেবল একজন বিশেষ উত্তরাধিকারীর পক্ষে কোনো ওছিয়ত করে যেতে পারেন?

---

১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদ প্রসঙ্গ; ফতহুল বুলদান, বালাজুরী ফাদাক প্রসঙ্গ।

www.icsbook.info

তাছাড়া হেবা বা ওছিয়তের প্রশ্ন বাদ দিয়ে এই দাবির সপক্ষে যে সাক্ষী পেশ করা হয়েছিল সেটা যদি দেখা হয়, তাহলে তা কুরআন বিঘোষিত সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত বিধানের দাবিতে সুস্পষ্টরূপে অসম্পূর্ণ। কুরআনের দৃষ্টিতে হয় এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে যে দাবিদারের সাথে কোনরূপ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নয়, নতুবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। হযরত ফাতিমা (রা.) (যদি এই কাহিনী সঠিক বলে ধর্তব্য হয়) কেবল একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ অথবা কেবল একজন স্ত্রীর সাক্ষ্য হাজির করেছিলেন। এমতাবস্থায় আইনের বিপরীত ফয়সালা কিভাবে করা সম্ভব হতো? ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করে কি শরিয়তের সাক্ষদানের শর্ত পাল্টানো যেতো?

এরপর এ প্রশ্নটা হযরত উমর (রা.) এর আমলে আবার তোলা হয়। তাঁর খেলাফতের দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.) পুনরায় তাঁর কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা উত্থাপন করেন। হযরত উমর (রা.) খয়বর ও ফাদাক বাদে মদিনার জমিজমা হযরত আব্বাস ও হযরত আলীর তত্ত্বাবধানে এই শর্তে সমর্পণ করেন যে, তাঁরা এ জমির আয় কেবলমাত্র সেসব খাতে ব্যয় করবেন যেসব খাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় ব্যয় করতেন।[১] কিন্তু পরে এ জমির ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে হযরত আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.) মধ্যের বিরোধ বাঁধে। এই বিরোধ নিয়ে তারা হযরত উমরের দরবারে উপস্থিত হন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মালেক বিন আওস বিন হাদসানের বরাতে সকল নির্ভরযোগ্য হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মালেক বলেন : আমি হযরত উমরের দরবারে বসে আছি। এমন সময় তার দারোয়ান এসে জানালো যে, উসমান বিন আফফান, আব্দুর রহমান বিন আওফ, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। হযরত উমর (রা.) অনুমতি দিলেন এবং তাঁরা উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ পর দারোয়ান আবার এসে জানালো যে, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.) এবং আলী বিন আবি তালেব (রা.) এসেছেন এবং তারা অনুমতি প্রার্থী। হযরত উমর (রা.) এর অনুমতিক্রমে তাঁরাও দরবারে প্রবেশ করলেন। সালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করেই হযরত আব্বাস (রা.) বললেন : আমীরুল মুমিনীন! আমার এবং এর (হযরত আলী (রা.) কে দেখিয়ে)

---

১. বুখারী খুমুস ও মাগাযী সংক্রান্ত অধ্যায়, মুসনাদে আহমদ : আবু বকর (রাঃ) এর বর্ণনা, মুসলিম : জিহাদ সংক্রান্ত অধ্যায়, ফায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

www.icsbook.info

মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। অতপর চাচা ভাতিজা সম্পর্কে কিছু কড়া কড়া কথাও বললেন। উপস্থিত অন্যান্যরা বললেন : 'সত্যই আমীরুল মুমিনীন! ওদের দু'জনের বিবাদ অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। আপনি ওদেরকে এই বিরোধ থেকে নিষ্কৃতি দিন।' হযরত উমর (রা.) বললেন : দাঁড়ান, আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাস করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও জমিন টিকে আছে, আপনারা কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'আমাদের কেউ উত্তরাধিকারী হয়না। আমরা যা রেখে যাই তা সদকা?' চারজন সাহাবিই এক বাক্যে বললেন! জ্বী, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন। অতপর হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.) কে একইভাবে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনারা উভয়ে কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন? উভয়ে জবাব দিলেন : হ্যাঁ, সত্যিই তিনি একথা বলেছিলেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, বেশ তাহলে শুনুন, আমি আপনাদেরকে এ ব্যাপারটা বৃত্তান্ত জানাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা ফায় (বিনা যুদ্ধে বিজিত স্থানের ধন সম্পদ) এর ব্যাপারে স্বীয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কিছু বিশেষ অধিকার দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দেননি। অতপর সূরা হাশরের আয়াত وما افاء الله على رسوله শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে হযরত উমর (রা.) বললেন, এ আয়াত অনুসারে ফায়' এর যাবতীয় সম্পদ একচেটিয়াভাবে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। কিন্তু আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদেরকে বঞ্চিত করে এ সমস্ত সম্পদ শুধু নিজের জন্য পুঁজি করে রাখেননি কিংবা এগুলোর ব্যাপারে কোনো রকম স্বার্থপরতারও প্রশ্রয় দেননি। বরঞ্চ এ সমস্ত সম্পদ আপনাদের মধ্যেই বণ্টন করেছেন। শুধু তিন টুকরো জমি মদিনা, খয়বর ও ফাদাক অবশিষ্ট ছিলো। এই সম্পত্তি থেকে তিনি নিজের এবং পরিবার-পরিজনের পুরো বছরের ভরণ-পোষণ গ্রহণ করতেন। বাদ বাকি সমস্ত আয় সেসব কাজেই ব্যয় করতেন– যেসব কাজে আল্লাহর সম্পদ ব্যয় করা হয়। এ সম্পদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন এই কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছেন। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এসব তথ্য কি আপনাদের জানা আছে? বারজন সাহাবিই জবাব দিলেন : জ্বি হ্যাঁ, আমাদের জানা আছে। অতপর তিনি হযরত আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.) কে বললেন আমি আপনাদের উভয়কেও আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কি এ ব্যাপারে

www.icsbook.info

জানেন? তাঁরা জবাব দিলেন :এরপর আল্লাহ স্বীয় নবীকে তুলে নিলেন। হযরত আবু বকর 'এখন আমি আল্লাহর রসূলের তত্ত্বাবধায়ক' এই বলে এ সমস্ত সম্পত্তি নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ব্যবহার করতেন সেভাবেই ব্যবহার করলেন। আল্লাহ জানেন যে, আবু বকর (রা.) এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। অতপর আল্লাহ আবু বকরকেও তুলে নিলেন। এখন আমি এর তত্ত্বাবধায়ক হয়েছি। আমি নিজ দায়িত্বকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হয়ে হুবহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের নীতি অনুসরণ করেছি। আল্লাহ সাক্ষী যে, আমিও এ ব্যাপারে নির্ভুল ও সত্যাশ্রয়ী ছিলাম। অতপর (হযরত আব্বাস ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে সম্বোধন করে বললেন) আপনারা উভয়ে আমার কাছে এলেন এবং এই জমি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে সময়ে আপনারা উভয়ে একমত ছিলেন। হে আব্বাস! আপনি আমার কাছে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের উত্তরাধিকার চাইলেন। আর হে আলী! আপনি আমার কাছে স্বীয় স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁর পিতার উত্তরাধিকার দাবি করলেন। আমি আপনাদেরকে বললাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন لَانُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ هٰذَا "আমাদের কোনো উত্তরাধিকার থাকেনা। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সদকা মাত্র।" সুতরাং আপনারা যদি চান তবে এই শর্তে এ জমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি যে, আপনারা এর ব্যাপারে সেই নীতি অনুসরণ করবেন, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তারপরে হযরত আবু বকর অবলম্বন করেছিলেন এবং খলিফা হওয়ার পর থেকে আমিও অনুসরণ করে আসছি। কিন্তু এ শর্ত যদি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে এ বিষয়ে আমার সাথে আর কথা বলবেননা। অতপর হযরত উমর (রা.) অপর চারজন সাহাবিকেও আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : বলুন তো জনাব, আমি এক শর্তেই এ জমি এদের উভয়ের কাছে সমর্পণ করেছিলাম কি-না? তাঁরা বললেন হ্যাঁ। অতপর হযরত আব্বাস (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) কেও আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনাদের কাছে জমি সমর্পণ করার সময় আমি কি এ শর্ত আরোপ করেছিলাম? তার উভয়ে তা স্বীকার করলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) বললেন এখন আপনারা দু'জনে চাইছেন যে, আমি আগে যে ফয়সালা করেছিলাম তা থেকে ভিন্ন কোনো ফয়সালা যেনো করি। যে আল্লাহর হুকুমে আসমান ও জমিন টিকে আছে তাঁর শপথ করে বলছি, আমি কোনো ভিন্ন

www.icsbook.info

ফয়সালা করবোনা। আপনারা যদি এই শর্ত পূরণ করতে না পারেন তাহলে এ জমি আমার হাতে সমর্পণ করুন, আমি এর ব্যবস্থাপনা করবো।[১]

এই হলো হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এর আমলে যে বিরোধটি সংঘটিত হয়েছিল তার পূর্ণ ইতিবৃত্ত। এরপর যে কেউ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, এ বিষয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা জুলুম ছিলনা ন্যায়বিচার ছিলো। এছাড়া আরো দু'টো ব্যাপার রয়েছে যা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নজরে রাখা দরকার।

প্রথমত আসল বিবেচ্য বিষয় ছিলো এই যে, এই জমিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা যায় কিনা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের সরকারি কোষাগার থেকে ভরণ-পোষণ লাভের অধিকার আছে কিনা সেটা আলোচ্য বিষয় ছিলোনা। ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) খোদ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের চাইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের বহু গুণ বেশি খেদমত করেছেন। তাদের অধিকারকে অন্য যে কোনো অধিকারের চাইতে অগ্রাধিকার দিতেন এবং তাদের জন্য যে ভাতা চালু করেছিলেন তা খয়বর, ফাদাক ও মদিনার যাবতীয় জমির লব্ধ সম্পদের চেয়ে বেশি ছিলো।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এ প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী উপাদান তা হলো এই যে, খোদ হযরত আলী (রা.) যখন খলিফা হলেন তখন তিনিও এই জমিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার আখ্যায়িত করে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করেননি, বরং তাকে যথারীতি আল্লাহর পথে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হিসেবেই বহাল রাখেন।

জিজ্ঞাস্য এই যে, এটা যদি সত্যই উত্তরাধিকার হতো, তাহলে হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে স্বীয় খেলাফত আমলে তা থেকে উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত রাখা কিভাবে জায়েয হলো? এ কাজটিকে জুলুম বলে আখ্যায়িত করতেই যদি কারুর মন চায় তবে তার অন্ততঃ এতোটুকু ইনসাফ তো করা উচিত যে, যে যে ব্যক্তি

---

১. বুখারি : খুমুস সংক্রান্ত অধ্যায়, মাগাযী সংক্রান্ত অধ্যায়, নাফাকাত সংক্রান্ত অধ্যায়, ফারায়েয সংক্রান্ত অধ্যায়, কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায়। মুসলিম : জিহাদ সংক্রান্ত অধ্যায়, তিরমিযি মীরাছ সংক্রান্ত অধ্যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, আবু দাউদ : খিরাজ ও ফায় সংক্রান্ত অধ্যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, আবু দাউদ: খিরাজ ও ফায় সংক্রান্ত অধ্যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমদ : উমর ফারুক (রা.) এর বর্ণনা।

www.icsbook.info

একাজ করেছেন তাদের সবাইকে জালেম বলুক। একই কাজের দায়ে একজনের সম্পর্কে একরকম রায় এবং অন্যজনের ব্যাপারে আর একরকম রায় দেয়া কোনো ন্যায়পরায়ণ লোকের কাজ হতে পারেনা। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫৮)

কিরতাস (কাগজ) সংক্রান্ত ঘটনার পর্যালোচনা

প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তিনি কাগজে কিছু লিখে দিতে চাচ্ছিলেন। এ সম্পর্কিত আসল ব্যাপারটি কি? এ ঘটনাটির ব্যাপারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা কি ছিলো?

উত্তর : এ ঘটনাটি সম্পর্কে ইমাম বুখারি কিতাবুল ইলম, কিতাবুল জিযুয় ও কিতাবুল মাগাযীতে, ইমাম মুসলিম কিতাবুল ওছিয়ত এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মুসনাদে ইবনে আব্বাসে বিভিন্ন হাদিস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। এগুলোর সিলসিলা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উপরে এসে শেষ হয়ে যায়। অন্য কোনো সাহাবি এ প্রসঙ্গে কোনো সুস্পষ্ট রেওয়ায়েত পেশ করেননি। এ রেওয়ায়েতগুলোর সার নির্যাস হচ্ছে : ইন্তিকালের চারদিন আগে বৃহস্পতিবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ রোগ যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তাঁর শেষ সময় নিকটবর্তী মনে হচ্ছিলো। এ অবস্থায় তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন : 'লেখার সরঞ্জাম আনো। আমি তোমাদেরকে এমন একটা লিখন লিখে দেবো যার পরে তোমরা আর কখনো গোমরাহ হবেনা।' এ সময় ঘরের মধ্যে অনেক লোক ছিলেন। হযরত উমর (রা.) বললেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছেন, আমাদের কাছে কুরআন রয়ে গেছে, আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে মতবিরোধ দেখা দিলো। অনেকে বললেন : লেখার সরঞ্জাম আনা উচিত, যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা লিখে দিতে পারেন, যার পরে আমরা আর গোমরাহ হবোনা। অনেক সাহাবা হযরত উমরের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালেন। আবার অনেকে বললেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে আবার জিজ্ঞেস করা হোক, সত্যিই তিনি কি কিছু লিখতে চান অথবা নিছক রোগের প্রভাবে তিনি কি দিশেহারা হয়ে একথা বলেছেন? [১] এভাবে অনেক

---

১. এখানে আসল শব্দ হচ্ছে : 'মা শানুহু, আ-হাজারা ইসতাফহিমুহ?" অর্থাৎ 'রোগের মারাত্মক প্রভাবে তিনি কি দিশেহারা হয়ে একথা বলেছেন? কাজেই তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করো।' কিন্তু কিছু লোক ভ্রমাত্মকভাবে একে 'আহজারা' মনে করেছেন। অথচ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর 'আহাজারা' শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ এতে রয়েছে প্রশ্নবোধক হামযা। আর হাজারা-ইয়াহজুরু মানে হচ্ছে : এমন কথা যা রোগের প্রভাবে রোগী ঘাবড়ে গিয়ে বা দিশেহারা হয়ে বলে থাকে।

উপরন্তু একথাটি কোনো রেওয়ায়েতেও হযরত উমরের সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং 'কা-লু' শব্দটির সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে উপস্থিত লোকদের অনেকে বলেন। -লেখক।

www.icsbook.info

লোক পরস্পর বির্তকে লিপ্ত হলেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন। এতে তিনি বললেন :

دروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه قوموا عني ولاينبغي عندي التنازع –

অর্থাৎ "আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি তা সেই অবস্থা থেকে ভালো যেদিকে তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছো। আমার কাছ থেকে চলে যাও। আমার কাছে (বসে) ঝগড়াঝাটি করা ঠিক নয়।"

এরপর ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ের ওছিয়ত করেন। এক, মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেবে। দুই, বাইরে থেকে যেসব প্রতিনিধি দল আসবে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে খাতির তোয়াজ করবে যেমন আমি করতাম। তৃতীয় কথাটি হয়তো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি অথবা বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন। হাদিস থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়না যে, ইবনে আব্বাস নিজেই ভুলে গেছেন অথবা মাঝখানের কোনো বর্ণনাকারীর এ বিস্মৃতি ঘটেছে।

এটিই হচ্ছে সম্পূর্ণ ঘটনা। সোজাভাবে যদি কেউ ঘটনাটি বুঝতে চায় তাহলে আসল ঘটনাটি বুঝতে সক্ষম না হবার কোনো কারণ নেই। নিজেদের প্রাণপ্রিয় নেতা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছেন দেখে সবাই উদ্বেগ আকুল হয়ে পড়েছেন। রোগ কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

সবার চোখের সামনে প্রিয় নবীর কঠিন যন্ত্রণা কাতর মুখ ফুঠে উঠছিল। ইবনে আব্বাসের (রা.) নিজের অবস্থা এমন ছিলো যে, এ ঘটনার অনেক বছর পরে শাগরিদদের সামনে একদিন 'বৃহস্পতিবার' শব্দটি বলার পর তিনি ভীষণভাবে কাঁদতে শুরু করলেন। শাগরিদরা জিজ্ঞেস করলেন, বৃহস্পতিবারের ব্যাপারটি কি, যার কথা স্মরণ করে আপনি এতো কান্নাকাটি করছেন? জবাবে তিনি বললেন সে দিনটি ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণার দিন। এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, ঠিক যে সময় তিনি এভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন তাঁর জন্য উৎসর্গীতপ্রাণ ভক্ত–অনুরক্তদের কি অবস্থা ছিলো? এ অবস্থায় কলম ও দোয়াত আনার জন্য তিনি বললেন এবং এর উদ্দেশ্য বললেন, তিনি এমন একটা কিছু লিখিয়ে দেবেন যা পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতকে গোমরাহী থেকে বাঁচাবে। রোগ যন্ত্রণার কারণে হতে পারে তাঁর মুখ থেকে কথাটি ভালোভাবে ব্যক্ত করতে পারেননি। এজন্য উপস্থিত কারোর মনে সংশয় জাগে, তিনি হয়তো বেশি পেরেশানীর কারণে কিছু বলেছেন, যা আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করে সঠিকভাবে জেনে নেয়া দরকার। এ সময় হযরত উমর (রা.) যা বলেন তার

www.icsbook.info

সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো এই : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছেন। এ সময় তিনি উম্মতের চিন্তায় অস্থির এবং তাদের জন্য কিছু লিখে দিয়ে যেতে চান, যাতে তাঁর অবর্তমানে তারা নিজেদেরকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ না করে। কিন্তু এ সময় তাঁকে এভাবে কষ্ট দেয়া সংগত হবেনা। উম্মতের হেদায়াতের জন্য কুরআন রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ তাদেরকে গোমরাহী থেকে বাঁচাবার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে।" হতে পারে এই সংগে হযরত উমর (রা.) এও আশংকা করে থাকতে পারেন যে, ওছিয়ত লিখতে লিখতে যদি তাঁর বিদায়ের সময় এসে যায় এবং তাঁর বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে তা আবার উম্মতের জন্য ফিতনার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। বলাবাহুল্য এটা একেবারেই স্বাভাবিক ছিলো, এ সময় কেউ জ্ঞান ও হেদায়াত লাভের লোভে অবশ্যি তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখে নিতে হবে, এমন ধরনের জিদ ধরে বসেননি। কেউ ভালোবাসার কারণে এবং কেউ দূরদর্শিতার জন্যও এ সময় তাঁকে বিরক্ত করা ও কষ্ট দেয়া সংগত মনে করেননি। আবার কেউ এ সন্দেহে পড়ে যান যে, সত্যিই কি তিনি কিছু লেখাতে চান অথবা নিছক রোগের প্রকোপে মানসিক অস্থিরতার দরুন একথা বলছেন? এ তিন ধরনের লোকদের মধ্যে কারোর কথাও এ অবস্থায় অনাকাংখিত বা অসংগত ছিলনা।

এবার একথায় আসা যাক, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু লেখাতে চাচ্ছিলেন তার ধরনটা কি ছিলো? সাধারণ উপদেশের ন্যায় অথবা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ হুকুম তিনি লিখিয়ে দিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন যা কেবলমাত্র কাগজের পাতায় লিখিয়ে দিয়ে যাওয়াটাই উম্মতের হেদায়েতের জন্য জরুরি ছিলো? পরবর্তী ঘটনাবলি নিজেই এর ফয়সালা শুনিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো চার দিন বেঁচে ছিলেন। ঐ দিনগুলোয় রোগের প্রকোপ সব দিন সব সময় সমান থাকেনি। আর ঐ দিনগুলোর বৃহস্পতিবার ঐ বিশেষ সময়ে যেসব লোক তাঁর কাছে বসেছিলেন তাঁরা সবাইও একসংগে উপস্থিত থাকেননি। বরং ঐ দিনগুলোয় তিনি মসজিদে নববীতে গিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের সামনে নিজের বক্তব্য রাখার সুযোগও পেয়েছেন। যদি সত্যিই লিখিত আকারের সংরক্ষিত করার মতো তাঁর কোনো নির্দেশ থাকতো তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর কাতিবদেরকে ডেকে অথবা আহলে বাইতদের মধ্যে থেকে কাউকে বলে তা লিখিয়ে নিতে পারতেন। অথবা মুখে বলেও দিতে পারতেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, হযরত উমর (রা.) যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা যথার্থ ছিলো। তিনি

www.icsbook.info

ঠিকই বুঝেছিলেন যে, রোগের প্রকোপে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের ভবিষ্যত মংগলের কথা চিন্তা করে পেরেশান হয়ে পড়েছেন এবং কিছু নসীহত লিখিয়ে যেতে চাচ্ছেন। কোনো মৌলিক বিষয় লিখে দেয়া এ সময় তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাই এই কঠিন মুহূর্তে তাঁকে কষ্ট দেয়া ঠিক হবেনা। আমাদের দোয়াত কলম আনার পরিবর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সময় নিশ্চয়তা দান করা উচিত যে, তিনি যেনো আমাদের জন্য পেরেশান না হন, তিনি নিজের উম্মতকে এমন একটি হেদায়েতের কিতাব দিয়ে যাচ্ছেন যা ইনশাআল্লাহ তাদেরকে কখনো পথভ্রষ্ট হতে দেবেনা।

সবশেষে হযরত আলীর (রা.) একটি রেওয়ায়েত প্রণিধানযোগ্য। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলে এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত হয়েছে। এতে হযরত আলী (রা.) বলেন : "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কাঁধের একটা হাড় আনার হুকুম দিলেন। তাতে তিনি এমন একটি বিষয় লিখে দিতে চাইলেন যার ফলে তাঁর পরে তাঁর উম্মত গোমরাহ হতে পারবেনা। আমার আশংকা হলো, আমি আনতে আনতে তাঁর ইন্তিকাল না হয়ে যায়। তাই আমি বললাম : আপনি বলুন, আমি তা মুখস্থ করে নেবো। একথায় তিনি বললেন : আমি ওছিয়ত করছি নিয়মিতভাবে নামায পড়ার ও যাকাত আদায় করার এবং তোমাদের মালিকানাধীন গোলামদের সাথে সদ্ব্যবহার করার।" (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৫৮)

হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ থেকে আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব

প্রশ্ন : ইসলামে যখন চার বিয়ের অনুমতি রয়েছে তখন হযরত ফাতিমা (রা.) বেঁচে থাকা অবস্থায় যখন হযরত আলী (রা.) দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাঁধা দিলেন কেন? আবু জাহেলের কন্যা রসূল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে আগমন দ্বারা যদি কোনো ক্ষতির আশংকা থাকতো তাহলে আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে আগমনেও কি সেই একই ক্ষতির আশংকা ছিলনা?

উত্তর : এ ঘটনাটি ইমাম যয়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন (রা.) এবং আবু মুলাইকা হযরত মিছওয়ার বিন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের একটি বর্ণনা দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আবু হানযালা এবং সুয়াইদ বিন গাফালার বর্ণনাও এর সমর্থক। ইমাম বুখারি খুমুস সংক্রান্ত অধ্যায়ে সাহাবায়ে কিরামের ফযিলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে এবং বিয়ে

www.icsbook.info

সংক্রান্ত অধ্যায়ে, ইমাম মুসলিম সাহাবাদের ফযিলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে, আবু দাউদ বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ ও বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়ে, তিরমিযি সাহাবায়ে কিরামের ফযিলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে এবং হাকেম সাহাবা পরিচিতিমূলক মারেফাতুস সাহাবা গ্রন্থে একাধিক সূত্রের বরাতে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন আবু জাহেলের পরিবার মুসলমান হয়ে গেলো, তখন হযরত আলী (রা.) তার কন্যাকে (তার নাম কারো মতে জুয়াইরিয়া, কারো মতে আওরা, কারো মতে জামীলা) বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন। কন্যার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মতি না নিয়ে তার মেয়ের ঘরে মেয়ে দেবোনা। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ প্রস্তাবের কথা জানালো, এক বর্ণনা মতে, স্বয়ং হযরত আলী (রা.) নিজেও আভাস ইঙ্গিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত ফাতিমা (রা.) নিজেও এসব কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলেন এবং গিয়ে স্বীয় পিতার খেদমতে আরজ করলেন 'আপনার বংশের লোকেরা মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের ধার ধারেননা। দেখুন, আলী এখন আবু জাহেলের মেয়েকে বিয়ে করতে চান।' একথা শোনার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণে বললেন :

ان بنى هشام بن المغيرة استأذنونى ان ينكحوا ابنتهم على ابن ابى طالب فلا اذن ثم لااذن ثم لااذن الا ان يريد ابن ابى طالب ان يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فانما هى بضعة منى يريبنى ماارابها ويؤذينى ما اذاها –

"বনি হিশাম বিন মুগীরা তাদের কন্যাকে আলী বিন আবি তালেবের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি চেয়েছে। আমি এর অনুমতি দেইনা, দেইনা, দেইনা। তবে আবু তালেবের ছেলে যদি আমার মেয়েকে তালাক দিতে চায় এবং তাদের মেয়ে বিয়ে করে, তবে সেকথা আলাদা। আমার মেয়ে আমার টুকরো, তার যা অপছন্দ হবে তা আমারও অপছন্দ। আর যা তার জন্য কষ্টদায়ক তা আমার জন্যও কষ্টদায়ক।"

وَاسْمَعُوْا فَاغْسِلُوْا وَاِنِّىْ لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا –

"আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করছিনা। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে এক জায়গায় সমবেত হতে পারেনা।"

www.icsbook.info

(وفى رواية) ان فاطمة منى وانا اتخوف ان تفتن فى دينها-

"(এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন) ফাতিমা আমারই অংশ এবং আমার আশংকা হয় যে, সে স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে সংকটে পড়ে যাবে।"

এ ঘটনা প্রসঙ্গে কারো কারো মনে এরূপ প্রশ্ন জাগে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অনেকগুলো বিয়ে করেছেন এবং সাধারণ লোকদেরকেও এক সাথে চারটে পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ নিজের মেয়ের একজন সতিন আসবে এটা তিনি সহ্য করলেননা। সতিন আসার কারণে তাঁর মেয়ের যে কষ্ট হতে পারে এবং মেয়ের কষ্টের কারণে স্বয়ং তাঁর যে কষ্ট হতে পারে, সেই কষ্ট তো অন্য মহিলাদের এবং তাদের মা বাপেরও হতে পারে, তাহলে কোন্ কারণে তিনি নিজের ব্যাপারে এটা বরদাশত করলেননা অথচ অন্যদের ব্যাপারে তা বৈধ রাখলেন?

উত্তর : দৃশ্যত এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। ঘটনার সরল আঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে মানুষ মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই এর রহস্য বুঝা সম্ভব। একথা অস্বীকার করা যায়না যে, কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি আর একজন স্ত্রী নিয়ে আসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেটা তার কাছে অপ্রীতিকর লাগবে এবং তার মা বাপ ভাই বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও এতে মনে কষ্ট পায়। শরিয়তে একাধিক বিয়ের অনুমতি এ ধারণার ভিত্তিতে দেওয়া হয়নি যে, ঘরে সতিন আসা স্ত্রী ও তার আপনজনদের কাছে বিরক্তিকর নয়, বরং ওটা যে বিব্রতকর, সে বাস্তবতাকে জানা সত্ত্বেও শরিয়ত এ কাজকে এজন্য হালাল করেছে যে, অন্যান্য কতকগুলো বৃহত্তর সামষ্টিক ও সামাজিক স্বার্থের খাতিরে এর প্রয়োজন দেখা দেয়। শরিয়ত একথাও জানে যে, সতিনরা কখনোই সখীর মতো বা এক স্বামীর অধীনস্থ বোনদের মতো জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়না। তাদের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বন্দ্ব-কলহ হবেই এবং পারিবারিক জীবন তিক্ততা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেনা। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ের এসব কদর্যতা সেই সর্বগ্রাসী সামষ্টিক কদর্যতার তুলনায় নগণ্য, যা আইনগতভাবে এক বিয়ে বাধ্যতামূলক করে দেয়াতে গোটা সমাজে দেখা দিয়ে থাকে। এ কারণেই শরিয়ত একাধিক বিয়েকে হালাল করে দিয়েছে।

এবার দেখুন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে কি জটিলতার উদ্ভব হয়। শরিয়তের বিধান অনুসারে তাঁর জামাই-এর জন্যও তাঁর কন্যার জীবদ্দশায় সতিন আনা বৈধ ছিলো। সেজন্যই হযরত আলী একাজ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। আর এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর

www.icsbook.info

জন্য একাজকে হারাম বলেননি। তিনি বরঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমি হালালকে হারাম করছিনা। কিন্তু এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই সত্তায় দুটো বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। একটির বিচারে তিনি মানুষ ছিলেন এবং তাঁর কন্যার ঘরে সতিন এলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হবে, তার কমবেশি প্রভাব তাঁর মনের উপরও পড়া অনিবার্য ছিলো। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি আল্লাহর রসূল ছিলেন এবং রসূল হিসেবে তার মর্যাদা এরূপ ছিলো যে তাঁর সাথে যদি কারো সম্পর্ক খারাপ হয় যায় এবং কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর জন্য মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে ব্যক্তির ঈমান ও ইসলাম পর্যন্ত বিপন্ন হবার আশংকা ছিলো। এজন্যই তিনি হযরত আলী (রা.) এবং বনু হিশাম বিন মুগিরা উভয়কেই এ বিয়ে থেকে বিরত রাখেন। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে হালাল হলেও এ বিয়ে হযরত আলী (রা.) এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার পরিবারের ঈমান ও পরকালের মুক্তিকে বিপণ্ন করে তুলতে পারে এরূপ আশংকা ছিলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাষণে আরো একটি কথা বলেছিলেন। তা এই যে, বনু হিশাম বিন মুগিরা ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কট্টর দুশমন ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর তারা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছে। স্বয়ং এই মেয়ের বাপ আবু জাহেল সম্পর্কে সবাই জানে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনীতে কাফেরদের সবাইকে টেক্কা দিয়েছিল। তাছাড়া এটাও বাস্তব ঘটনা যে, বদর যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে নিহত হয় এবং তার পরিবার বহু বছর যাবত তার প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলতে থাকে। এখন তারা যদিও ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু এ ইসলাম গ্রহণ সত্যিই পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও মনমগজের সার্বিক পরিবর্তনের ফল ছিলনা কেবল পরাজয়ের পরিণতি, সেটা তখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এ পরিস্থিতিতে যে গৃহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে গৃহ সম্রাজ্ঞী হিসেবে বর্তমান, সেই গৃহে ঐ পরিবারের মেয়ের আর তাও খোদ আবু জাহেলের মেয়ের সতিন হয়ে আসাটা বহু অনর্থের কারণ হতে পারতো। এ পরিবারের লোকদের সাথে মুসলমানদের প্রীতি ও সখ্যতা জন্মানোর চেষ্টা করাতে আপত্তির কিছু ছিলনা এবং তা করাও হয়েছে। কিন্তু ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্কের মান বা ঘনিষ্ঠতা কোন্ পর্যায়ের তা সঠিকভাবে না জানা পর্যন্ত স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে তাদেরকে ঢুকিয়ে নেয়া এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করানো অত্যন্ত অপছন্দ ও

www.icsbook.info

বিপজ্জনক ব্যাপার হতো। এ কারণেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিয়েতে ঘোর আপত্তি ও অসম্মতি জানিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, আল্লাহর রসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে এক ঘরে সমবেত হতে পারেনা। তিনি আভাসে ইঙ্গিতে একথাও বলে দিয়েছিলেন যে, এতে স্বয়ং ফাতিমা (রা.)-এর সংকটময় পরিস্থিতিতে পতিতো হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, কোনো ব্যক্তিকে তার বিয়ে শাদীর ব্যাপারে (তা যদি বৈধও হয়) এমন স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারেনা, যা সমগ্র উম্মতের জন্য সংকট ও অকল্যাণের উদ্ভব ঘটাতে পারে।

এখানে এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে যে, ইসলামের শত্রুতায় আবু সুফিয়ানের পরিবার আবু জাহেলের পরিবারের চাইতে কম ছিলনা। তাই আবু জাহেলের পরিবারের মেয়ের রসূলের পরিবারে আসাটা যদি অনর্থের কারণ হতে পারে তাহলে আবু সুফিয়ানের মেয়ে হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়াতে বিপদাশংকা না থাকার হেতু কি? তবে এই দু'জনের মধ্যকার ব্যবধান লক্ষ্য করলে এ প্রশ্ন আপনা আপনি বিলুপ্ত হয়ে যায় প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আবু জাহেলের মেয়ে এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবার মধ্যে আদৌ কোনো তুলনাই চলেনা। আবু জাহেলের মেয়ে এবং তার চাচা ও ভাই সকলে মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিল। তাদের ঈমান কতোটা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ এবং তাতে পরাজয়ের প্রভাব কতোখানি, সেটা তখনো পর্যন্ত পরীক্ষিত হয়নি। হযরত উম্মে হাবীবার ব্যাপার ঠিক এর বিরপীত। যতো বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি নিজের পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, অতো বড় পরীক্ষায় বড় বড় সাহাবিদেরও অনেককে পড়তে হয়নি। ইসলামের খাতিরে তিনি এতো ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন যে, তার তুলনা মেলা কঠিন। একটু ভেবে দেখুন, তিনি আবু সুফিয়ানের মেয়ে, হযরত হামযার কলিজা চিবানো কুখ্যাত হিন্দের কলিজার টুকরা, কুরআনে যাকে কাষ্ঠ বহনকারিণী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে, আবু লাহাবের সেই স্ত্রীর ভ্রাতৃষ্পুত্রী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জঘন্য দুশমন উৎবা বিন রাবীয়ার দৌহিত্রী। এহেন পরিবার এবং এহেন পরিবেশ অতিক্রম করে তিনি হযরত উমর (রা.) এবং হযরত হামযারও আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজের স্বামীকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। পরিবারের লোকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করে চলে যান। আবিসিনিয়ায় গিয়ে স্বামী খৃষ্টান হয়ে গেলে ইসলামের খাতিরে তিনি সেই স্বামীকেও পরিত্যাগ

www.icsbook.info

করেন। প্রবাস জীবনে একটি ছোট মেয়েকে সাথে নিয়ে একাকিনী থাকেন এবং এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতেও তার ঈমানী দৃঢ়তা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়না। এ অবস্থায় যখন কয়েকটি বছর কেটে যায় এবং এই অসহায় মহিলা যখন বিদেশে সব রকমের দুঃখ মুসিবত সহ্য করে প্রমাণ করে দেন যে, উচ্চ মানের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, যে পরিপক্ক চরিত্র ও অবিচল ব্যক্তিত্ব ইসলাম কামনা করে, তা সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভদৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে এবং তিনি আবিসিনিয়াতেই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। খয়বর যুদ্ধের পর তিনি আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হিসেবে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি লংঘন করে এবং তারা আশংকা করে যে, এবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা আক্রমণ করবেন। এ সময় সন্ধির আলোচনার জন্য আবু সুফিয়ান মদিনায় আসে এবং মেয়ের সাহায্যে সন্ধির শর্ত মঞ্জুর করানো সহজ হবে ভেবে মেয়ের কাছে চলে যায়। বহু বছরের বিচ্ছেদের পর প্রথমবার মেয়ে বাপের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসতে যায়, অমনি তিনি এই বলে বিছানা তুলে নেন যে, রসূলের বিছানায় ইসলামের শত্রুর বসার কোনো অধিকার নেই। এরূপ মহিলার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে প্রবেশের অর্থ ছিলো, একটি হীরক খণ্ড যেনো হারের যথাস্থানে স্থাপিত হলো। এর কারণে কোনো অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা তো দূরের কথা, তেমন কথা ধারণা করাই অসম্ভব। তবে যে মেয়ের পরিবার কেবল মক্কা বিজয়ের কারণে মাত্র কয়েক মাস আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে মেয়ের এ পরিবারে প্রবেশ অবশ্যই বিপর্যয় ও অশান্তি ডেকে আনতে পারতো। একমাত্র তার সম্পর্কেই এ প্রশ্ন উঠার অবকাশ ছিলো যে, ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার মনোভাব থেকে সে ও তার পরিবারের লোকেরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পেরেছে কিনা। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫৮)

রসূলের কাফন দাফন বাদ দিয়ে সাহাবাগণ কি খিলাফতের চিন্তায় বিভোর ছিলেন?

প্রশ্ন : সাহাবায়ে কিরাম এবং বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমরের (রা.) বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয় যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফনে শরিক হননি, বরং খিলাফত ও বাইয়াতের

www.icsbook.info

ঝগড়ায় লিপ্ত থাকেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফনে শরিক হওয়া ছিলো বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। এটা কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবি ছিলনা?

উত্তর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাশের কাফন দাফন করা হয়নি, তা বাইরে পড়ে ছিলো এবং সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফনের চিন্তা বাদ দিয়ে খিলাফতের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন– এটা আসলে একটা ভিত্তিহীন গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল ঘটনা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হয় সোমবার সাঁঝের কাছাকাছি সময়ে। বুখারি ও মুসলিম শরিফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু 'আখেরে ইয়াওম' (দিনের শেষ ভাগ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা থেকে বুঝা যায়, এই বিরাট শোকাবহ ঘটনাটি আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময় ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনায় আহলে ঈমানদের সমগ্র দলটির মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। তাদের মধ্যে এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র কিছু ছিলনা। হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু তো বিশ্বাসই করতে পারছিলেননা যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এসে বক্তৃতা করার পরই লোকদের পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মালো যে, সেই অনিবার্য ঘটনাটি ঘটে গেছে। ততোক্ষণে রাতের আঁধার ছেয়ে গিয়েছিল। রাতের মধ্যে কাফন দাফনের কাজ সমাধান করা সম্ভবপর ছিলনা এবং এটা সংগতও ছিলনা। কারণ মদিনা তাইয়েবা ও এর আশেপাশের জনপদে বসবাসকারী হাজার হাজার মুসলমান জানাযার নামাযে শরিক হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়াকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারতেন না। নিঃসন্দেহে তারা অভিযোগ আনতেন, তাদেরকে শেষ দেখা ও জানাযার নামাযে শরিক হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই যেভাবেই হোক না কেনো রাতটা তো কাটাতেই হতো। সে রাতে সাহাবাদের বিভিন্ন দল নিজেদের জায়গায় সমবেত হয়ে ভাবছিলেন এখন কি হবে। রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণ হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার ঘরে জমায়েত হয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য আত্মীয়গণ সাইয়েদা ফাতিমা যুহরা রাদিআল্লাহু আনহার ঘরে সমবেত ছিলেন। মুহাজিরদের একটি বিরাট দল

www.icsbook.info

হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে বসে ছিলেন শোকার্ত, বেদনাহত চিন্তাক্লিষ্ট মুখে। আনসারদের বিভিন্ন দল তাদের নিজেদের গোত্রের দহলিজে (সাকীফার আসল মানে হচ্ছে দহলিজ বা বৈঠকখানা এবং আধুনিক পরিভাষায় কমিউনিটি সেন্টার) জমায়েত হচ্ছিলেন। এমন সময় কেউ এসে খবর দিল বনী সায়েদার দহলিজে (সাকীফায়ে বনী সায়েদা) আনসারদের একটি বিরাট দল সমবেত হয়েছে এবং সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের প্রশ্ন উঠেছে এবং এর উপর আলোচনা চলছে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) যাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মতের মধ্যে প্রবীণ মনে করা হতো, তাঁরা এ খবর শুনে চিন্তায় পড়ে গেলেন। সবেমাত্র মিল্লাতের প্রাণপ্রিয় নেতা চোখ বুজেছেন। সমস্ত উম্মত শোকে আত্মহারা। কোনো বড় ধরনের ফিতনার দরজা যেন খুলে না যায়। নতুন করে জামাতের শৃঙ্খলা কায়েম হবার আগেই যেন বিশৃঙ্খলা সমাজ দেহে জুড়ে না বসে। তাই তাঁরা তিনজন সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। সেই রাতেই তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের প্রশ্নটির সমাধান করে ফেললেন। অথচ ইতিপূর্বে তা একটা ফিতনার রূপ নিতে যাচ্ছিলো। তাঁরা এ প্রশ্নটির এমন নির্ভুল সমাধান করলেন, যার নির্ভুল হবার ব্যাপারে ইতিহাস তার সাক্ষ্য পেশ করে দিয়েছে। যে সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন এসব ঘটনা সেই সন্ধ্যা গত রাতের। বলাবাহুল্য ঐ রাতে রসূলের কাফন দাফন সম্ভব ছিলনা, এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। ঐ রাতেই খিলাফতের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। সকালেই হযরত আবু বকর সিদ্দিকের খিলাফতের কথা ঘোষণা করা হয় মসজিদে নববীতে। মুহাজির ও আনসারগণ তা কবুল করে নেন এবং জামাতের শৃঙ্খলা পুনর্বহাল করেন। এরপর আর কোনো প্রকার দেরি না করেই রসূলের কাফন দাফনের কাজ শুরু হয়।

সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের খিলাফতের চিন্তায় মশগুল থাকেন আর রসূলের আহলে বাইতরাই তাঁর কাফন দাফন করেন– একথা বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সোমবার ও মংগলবারের মাঝখানের রাতে কেউ তাঁর কাফন দাফন করেননি। মঙ্গলবার সকালে হযরত আবু বকরের (রা.) বাইয়াত অনুষ্ঠান শেষ হবার পর থেকেই তাঁর কাফন দাফনের কাজ শুরু হয়। হযরত আয়েশার (রা.) ঘরেই একাজ শুরু হয়। এ ঘরের একটি দরজা খোলা হতো মসজিদে নববীর দিকে। মদিনা তাইয়েবার সমস্ত সাহাবাই তখন এই মসজিদে সমবেত

www.icsbook.info

ছিলেন। আশেপাশের লোকেরাও ইন্তিকালের খবর শুনে এখানে এসে জমা হচ্ছিলো। এখানেই হযরত আবু বকরের (রা.) হাতে খিলাফতের বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। যারা কখনো মসজিদে নববী যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং স্বচক্ষে আয়েশার (রা.) হুজরা (যেখানে রসূল সমাহিত আছেন) ও মসজিদে নববীর অবস্থানগত সম্পর্ক দেখেছেন তারা একথা শুনে হাসি সামলাতে পারবেন না যে, সাহাবাগণ মসজিদে নববীতে খিলাফতের চিন্তায় মশগুল ছিলেন আর এদিকে বেচারা আহলে বাইতরা আয়েশার (রা.) হুজরায় রসূলের কাফন দাফন করছিলেন। মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে গেলেও তো তার জন্য কিছুটা যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতরাই কেবল তার গোসল ও কাফন দাফন করেন একথাও সত্য নয়। একাজ সম্পাদন করেন হযরত আলী (রা.), হযরত আব্বাস (রা.) হযরত ফজল বিন আব্বাস (রা.) হযরত কুসাম বিন আব্বাস (রা.), হযরত উসামা বিন যায়েদ ও শুকরান (রা.) (রসূলুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম)। হুজরার দরজা তাঁরা এ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখেন যে, বাইরে হাজার হাজার লোক হুযুরের চেহারা মুবারক এক নজর দেখার জন্য তাদের হৃদয়ের সমস্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় দরজা খোলা থাকলে বেশি লোকের ভিতরে ঢুকে পড়ার আশংকা ছিলো এবং এর ফলে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়তো, তবুও আনসাররা এই বলে যখন চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন যে, তাদেরকেও এ সৌভাগ্যের অংশিদার করতে হবে তখন তাদের মধ্যে থেকেও একজনকে (আওস বিন খাওলী) ভিতরে ডেকে নেয়া হলো। কাফন পরাবার পর প্রশ্ন দেখা দিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কবর খোঁড়া হবে কোথায়? হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হাদিস পেশ করলেন (নবী যেখানে ইন্তিকাল করেন সেখানেই তাকে দাফন করা হয়)। এরই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলো হযরত আয়েশার (রা.) হুজরার মধ্যেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে। হযরত আবু তালহা যায়েদ বিন সাহল আনসারী (রা.) কবর খুঁড়লেন। এরপর লোকেরা দলে দলে ভেতরে গিয়ে জানাযার নামায পড়তে লাগলেন। রাত পর্যন্ত অনবরত এ সিলসিলা চলতে থাকলো অবশেষ মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যকার রাতে প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দাফন কাজ সমাধা হলো। জানিনা এ সমগ্র সময়ের কোন্ অংশে রসূলের আহলে বাইতরা তামাম সাহাবাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নি:সহায় ও নিরাবান্ধব অবস্থায় রসূলের পবিত্র লাশ নিয়ে প্রহর গুনেছেন এবং অন্যদিকে সাহাবাগণ তাদের খিলাফতের চিন্তায় মশগুল ছিলেন? (তরজমানুল কুরআন : ১৯৫৮, নভেম্বর)

www.icsbook.info

শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যেকার কতিপয় বিরোধপূর্ণ বিষয়

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলির জবাব দিয়ে বাধিত করবেন। মূলত এগুলো আমার এক শিয়া বন্ধুর প্রশ্ন।

১. অযুর বিধি সম্বলিত আয়াতে (৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদা ২য় রুকু) ------------ (ধৌত কর) এবং ------------- (মসেহ কর) এই দুটো ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটিতে মুখ ও কনুই সমেত হাত ধোয়া এবং দ্বিতীয়টিতে পা ও মাথা মসেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাস্য এই যে, সুন্নিরা পা ধৌত করে, মসেহ করেনা কেন? অযুর শেষে পা ধুতে হবে– একথা কিভাবে বুঝা যায়? জবাব বিস্তারিত ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়?

২. আয়াতে তাতহীর (পবিত্রকরণের বিবরণ সম্বলিত আয়াত)–এ হযরত আলী অন্তর্ভুক্ত কিনা? যদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন, তবে তাঁর ফাদাকের সম্পত্তি দাবি করাটা ন্যায়সঙ্গত ছিলো কিনা? আমি মনে করি, আয়াতে তাতহীরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে হযরত আলীর দ্বারা এমন কাজ অর্থাৎ ফাদাকের দাবি করা সম্ভব বলে ধারণা করা যায়না। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে এখানে দুটো অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। একটি হলো, ফাদাকের দাবি করা আর একটি হলো ফাদাক না দেওয়া। এ পরিস্থিতিতে কেবল একটা ব্যাপারই সঠিক হতে পারে। হয় ফাদাকের দাবি করা সঠিক, নচেত তা না দেওয়া সঠিক। এর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক? তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫৮ সংখ্যায় হযরত আলীর প্রতি আপনি কয়েকবার ইঙ্গিত করেছেন যে, নবীদের উত্তরাধিকার হয়না তা জেনেও হযরত আলী হযরত উমরের আমলে তা দাবি করেছিলেন। এটা কতোখানি সঠিক?

৩. খেলাফতের ব্যাপারে যখন প্রথমবারে মসজিদে নববীতে বসে হযরত আবু বকরের পক্ষে সিদ্ধান্ত হলো, তখন কি হযরত আলী উপস্থিত ছিলেন? না থাকলে তাকে কি ডাকা হয়েছিল? হযরত আলী (রা.) কি কখনো হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফত মেনে নিয়ে বাইয়াত করেছিলেন? করে থাকলে কখন? হযরত আলীকে কেন ডাকা হয়নি?

উত্তর : অযুর আয়াত (সূরা মায়েদা, দ্বিতীয় রুকু) সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে এই মতবিরোধ বহু পুরানো যে, এ দ্বারা পা ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে না শুধু মসেহ করার। আপনার বন্ধুর এটা ভুল ধারণা যে, কুরআনে কেবল পা মাসেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ সুন্নিরা শুধুমাত্র হাদিসের ভিত্তিতে ধোয়ার নীতি অবলম্বন করেছে। যদি সুস্পষ্টভাবে এটারই নির্দেশ দেয়া হতো তাহলে এর

www.icsbook.info

বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা কার আছে? আসল বিবদমান ব্যাপার তো এটাই যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষে এই দুটো কাজের কোন্‌টার নির্দেশ দিচ্ছে এবং তার আসল বক্তব্য কি?

আয়াতের ভাষা লক্ষ্য করুন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামায পড়তে উদ্যোগী হও তখন নিজেদের মুখ ও কনুই সমেত হাত ধৌত করো এবং মাথা মসেহ করো আর পা গোছা পর্যন্ত।"

এখানে وَاَرْجُلَكُمْ সম্পর্কে দুটো কিরাত চালু আছে। নাফে, ইবনে আমের, হাফস, কিসায়ী ও ইয়াকুবের কিরাত অনুসারে وَاَرْجُلَكُمْ (লামে জবর দিয়ে) পড়া হয়। পক্ষান্তরে ইবনে কাছীর, হামযা, আবু আমর ও আসেমের কিরাত অনুসারে وَاَرْجُلِكُمْ (লামে জের দিয়ে) পড়া হয়। এই দুই কিরাতের কোনোটাই এমন নয় যে, পরবর্তী কোনো এক সময়ে ব্যাকরণবিদরা বসে নিজ নিজ বুঝ ও ধারণা অনুসারে কুরআনের শব্দগুলোতে জের-জবর লাগিয়ে দিয়েছেন। বরঞ্চ এই দুটো কিরাতই মুতাওয়াতির (বিপুল সংখ্যক লোকের মাধ্যমে) প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখন যদি প্রথম কিরাত অবলম্বন করা হয়, তাহলে পদটি فَاغْسِلُوْا ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হয় এবং অর্থ এরূপ দাঁড়ায় গোছা সমেত পা ধৌত কর। আর যদি দ্বিতীয় কিরাত অবলম্বন করা হয় তাহলে তা সংযুক্ত হয় وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এর সাথে। আর সে ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়ায় 'গোছাসমতে পা মসেহ করা।"

এটা একটা সুস্পষ্ট মতভেদ। সর্বজনবিদিত ও ব্যাপকভাবে খ্যাত ও পঠিত উক্ত দুই ধরনের কিরাতের কারণে অনিবার্যভাবে আয়াতের মর্মার্থ নিয়ে এ মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। এই বিরোধ মীমাংসার একটি উপায় এই যে, উভয় কিরাতকে কোনো একটি (ধোয়া অথবা মসেহ করা) অর্থে গ্রহণ করা হোক। কিন্তু এজন্য যতো চেষ্টাই করা হয়েছে, তা দ্বারা আমরা কোনো অকাট্য ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি। কেননা একে ধোয়া অর্থে গ্রহণ করার পক্ষে যতো অকাট্য যুক্তিপ্রমাণই দেওয়া হোক না কেনো, প্রায় একই সমান শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ মসেহ করার অর্থে গ্রহণ করার পক্ষেও বিদ্যমান। দ্বিতীয় উপায় এই যে, ব্যাকরণ বিধির ভিত্তিতে এ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি অর্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। কিন্তু এ পদ্ধতিটাও ফলদায়ক হয়নি। কেননা উভয়দিকেই অগ্রাধিকারের যুক্তি প্রায় সমান শক্তিশালী। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.icsbook.info

ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের বাস্তব দৃষ্টান্ত কি, সেটা দেখা ছাড়া আর উপায় কি থাকতে পারে?

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অযুর বিধি বায়ুমণ্ডলে নাযিল হয়নি, আর তা কেবল কুরআনের পাতায় লিখিতভাবে আমরা পাইনি। এটা ছিলো এমন একটা বিধান, যা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় বাস্তবায়িত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। রসূল (সা.) নিজে প্রতিদিন কয়েকবার এর অনুশীলন করতেন, আর তাঁর অনুসারীগণ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে প্রতিনিয়ত এ নির্দেশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ দ্বারা শেখা পদ্ধতি অনুসারেই বাস্তবায়িত করতেন। কুরআনের এই নির্দেশ অনুসারে হাজার হাজার সাহাবি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং পরবর্তী অসংখ্য মুসলমান সাহাবিগণকে কিভাবে কাজ করতে দেখেছেন, সেটা আমরাই বা বিবেচনা করবোনা কেন? কুরআনের ভাষা থেকে যে বিষয় বোধগম্য হয়না, সেটা বুঝার জন্য এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা আর কি হতে পারে?

আমরা যখন শরিয়ত বিষয়ক জ্ঞানের এই উৎসটির শরণাপন্ন হই, তখন দেখতে পাই যে, এতো বেশি সংখ্যক সাহাবি পা ধোয়ার পক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও কাজের বর্ণনা দেন এবং এর চেয়েও বেশি সংখ্যক তাবেঈন তাদের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, সেই বর্ণনার ভুল হওয়ার কোনো অবকাশই থাকেনা। একথা সত্য যে, মাসেহ করার পক্ষেও অল্প কিছু সংখ্যক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বর্ণনার কোনোটিতেই একথা বলা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মসেহ করতেন। বরঞ্চ দুই তিনজন সাহাবির নিজস্ব অভিমত ছিলো এই যে, কুরআন মসেহ করার নির্দেশ দিচ্ছে। এসব রেওয়ায়েত থেকে এও জানা যায় যে, কোনো কোনো সাহাবি অযু থাকা অবস্থায় যদি নামাযের সময় পুন: অযু করতে চাইতেন, তাহলে পা না ধুয়ে কেবল মাসেহ করতেন। এমনকি স্বয়ং শিয়াদের হাদিস গ্রন্থাবলীতেও একাধিক প্রামাণ্য রেওয়ায়েত এমন পাওয়া যায়, যা দ্বারা পা ধোয়ার পক্ষে নির্দেশ ও বাস্তব কার্যধারা প্রমাণিত হয়। যেমন মুহাম্মদ বিন নুমান আবু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন এবং কালবী ও আবু জাফর তুসীও তা প্রামাণ্য সূত্রে উদ্ধৃত করেন। এই রেওয়ায়েতে বলা হয় যে, 'যদি তোমরা মাথা মাসেহ করতে ভুলে যাও এবং পা ধুয়ে ফেলো, তাহলে পুনরায় মাথা মাসেহ কর এবং পুনরায় পা ধৌত কর।' অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন হাসান আস সাফফার হযরত যায়েদ বিন আলী থেকে, যায়েদ স্বীয় পিতা ইমাম যয়নুল আবেদীন থেকে, তিনি

www.icsbook.info

স্বীয় পিতা ইমাম হোসেন থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি অযু করতে বসেছি। এ সময়ে সামনের দিক থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। আমি যখন পা ধুতে লাগলাম, তখন তিনি বললেন, হে আলী! 'আঙ্গুলের মাঝখানে খিলাল কর।' আশ শরীফ আর রাজী নাহজুল বালাগা গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) এর মুখ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতেও তিনি পা ধোয়ারই উল্লেখ করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, অধিকাংশ রেওয়ায়েত পা ধোয়ারই পক্ষে। অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক এবং বক্তব্য ও সূত্র উভয় দিক দিয়ে দুর্বল রেওয়ায়েতই মসেহের পক্ষে।

এখন বিবেকের দিক দিয়ে যদি দেখা যায়, তাহলে পা ধোয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও কুরআনের উদ্দেশ্যের নিকটতর বলে মনে হয়। অযুতে যে কটা অঙ্গকে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ময়লা ও নোংরা হবার সম্ভাবনা যে অঙ্গটির থাকে, সেটা পা ছাড়া আর কিছু নয়। আর শরীরের যে অঙ্গটিকে সবচেয়ে কম মলিনতায় স্পর্শ করে, সেটা হচ্ছে মাথা। এমতাবস্থায় অন্য সকল অঙ্গকে ধোয়ার নির্দেশ দেয়া আর পা-কে মাথার সাথে মাসেহের নির্দেশের আওতায় আনা হলে সেটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হবে বৈকি। তাছাড়া অযুর শেষে যদি পা মসেহ করা হয় তাহলে ভেজা হাত দিয়েই তা করতে হবে। তাহলে পায়ে যা ধুলোবালি ও ময়লা থাকবে তা ভেজা হাত লাগার ফলে আরো নোংরা রূপ ধারণ করবে। আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। মানুষ যদি পায়ের উপর শুধু মসেহ করে, তাহলে আয়াতের দুটো সম্ভাব্য অর্থের একটা মাত্র বাস্তবায়িত হবে এবং অপরটা (ধৌত করা) অনিবার্যভাবেই বাদ যাবে। কিন্তু তা না করে যদি পা ধোয়া হয় এবং ভালো করে হাত দিয়ে ডলে পা পরিষ্কারও করে, তাহলে আয়াতের দুটো অর্থই পরিপূর্ণরূপে কার্যকরি করা হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে ধোয়াও হচ্ছে, আবার সেই সাথে মসেহও করা হচ্ছে।

অবশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজা পরা অবস্থায় পা মসেহ করতেন। এটা আয়াতের দ্বিতীয় অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া বহু সংখ্যক প্রামাণ্য রেওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত এবং সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতও। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, শিয়াগণ এটা মানেনা। অথচ এটা তাদের অনুসৃত মত ও পথের নিকটতরও বটে।

২. আয়াতে তাতহীর ৫ :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا -

www.icsbook.info

'রসূলের পরিবার-পরিজনগণ! আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে সব রকমের নোংরামি দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।' (সূরা আল আহযাব : ৩৩)

নি:সন্দেহে হযরত আলীও এর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ না করুন, কোনো মুমিন তাঁদের নোংরামি (নৈতিক ও আকীদাগত নোংরামি)-তে লিপ্ত থাকার কথা বিশ্বাস করা তো দূরে থাকুক, ভাবতেও পারেনা। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারের মোকদ্দমায় এই নোংরামি ও পবিত্রতার প্রসঙ্গ টেনে আনার কি যৌক্তিকতা আছে? সম্পূর্ণ সৎ মনোবৃত্তি নিয়েও তো একটা নির্দেশের যথার্থ উদ্দেশ্য নিরূপণ ও একটা বিশেষ ব্যাপার ঐ নির্দেশ প্রযোজ্য হওয়া না হওয়া সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এর সাথে রসূলের পরিবারে মতবিরোধ ঘটতে পারতো। এ থেকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এরূপ অর্থ কেনো গ্রহণ করা হবে যে, তাঁরা স্বেচ্ছায় ও জেনে শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে উত্তরাধিকার দাবি করে বসেছিলেন?

যাই হোক, এ ক্ষেত্রে দুটো বাস্তব ঘটনা অনস্বীকার্য। একটি এই যে, আহলে বাইতের (রসূলের পরিবার পরিজন) তরফ থেকে উত্তরাধিকারের দাবি উঠেছিল। এই দাবিতে হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আব্বাস (রা.) তিনজনই সোচ্চার ছিলেন। দ্বিতীয়টি এই যে, পাঁচ বছরব্যাপী খেলাফত কালে যখন হেজায (যেখানে রসূল সাল্লালল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের সমস্ত পরিত্যক্ত জমিজমা বিদ্যমান ছিলো) স্বয়ং হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো, তখন তিনিও রসূল সাল্লালল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার বন্টন করেননি। আপনার বন্ধু এই দুটো ঘটনার যে ব্যাখ্যা করতে চান করুন। আমরা এর যে ব্যাখ্যা করি তাতে অপবিত্রতা বা নোংরামির নামগন্ধও নেই। আমাদের মতে, শুরুতে এ দাবি কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে উঠেছিল। (বস্তুত ভুল বুঝাবুঝি কোনো মতেই নৈতিক বা আকীদাগত নোংরামি নয়) পরে যখন হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এ সমস্যার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন করে দেন, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজনগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ব্যাপারটা যথাযথভবে হৃদয়ঙ্গম করেন ও আশ্বস্ত হন। নচেত হযরত আলী (রা.) কর্তৃক হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর ফায়সালাকে অবৈধ মনে করা সত্ত্বেও স্বীয় খেলাফত আমলে সে ফায়সালাকে পরিবর্তন করে হকদারদেরকে প্রাপ্য বুঝিয়ে না দেয়ার কোনো কারণ ছিলনা। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে আমরা এটা অসম্ভব মনে করি যে, তিনি একটা

www.icsbook.info

জিনিসকে অন্যায় জেনেও তার উপর অটল থাকবেন এবং একটা জিনিস শুধু নিজের নয়, অন্যদের প্রাপ্য জেনেও তা তাদেরকে দেবেননা। এটা সত্য হলে তা অবশ্যই একটা নোংরামি হিসেবে চিহ্নিত হতো এবং এর বিন্দুমাত্র মলিনতাও পূতপবিত্র আহলে বাইতকে স্পর্শ করতে পারে বলে আমরা স্বীকার করিনা।

৩. আপনার বন্ধুর তৃতীয় প্রশ্ন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। খেলাফতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মসজিদে নববীতে বসে নয়, সকিফায়ে বনী সায়েদাতে সেই রাতেই নেয়া হয়েছিল, যেদিন অপরাহ্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। সে সময় মুহাজির ও আনসারদের কাউকেই সেখানে ডেকে নিতে হয়নি। আসলে আনসারদের একটা বিরাট দল সেখানে সমবেত হয়ে গিয়েছিল এবং খেলাফতের প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাইছিল। তাঁদের এই সমাবেশ ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন খবর পেলেন, তারা তৎক্ষণাত সেখানে পৌঁছলেন। অতপর একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের পথ রোধ করার জন্য তারা তখনি আনসারদের সেই দলটিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই সমস্যার এমন একটা সমাধানে সম্মত করে নিলেন, যা উম্মতের জন্য কল্যাণকর ছিলো। ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে লোকজনকে ডেকে আনার মতো সময় তখন ছিলনা। এই তিন ব্যক্তি যদি একটু বিলম্বেও সেখানে যেতেন, তাহলে সেখানে মুসলমানদের মধ্যে একটা ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতো এবং পরবর্তী সময়কার ফেতনায় ইরতিদাদ (ইসলাম বর্জনের আন্দোলন) এর সময় তা ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ ডেকে আনতো। এ পরিস্থিতিতে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এরূপ প্রস্তাব তোলা সম্ভব ছিলনা যে, "ভাইসব! আরো দুচার দিনের জন্য ব্যাপারটা স্থগিত রাখো, আগামীকাল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফনের পর আমরা একটা সম্মেলন ডাকবো এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত কে হবে।" এ ধরনের প্রস্তাব পেশ করার অর্থ দাঁড়াতো এই যে, একদিকে আরবের সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়তো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন এবং সেই সাথে এ কথাও রাষ্ট্র হয়ে পড়তো যে, তাঁর কোনো স্থলাভিষিক্তও নিযুক্ত হয়নি উম্মতের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার জন্য। আর এর ফল হতো এই যে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো, তাদের হিম্মত বহু গুণ বেড়ে যেতো। অপরদিকে প্রস্তাবিত সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগেই আনসারগণ পাকাপাকি মত স্থির করে ফেলতে পারতেন যে, খলিফা যিনি হবেন তিনি আনসারদের মধ্যে থেকেই

www.icsbook.info

হবেন নচেত মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন আমীর নিযুক্ত হবেন। হযরত উমর (রা.) এর অন্তরদৃষ্টি এই ভুলের পরিণাম কি হতে পারে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিল। তাই তিনি সেখানেই সেই সময়েই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে নেয়া জরুরি মনে করলেন, যাতে কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র পেকে উঠার সুযোগ না পায়। তাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই ব্যক্তির খেলাফতের ব্যাপারে সকলকে সম্মত করলেন ও সকলের বায়আত আদায় করলেন, যাঁকে সমগ্র আবরবাসী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত হিসেবে জানতো এবং যার সম্পর্কে শত্রুমিত্র সকলেই এই মত পোষণ করতো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর দ্বিতীয় নম্বরে কোনো ব্যক্তিত্ব যদি থেকে থাকে তবে তা তাঁরই।

পরদিন সকালে মসজিদে নববীতে যে সমাবেশ হলো, সেটা সর্বসাধারণের বায়আত গ্রহণের জন্য– আপনার বন্ধু যেমনটি মনে করেছেন, খেলাফতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নয়। আগের দিন রাতে খেলাফতের সমস্যা অতি কষ্টে সমাধান করে নেওয়ার পর আবার নতুন করে তা নিয়ে এ সময় আলোচনা করার কোনো অর্থই ছিলনা। সে সময় যদি এটা আলোচনার জন্য পেশ করা হতো তাহলে সেটা এভাবেই পেশ করা যেতো যে, সকল মুসলমান রাত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে কিনা। কিন্তু যখন তাদেরকে ফায়সালার কথা জানানো হলো তখন সকলে সানন্দে তা গ্রহণ করলো এবং বায়আত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রশ্ন এই যে, এরূপ সর্বাত্মক গ্রহণযোগ্যতা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে কোনো কারণে তা নতুন করে একটা মীমাংসাযোগ্য সমস্যার আকারে আলোচনার জন্য পেশ করা যেতো?

এই সম্মেলনে কাউকে বাড়ি থেকে ডেকে আনা হয়নি। সকলেই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে সমবেত হয়েছিল এজন্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের খবর শুনে সকলকে মসজিদে নববীতেই হাজির হতে হয়েছিল, যার সন্নিহিত হযরত আয়েশার (রা.) কক্ষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ অবস্থান করছিল। আপনার বন্ধুর মনে কেবল হযরত আলী (রা.) সম্পর্কেই প্রশ্ন জাগলো কেনো যে, তাঁকে ডাকা হয়েছিল কিনা? সেখানে কি অন্য সবাইকে বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছিল? আপনার বন্ধুর ধারণা কি এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরের দিনই হযরত আলী (রা.) ফজরের নামাযেও শরীক হননি এবং যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু

www.icsbook.info

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফন ও কবরের প্রস্তুতির কাজ চলছিল, সেখান থেকেও তিনি সারা দিন উধাও হয়ে ছিলেন?

আপনার বন্ধুর সর্বশেষ প্রশ্ন এই যে, হযরত আলী (রা.) কি কখনো হযরত আবু বকর (রা.) এর বায়আত করেছেন? এর জবাব এই যে, তিনি সেই দিনই সকল মুসলমানের সাথে বায়আত করেছিলেন। তাবারী সাঈদ বিন যায়েদের বরাতে, বায়হাকী আবু সাঈদ খুদরীর বরাতে এবং মাগাযী প্রণেতা মূসা বিন উকবা, আবদুর রহমান বিন আওফের বরাতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি হযরত ফাতিমা (রা.) এর প্রবোধার্থে ৬ মাস স্বগৃহে বসবাস করেন। অতপর হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তিকালের পর পুনরায় খেলাফতের বায়আত করেন এবং খেলাফতের কাজে যথোচিত সহযোগিতা করতে শুরু করেন। তাবারী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে আব্দুল বার আল ইস্তিয়াব গ্রন্থে এ ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) এর বায়আত সম্পন্ন হলে আবু সুফিয়ান এসে বললো, "কি সর্বনাশ! কুরাইশের সবচেয়ে ক্ষুদ্র গোত্রের লোককে কিভাবে খলিফা বানিয়ে দেয়া হলো? হে আলী! তুমি যদি চাও, তবে আমি সমগ্র প্রান্তর জুড়ে ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে পারি।" হযরত আলী (রা.) তাকে যে জবাব দিলেন, তা শ্রবণ করার যোগ্য। তিনি বললেন "আবু সুফিয়ান! তুমি সারা জীবন ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনী করেছ। কিন্তু তোমার দুশমনীতে ইসলামেরও কোনো ক্ষতি হয়নি, মুসলনানদেরওনা। আমরা আবু বকর (রা.)-কে এই পদের যোগ্য মনে করি।" (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯)

হযরত আলী (রা.) কি বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় হকপন্থী ছিলেন?

প্রশ্ন আমি একটা সমস্যার ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা চাই। আপনি মুহাররমের দিনগুলোতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, হযরত আলীই সত্যের অনুসারী ছিলেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হযরত আলীর বিরোধিরা বাতিলপন্থী ছিলো। আপনি আরো বলেছেন যে, তিনটি গোষ্ঠীর সাথে হযরত আলীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি কোথাও ইসলামী বিধি লংঘন করেননি। বিপক্ষীয়দের লোকজনকে হত্যাও করেননি, তাদের স্ত্রী ও শিশুদেরকে গোলাম বাঁদীও বানাননি। প্রশ্ন হলো, হযরত আলী কোন্ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন যে, এ ধরনের ভূমিকা পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হতো?

হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আলী

www.icsbook.info

(রা.) সব সময়ই ক্ষমতায় আরোহনের অভিলাষী ছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি অনেক দিন পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিকের বায়আত করেননি। হযরত উমর (রা.) যখন ছয় ব্যক্তিকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করলেন, তখন সে কমিটিতে হযরত আলীও ছিলেন। অন্য সবাই তো খেলাফতের দাবি ছেড়েই দিলেন। কেবল হযরত আলী ও হযরত উসমানের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচনের প্রশ্ন বাকি রইল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা.) নির্বাচিত হলেন। এতে হযরত আলী ভীষণ চটে গেলেন এবং মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য পরে তিনি এসে বায়আত করেন। এরপর যখন হযরত আলীকে খলিফা নির্বাচন করা হলো, তখন নির্বাচকমণ্ডলী ছিলেন মদিনারই কয়েকজন। সেখানে কি প্রধান সাহাবিরা ছিলেন? অনর্থক তার বায়আত করাতে কি হযরত মুয়াবিয়া বাধ্য ছিলেন?

অনুরূপভাবে হযরত হুসাইনের সময় যখন এলো, তখন সকল সাহাবি তাকে কুফা যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি কারো কথাই শুনলেননা। আপনিই বলুন, একটি সুসংগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়ার পরিণাম যখন ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনা, তখন প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হওয়া কি কোনো বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ? ইসলাম কি এর শিক্ষা দেয়? এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ যখন একেবারে অসহায় হয়ে কোনো সুসংগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন তার পরিণতি এ রকমই হয়ে থাকে।

উত্তর : আপনার চিঠি পেলাম। আপনি যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, তার বিস্তারিত উত্তর লিখতে গিয়ে একটা দীর্ঘ নিবন্ধ লিখতে হয়। অথচ আমার হাতে অতো সময় নেই। আর সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে তো আপনার তাতে তৃপ্তি আসবেনা। আমার বক্তৃতার যে বিবরণ পড়ে আপনি এ প্রশ্নগুলো করেছেন, সে বক্তৃতাই যখন আপনার তৃপ্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন সংক্ষিপ্ত জবাব আরো বেশি ব্যর্থ হবে। তার চেয়ে কি এটাই ভালো হতোনা যে, আপনি আমার চিন্তাধারা জানার পর নিজেই বিষয়টা নিয়ে পড়াশুনা করতেন এবং প্রকৃত তত্ত্ব জেনে নিতেন?

আপনার হয়তো জানা নেই যে, ইমাম আবু হানিফার মতো সতর্ক ফিকাহবিদেরও অভিমত এই ছিলো যে, হযরত আলীর যতোগুলো যুদ্ধ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে হয়েছে, তাতে হযরত আলীই সত্যানুসারী ছিলেন। সত্য বলতে কি, সিফফীন যুদ্ধে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রা.)-এর শাহাদাতের পরই সুন্নি আলেমদের এই মর্মে পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত আলীর প্রতিপক্ষ বিদ্রোহীর ভূমিকায়

www.icsbook.info

অবতীর্ণ। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী আমর বিন ইয়াসার (রা.) কে হত্যা করবে।

আপনি এ কথাও ভুলে গেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে খেলাফতের যুগ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিলো এবং তারপর থেকে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। এ দিক থেকে হযরত আলী (রা.) এর খেলাফত স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনপুষ্ট ছিলো এবং আমীর মুয়াবিয়ার শাসন খেলাফত নয়, বরং রাজতন্ত্ররূপে বিবেচিত। তাছাড়া সুন্নি আলেমগণ যে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আলীকে চতুর্থ খলিফায়ে রাশেদ মানেন, সেকথাও আপনার বিবেচনা বহির্ভূত রয়ে গেছে। অথচ এ ব্যাপারটা সুন্নি আকায়েদ সংক্রান্ত কিতাবাদিতেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। শত শত বছর ধরে মসজিদের খুতবাতেও তা ঘোষিত হয়ে আসছে। এভাবে শিয়া-খারেজীদের থেকে আহলে সুন্নতের মত ও পথের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) কে খলিফায়ে রাশেদ বলে গণ্য করে এমন একজন উল্লেখযোগ্য আলেমের নামও আমার জানা নেই। আপনি এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য করেননি যে, সুন্নি ফিকাহবিদদের সকলেই নিজেদের কিতাবসমূহের চার খলিফার সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতে ইসলামী বিধি প্রণয়ন ও তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করে থাকেন। অথচ তারা বনু উমাইয়ার শাসকদের মধ্য থেকে একমাত্র হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ (র.) ব্যতীত আর কারো সিদ্ধান্তকে কোনো ফিকাহ সংক্রান্ত মাসয়ালায় নজীর হিসেবে পেশ করেননি। এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস অধ্যয়ন করুন। বিশেষত: তাবাকাতে ইবনে সাদ, তাবারী, ইবনে আছীর ও ইবনে কাসীর প্রভৃতি মূল উৎসগুলো পড়ে দেখুন। এরপর আমি আশা করি আপনার আর আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবেনা।

হযরত হুসাইন (রা.) সম্পর্কে কেউ কেউ আপনার মনে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে, তার সবগুলো পরিষ্কার করা এ চিঠিতে আমার পক্ষে কষ্টকর। কখনো অবসর পেলে এ বিষয়ে একটা বিস্তারিত নিবন্ধ লিখবো। আপাতত: শুধু এতোটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, এসব ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একবার বিকৃতির শিকার হলে তা আর সংশোধন করা সম্ভব হবেনা। সে ক্ষেত্রে তো ওটাকে বদলাবার যে কোনো চেষ্টাই গুনাহর কাজ বলে গণ্য হবে এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দেয়াই সঠিক ও পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হবে। এজিদের শাসনও যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তাহলে এ

www.icsbook.info

যুগের জালেম ও স্বৈরাচারিরা কি দোষ করেছে? তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন করবেন? (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)

মুসলিম ও মুমিন শব্দের অর্থ

প্রশ্ন : কেউ কেউ 'ইসলাম' ও 'ঈমান' শব্দ দু'টিকে প্রচলিত অর্থে একটাকে আরেকটার বিপরীতার্থে ব্যবহার করেন। তারা 'ইসলাম' অর্থ মনে করেন- সেই বাহ্যিক আনুগত্য যার মধ্যে ঈমান বর্তমান নেই। আর 'ঈমান' অর্থ মনে করেন- খাঁটি ও আন্তরিক ঈমান। প্রমাণ হিসেবে তারা সূরা আল হুজরাতের আয়াতটি ব্যবহার করেন। এ আয়াতে আরবের বেদুঈনদেরকে মুমিনের পরিবর্তে মুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।

এই যুক্তির আঁড়ালে অনেকে নিজেদেরকেই কেবল মুমিন মনে করে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে মনে করে শুধুমাত্র মুসলিম (অনুগত)। এমনকি তারা খুলাফায়ে রাশেদীনের (প্রথম) তিন খলিফাকে পর্যন্ত মুমিনের পরিবর্তে শুধুমাত্র মুসলিম (অনুগত) আখ্যায়িত করে তাঁদের ঈমানের প্রতি আঘাত হানছে।

মেহেরবানী করে উপরোক্ত আয়াতটির বিশ্লেষণ এবং মুমিন ও মুসলিম শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা বলে দেবেন।

উত্তর : সূরা আল হুজরাতের উল্লেখিত আয়াতটি সূরা আত তাওবার ৯০-১০১ নম্বর আয়াতের আলোকে পাঠ করুন। তাহলে বক্তব্য বিষয় আপনার বুঝে আসবে। মদিনার বাইরের চারপাশের অঞ্চলে যেসব বেদুঈন থাকতো, তাদের বলা হতো আ'রাব। এ লোকগুলো কেবল এজন্যেই মদিনার ইসলামী সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল যে, আনুগত্য ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিলনা। কিন্তু না তারা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো, আর না প্রস্তুত ছিলো কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে। এমনকি স্বেচ্ছায় যাকাত দিতেও তারা রাজি ছিলনা। উপরন্তু তাদের নীতি এই ছিলো যে, যখনই মুসলমানদের সাথে বিজয় অভিযানসমূহের গণীমতে অংশ বসানোর বিষয় সামনে আসতো, তখন এরা একজন থেকে একজন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তা দাবি করতো এবং নবী পাকের সামনে নিজেদের দাবি এমনভাবে উত্থাপন করতো, যেনো তারা ইসলামের বেষ্টনীতে প্রবেশ করে নবী পাকের প্রতি বিরাট ইহ্সান করে ফেলেছে। সূরা আল হুজরাতে তাদের এ নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এসব লোক ঈমানের দাবি করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কেবল বাহ্যিক আনুগত্যই স্বীকার করেছে। তাদের অন্তরে যদি ঈমান থাকতো, তবে তারা ফাঁকিবাজি করে, না জিহাদ থেকে

www.icsbook.info

দূরে থাকতো, আর না নিজেদের ইসলাম কবুল করাকে নবীর প্রতি ইহসান বলে ঘোষণা করে বেড়াতো।

এ আয়াতে 'ইসলাম' শব্দটি যে 'ঈমানহীন আনুগত্য', অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, কুরআন মজীদে ইসলাম ও ঈমান দু'টি পৃথক জিনিস। কেউ যদি এ দু'টোকে পৃথক ও আলাদা জিনিস মনে করে তবে তাকে জিজ্ঞেস করুন,

এর অর্থ কি? আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত সূরা বাকারার ১২৮ নম্বর আয়াতের দোয়াটিরই বা অর্থ কি?

বাকি থাকলো সেই সম্প্রদায়ের কথা, যারা (প্রথম) তিন খলিফা এবং সাহাবায়ে কিরামকে (কয়েকজন ব্যতিত) ঈমানহীন মুসলিম (অনুগত) বলে আখ্যায়িত করে। প্রকৃতপক্ষে তারা এই কথা বলে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি নয়, বরং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই আঘাত হানছে।

তারা মূলত একথাই প্রমাণ করতে চায় যে, (নাউযুবিল্লাহ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন চরম ব্যর্থ নবী ছিলেন (?)। কেননা, নিজের 'আহলি বাইত' এবং তিন চারজন সাহাবি ছাড়া আর কেউই সত্য দিলে তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। এমনকি তাঁর অধিকাংশ স্ত্রীও আন্তরিকভাবে তাঁর অনুসারী ছিলেননা। তাছাড়া এরা (নাউযুবিল্লা) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন অবিচক্ষণ, অদূরদর্শী, সরল ও বোকা মানুষ জ্ঞান করে। কেননা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সারা জীবন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লোকগুলোকে নিজের একান্ত আপন সাথি বানিয়ে রেখেছিলেন, মূলত তারা সকলেই ছিলো মুনাফিক। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে– এ যালিমরা এতোটুকু পর্যন্ত চিন্তা করেনা যে, তেইশ বছর যাবত গোটা আরব জাহানের বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর সংগ্রামের মাধ্যমে যে মহান বিজয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্জন করেছিলেন, যদি তাঁর এই সকল সাথিরা চরম নিষ্ঠাবান, পরম অনুগত এবং আত্মোৎসর্গকারী না হতেন, তবে তা কেমন করে সম্ভব হতো। বছরের পর বছর ধরে সকল আরব কওম তাঁর চরম বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো। তখন এই সকল সাহাবিরাই প্রাণোৎসর্গকারী সাহায্যকারী হিসেবে তাঁর পাশে ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরা যদি মুনাফিকই হতেন, তাহলে আরবরা কেমন করে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছিল?

www.icsbook.info

আসল কথা হচ্ছে. কেউ যখন বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ গোলাম হয়ে যায়, তখন সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্ট সত্যও তার চোখে পড়ে না। (তরজমানুল কুরআন : নভেম্বর ১৯৬৩)

"হায়াতুন্ নবী" প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আজকাল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে "হায়াতুন নবী" প্রসঙ্গে তুমুল বিতণ্ডা চলে। উলামায়ে কিরামের নিকট এটি এখন বিবাদের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিবাদমান উভয় গ্রুপই প্রথম প্রথম নিজেদের মতের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করতো। কিন্তু বর্তমানে তাদের অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে বিদ্রূপ তিরস্কার করছে। পরস্পরের সাথে ঝগড়াঝাটি ও মারামারি করছে এবং পরস্পরকে কাফির ফতোয়া দিচ্ছে। অল্প কিছু সংখ্যক আলিম ব্যতিত বাকি সকল আলিমগণই একাজে লিপ্ত।

কোনো কোনো মসজিদে তো জোর গলায় বলা হয় নবীগণ তেমনি জীবিত রয়েছেন, যেমনি জীবিত ছিলেন পৃথিবীতে থাকতে এবং 'হায়াতুন নবী'র অস্বীকারকারী কাফির। অপর কেউ কেউ আবার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে জীবিত থাকার ধারণা ও আকীদাকে মুশরিক ধ্যান ধারণা এবং এটাকে শিরকের উৎস বলে আখ্যায়িত করেন। মর্যাদা ও গুণাবলী সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য যদি কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদিসের বিপরীত না হয় তবে সে সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বক্তব্যও গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যখন তা আকীদা বিশ্বাসের সীমায় পৌঁছে যায়, তখন তা অকাট্য দলিল প্রমাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে আমার পেরেশানী দূর করুন।

উত্তর : 'হায়াতুন নবী' প্রসঙ্গে আজকাল উলামায়ে কিরামের মধ্যে যে পন্থায় তর্ক বাহাছ চলছে তার না কোনো প্রয়োজন আছে আর না তাতে কোনো লাভ আছে। নবীর ব্যাপারে আমাদের যতোটুকু আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা যথেষ্ট তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী। তাঁর আনীত হিদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হিদায়েত। আর আমলের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমরা তাঁর আদর্শের (উসওয়ায়ে হাসানার) অনুসরণ করবো এবং তা জানার উৎস হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ।

এখন এ বাহাছের অবতারণা করার প্রয়োজন কেন পড়লো যে, পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অর্থে জীবিত? বরযখী এবং রূহানীভাবে জীবিত নাকি শারীরিকভাবে?

www.icsbook.info

প্রকৃত কথা হচ্ছে, তাঁর জীবিত থাকার অবস্থা ও ধরন যা-ই হোক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১১ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেছেন। উম্মতের হিদায়েতের জন্যে তাঁর সত্তা আমাদের মধ্যে বর্তমান নেই। তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে এখন আমাদেরকে তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে কুরআন এবং হাদিসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাঁর জীবিত থাকার ফায়সালা প্রাণগত হোক কিংবা দেহগত– তাতে এ বিষয়ের কোনো নড়চড় হবেনা।

এ কারণেও এই বিষয়ে তর্ক বাহাছ সম্পূর্ণ নিষ্প্রোয়জন যে, এ বিশেষ প্রসঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট আকীদা বিশ্বাস পোষণ করার জন্যে আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হইনি। কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি এই বিষয়ে কোনো প্রকার চিন্তা ভাবনা না করে থাকে এবং এ প্রসঙ্গে কোনো প্রকার মত প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে থাকে, তবে তার ঈমানে এজন্যে কোনো ত্রুটি হবেনা। আর আখিরাতে এজন্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবেনা যে, নবীর প্রাণগত কিংবা দেহগত জীবিত থাকা সম্পর্কে তুমি কি আকীদা পোষণ করতে? এ প্রসঙ্গে কুরআন হাদিসে এমন কোনো অকাট্য হিদায়েত দেয়া হয়নি যাতে এ সম্পর্কে কোনো বিশেষ আকীদা পোষণ করার জন্যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের নিকটও এটি কোনো তর্ক বাহাছের বিষয় ছিলনা। আর নবী পাকের উত্তরসূরিরাও এ বিষয়ে কাউকেও বিশেষ কোনো আকীদা পোষণ করার শিক্ষা দিয়ে যাননি।

আমার তো মনে হয়, উলামায়ে কিরাম হায়াতুন নবী প্রসঙ্গে সেই ভুলটিই করছেন, যা করেছিলেন খলিফা মামুন 'খালকে কুরআন' প্রসঙ্গে। অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যে জিনিসকে ইসলামের একটি আকীদা এবং ঈমানের একটি স্তম্ভ হিসেবে নির্ধারণ করে যাননি, যে জিনিসকে স্বীকার করা বা না করার উপর মানুষের মুক্তির মানদণ্ড স্থাপন করেননি এবং যে জিনিসের প্রতি আকীদা বিশ্বাস পোষণ করার জন্যে মানুষকে আহ্বান করেননি– অযথা সেটাকে ইসলামের আকীদা এবং ঈমানের স্তম্ভ বানানো হচ্ছে। সেটাকে স্বীকার করা বা না করার উপর নাজাতের মানদণ্ড স্থাপন করা হচ্ছে। সে বিষয়ে বিশেষ আকীদা পোষণে আহ্বান করা হচ্ছে এবং সে বিষয়ে যারা আকীদা পোষণ করেনা তাদেরকে কাফির ও ফাসিক বলা হচ্ছে। দীনের যেসব বিষয় এ পর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন সেগুলোকে পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোনো প্রকার কৃপণতা করেননি। বরং সেগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোর প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। আলোচ্য প্রসংগটি কোনো অবস্থাতেই সে

www.icsbook.info

পর্যায়ের নয়। জোর জবরদস্তি করে এটাকে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা সেরূপ গুরুত্ব প্রদান করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কর্মপন্থা। কোনো ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে কোনো প্রকার চিন্তাই করে না থাকে কিংবা এ সম্পর্কে কোনো আকীদা বা মত পোষণ না করে থাকে– তবে এতে তার পরকালের পরিণতির উপর কোনোই প্রভাব পড়বে না। অবশ্য বিপদ এবং ঝুঁকির সম্মুখীন সে ব্যক্তিই হবে, যে এ সম্পর্কে কোনো আকীদা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান করছে। কেননা তার সে আকীদার মধ্যে ভ্রান্তি এবং বিশুদ্ধতা উভয়েরই অবকাশ আছে। তরজমানুল কুরআন : ডিসেম্বর ১৯৫৯)

তাসাউফের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা

প্রশ্ন : আমি দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং ইকামতে দীনের কাজে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। একত্রে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আপনি তাসাউফ স্বীকার করেননা– লোকদের এ অভিযোগ আমি খণ্ডন করার চেষ্টা করি। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আমার এক প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছিলেন "আমার এ আন্দোলনের কাজে তাসাউফপন্থী এবং তাসাউফপন্থী নয় এমন সকলেরই অংশগ্রহণের অবকাশ রয়েছে এবং প্রয়োজন রয়েছে। আর আমি যেহেতু সুফী নই সেজন্যে অযথা তাসাউফের দাবি করে মকরবাজী তো করতে পারবোনা।" আপনার এ জবাব খুবই সাদাসিধে এবং সুন্দর। কিন্তু লেখতে গিয়ে মানুষের ভুল হয়ে যেতে পারে। আপনি আপনার 'হিদায়েত' পুস্তিকায় লিখেছেন :

"জীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর জারি রাখা কর্তব্য। যিকরের সেসব তরীকা সঠিক নয় যা পরবর্তী কালের সুফীগণ ও বিভিন্ন ফিরকা এবং খানকার লোকেরা নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে কিংবা অন্যদের থেকে গ্রহণ করেছে।"

আপনি যদি সকল সুফীদের প্রতি এ আঘাত না হানতেন তবে আপনার আন্দোলনের কি ক্ষতি হতো? এ বাক্য থেকে মনে হয় আপনি সুফীদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন, অথবা সুফীদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি করতে চান। এজন্যে আদাজল খেয়ে তাদের পিছে লেগেছেন। আশা করি আপনি আপনার এ বাক্যটি সংশোধন করবেন।

উত্তর : কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা দলের সংগে মতপার্থক্য করার অর্থ এই নয় যে, লোকটি উক্ত ব্যক্তি বা দলের বিরোধিতায় কিংবা শত্রুতায় লিপ্ত অথবা তাদের গোটা বিষয়টাকেই ভ্রান্ত মনে করছে। জনাব! আপনারাও তো মালিকী, হাম্বলী এবং শাফেয়ী মযহাবের অনেক রায়ের সংগে মতপার্থক্য রাখেন এবং

www.icsbook.info

অনেক সময় তাদের মতের বিপক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করেন। কোনো ব্যক্তির এর অর্থ এমনটি করা উচিত হবে কি যে, আপনার উক্ত তিনজন ইমাম এবং তাঁদের অনুসারী আলেমগণের বিরোধিতায় লিপ্ত, তাঁদেরকে অন্যায়কারী বলে আখ্যায়িত করছেন এবং আদাজল খেয়ে তাদের পিছু লেগেছেন?

তাই আমি অনুরোধ করছি, আপনি আপনার এরূপ চিন্তাধারা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করুন। মতপার্থক্যকে বিরোধিতা ও শত্রুতার সংগে সংমিশ্রিত করে এলোমেলো করে ফেলবেননা।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, বাতেনী সংশোধন এবং আত্মশুদ্ধির যে তরীকা কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত– সেটাই মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট এবং কেবল তারই উপর আমল করা উচিত। এর চাইতে উত্তম কোনো তরীকা হতে পারেনা। আর এর চাইতে কমবেশি করা না দুরস্ত আছে আর না তাতে কোনো ফায়দা আছে। এর থেকে সরে গিয়ে লোকেরা যে তরীকাই আবিষ্কার করেছে কিংবা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের থেকে গ্রহণ করেছে, তা থেকে দূরে থাকা উচিত।

আমার এ মত যদি কোনো ভ্রান্তি থাকে, তবে প্রমাণসহ তা আমাকে অবগত করাবেন। আমি অবশ্যই তা মনোনিবেশ করে দেখবো। কিন্তু এ অপবাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্কই নাই যে, মতপার্থক্য থাকার কারণে আমি সুফীগণের বিরোধী কিংবা তাসাউফের আমি দুশমন অথবা তাসাউফপন্থীগণকে আমি তিরস্কার করি। (তরজমানুল কুরআন : আগষ্ট ১৯৬১)

প্রশ্ন : আপনি কিছুটা বিরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করেছেন যে, হয়তো আমি 'মতভেদ' ও 'বিরোধিতা'র মধ্যে পার্থক্য করিনা। আলহামদু লিল্লাহ! মাওলানা মরহুম আমাদেরকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মতো প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আত্মিক সংশোধন সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন ঠিক এরূপ উপদেশই আমি আমার সাথে সংশ্লিষ্টদের দিয়ে থাকি। আমার ও আপনার মধ্যে হয়ত কোনো শব্দগত মতপার্থক্য হচ্ছে। যেমন, আমরা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের সাথে মতভেদ করে থাকি, কিন্তু আমরা কখনো বলিনা যে, ইমাম শাফেয়ী (রাহ.)-এর অভিমত অশুদ্ধ বা বাতিল। উপরন্তু আপনি বলেন যে, পরবর্তীকালে সুফীদের বিভিন্ন দল যেসব পন্থা আবিষ্কার করেছে বা অন্যদের থেকে গ্রহণ করেছে তা সঠিক নয়। আমি এর কিছু দৃষ্টান্ত অবগত হতে চাই। অনন্তর আরও অবগত হতে চাই যে, যে ব্যক্তি সঠিক তরীকার বিপরীতে রয়েছে তাকে আপনি কি বলবেন? আমি তো

www.icsbook.info

তার সাথে শুধু মতভেদই নয়, বরং বিরোধিতাও করি। একথা বুঝে আসেনা যে, আপনি এক ব্যক্তিকে সঠিক তরীকার বিপরীতেও মনে করেন, আবার তার সাথে বিরোধও রাখেননা।

যে তরীকা কুরআন ও হাদিস থেকে সরে গিয়ে নয়, বরং তার প্রাণসত্তা ও মূল পর্যন্ত পৌছার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে তাকে খুব সম্ভব আপনি আপনার নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ বলবেন (বিদআত বলবেননা)। তা গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার আপনার রয়েছে, কিন্তু তাকে আপনি বাতিল বা অযথার্থ বলতে পারেননা। যদি বলেন, তাহলে সেটা কেবল মতভেদই নয়, বরং অবশ্যই বিরোধিতাও।

এসব বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করলে আলোচনার সমাপ্তি ঘটবে।

উত্তর : পূর্বের চিঠিতে হয়ত আপনার সামনে আমার কথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারিনি। তাই এ সম্পর্কে আরও কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। অন্যথায় আমার দাবি আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলে এই প্রয়োজন অনুভূত হতোনা। আমি সংক্ষেপে আমার কথা পুনরায় পেশ করছি।

আপনার মতো আলেম ব্যক্তির সামনে একথা অস্পষ্ট নয় যে, 'আল-মুজতাহিদু কাদ ইউখতী ওয়া ইউসীবু' (মুজতাহিদের ভুলও হতে পারে আবার সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌছতে পারে)। তারপর আপনি এও জানেন যে, পূর্বেকার বিশেষজ্ঞ আলেমগণ (সালফ) থেকে পরবর্তী আলেমগণ (খালফ) পর্যন্ত তাঁরা যাদের সম্মান ও মর্যাদার পাত্র মনে করতেন– তাদের নিষ্পাপ মনে করা তাদের নীতি ছিলনা এবং তাদের ইজতিহাদি বিষয়ের মধ্যে কোনো জিনিসকে ভ্রান্ত ও ভুল মনে করেছেন তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া এবং তাদের অবদান অস্বীকার করার মনোবৃত্তিও তাদের ছিলনা। পক্ষান্তরে তারা যে জিনিসকে ভুল মনে করেছেন তাকে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু কারও ইজতিহাদি ভুলকে তারা সংশ্লিষ্ট মুজতাহিদের মান মর্যাদার জন্য কলংকজনক গণ্য করেননি। তাঁরা ইজতিহাদি ভুলকে ভুলও বলতেন এবং তার সাথে মতভেদও পোষণ করতেন, কিন্তু সাথে মুজতাহিদের মান মর্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন এবং তাঁর ইজতিহাদি ভুলের কারণে তাঁর সমস্ত অবদান অস্বীকার করে বসতেননা।

এ ব্যাপারে আমার নীতিও তাই। উদাহরণস্বরূপ আমি এটা মেনে নিতে পারিনা যে, যেসব বুজুর্গ ব্যক্তি সামা (সংগীত)–কে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন– তাদের ইজতিহাদ সঠিক ছিলো। অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ–

www.icsbook.info

যেসব বুজুর্গ শায়খের ধ্যানের নীতি গ্রহণ করেছেন তারা সঠিক ইজতিহাদে পৌঁছেছেন– এটাও আমি মেনে নিতে পারিনা। আমি এসব জিনিসকে ভ্রান্ত মনে করি এবং এর সাথে মতভেদ পোষণ করা এবং জনগণকে তা পরিহারের পরামর্শ দেয়া জরুরি মনে করি। কিন্তু সাথে সাথে যেসব সুফিয়ায়ে কিরামের সংগে এসব পন্থা সংযুক্ত তাদের সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণও আমি জায়েয মনে করিনা। (তরজমানুল কুরআন : আগষ্ট ১৯৬১ ঈসায়ী)

অদৃশ্য জ্ঞান, হাজির নাজির এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা

প্রশ্ন : আমি বর্তমানে তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করছি। শিরকের ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিনা, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সাহায্য করবেন। তাফহীমুল কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করে একথা মনে বদ্ধমূল হয় যে, আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত) হওয়া এবং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা হওয়া (আমাদের প্রচলিত হাজির ও নাজির' অর্থাৎ সর্বত্র উপস্থিত এবং সকল জিনিসের দ্রষ্টা কথাটাও যার আওতাভুক্ত) আল্লাহ তায়ালার অসাধারণ গুণাবলীর অন্যতম। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এসব গুণে গুণান্বিত মনে করা শিরক। আল্লাহর অধিকারসমূহের মধ্যে রুকূ ও সিজদা প্রভৃতিও একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ শিরককে মহাপাপ এবং ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ বলে ঘোষণা করেছেন। স্পষ্টতই এমন মহাপাপের জন্য তিনি কাউকে নির্দেশ দিতে পারেননা অথচ তিনি ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন আদম (আ.)কে সিজদা করার জন্য। অনুরূপভাবে কোনো নবী নিজেও শিরকে লিপ্ত হননা, কাউকে লিপ্ত হতেও বলেননা। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.) এর সামনে তাঁর ভাইয়েরা ও পিতামাতা সিজদা করলেন। প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা যদি শিরক হয়ে থাকে, তাহলে উপরোক্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা কি হবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অদৃশ্যের জ্ঞান যদি আল্লাহর একক গুণ হয় তাহলে এটা কোনো সৃষ্টির মধ্যেই থাকার কথা নয়। কিন্তু কুরআন ও হাদিস থেকে জানা যায় যে, নবী ও রসূলগণ অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। তাহলে আমরা কোনো সৃষ্টির মধ্যে বা কোনো ব্যক্তির মধ্যে এ গুণের বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করলে আমাদের শিরকে লিপ্ত হতে হয় কেন? কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ কিয়ামতের জ্ঞানও দিয়েছিলেন তাহলে তাকে মুশরিক বলা হয় কেন? এ ধরনের বিশ্বাসের কারণে যাদেরকে শিরকে লিপ্ত বলে ফতোয়া দেয়া

www.icsbook.info

হয় তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়েব জানার গুণকে তার নিজস্ব ও স্বকীয় গুণ মনে করেনা, বরং আল্লাহ প্রদত্ত গুণ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের ও অন্যান্য আলেমদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য যদি থেকে থাকে তবে তা কেবল কম বা বেশি নিয়ে। প্রশ্ন যখন কেবল কম বেশি নিয়ে, তখন শিরকের ফতোয়া কেন দেয়া হয়?

'হাজির ও নাজির' এ গুণটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট বলা হয়। অথচ আল্লাহ মালাকুল মাওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) কে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তিনি একই সময়ে হাজার হাজার মানুষ, পশু, পাখি ও জীনের রূহ কবজ করেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, তিনিও হাজির নাজির। অথচ হাজির নাজির (সর্বত্র বিদ্যমান ও সর্বদ্রষ্টা) হওয়া আল্লাহর একক বৈশিষ্ট্য। এখানে যদি এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, আল্লাহ তায়ালা একটা দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে উক্ত ফেরেশতাকে নিজের বিশেষ গুণের অধিকারী করেছেন, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে হাজির নাজির হওয়ার গুণ বিদ্যমান এবং তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে মুশরিক বলা হয় কেন?

আমার এ মতে যদি কোনো ভ্রান্তি থাকে, তবে দলিল প্রমাণসহ তা আমাকে অবগত করাবেন।

উত্তর আপনি শিরকের ব্যাপারটা বুঝতে যে অসুবিধার কথা বলেছেন, ওটা তাফহীমুল কুরআন ক্রমাগত অধ্যয়ন করলে সহজেই দূর হতে পারে। একটি চিঠিতে এটা দূর করা আমার পক্ষে কঠিন। তথাপি যেহেতু 'শিরক'-এর ব্যাপারটা খুবই নাজুক ও বিপজ্জনক এবং এই জটিলতার মধ্যে আপনি বেশিক্ষণ আক্রান্ত থাকুন তা আমার কাম্য নয়, তাই সংক্ষিপ্ত কিছু কথা দ্বারা আপনাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবো।

সর্বপ্রথম আপনি একথা ভালোভাবে বুঝে নেবেন যে, সিজদা স্বয়ং শিরক নয়, বরং শিরকের আলামত। আসলে শিরক হচ্ছে আল্লাহর সত্তায়, গুণাবলীতে বা অধিকারসমূহে কাউকে শরীক মানা। সিজদা যদি ও ধরনের আকীদা সহকারে করা হয় তবে তা শিরক। অন্যথায়, যেহেতু এ কাজ দ্বারা মুশরিকদের সাথে কার্যত: সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়, তাই এ কাজটা স্বয়ং শিরক না হলেও ঐ সাদৃশ্যের কারণে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ নিজেই ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেছিলেন যে, আদমকে সিজদা করো। তাই ফেরেশতারা যা করেছিলেন তা আল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ পালন করার জন্যই

www.icsbook.info

করেছিলেন। ফেরেশতারা আপনা থেকে আদম (আ.) কে পূজা বা সম্মানের পাত্র মনে করে মাথা নোয়াননি। সুতরাং এতে যে শিরকের প্রশ্ন উঠেনা তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

হযরত ইউসুফের সামনে তাঁর পিতামাতা ও ভাইরা যে সিজদা করেছিলেন, সেটা একটা সত্য স্বপ্নের ভিত্তিতেই করেছিলেন। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ নিজেই এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, হযরত ইয়াকুব আলাহিস সালাম এটাকে আল্লাহর ইঙ্গিত বলে আখ্যায়িত করেছিলেন (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪–৬) এবং হযরত ইউসুফও শেষ পর্যন্ত তাকে ঐ স্বপ্নেরই বাস্তব প্রতিফলন বলে অভিহিত করেছিলেন (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০০)। কাজেই এক্ষেত্রে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহর আদেশক্রমেই হয়েছে। যে কাজ আল্লাহর আদেশক্রমে হয় তা যে শিরক হতে পারেনা তা বলাই বাহুল্য।

এবার দেখা যাক, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ ছাড়াই কোনো বান্দার সামনে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্লুত মনে আপন ইচ্ছাক্রমেই সিজদা করে, তার এ কাজকে কি কোনো দলিল দ্বারা শিরকমুক্ত বলা যায়? যেহেতু আল্লাহ আদম ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের বেলায় আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা জায়েয করেছিলেন, তাই এ কাজটা সর্বক্ষেত্রে অবাধে জায়েয এরূপ যুক্তি দেয়া কি সঠিক হতে পারে? আল্লাহর হুকুম ছাড়াই আমরা যাকে খুশি, সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শনের জন্য সিজদা করতে পারি- একথা বলা চলে কি? সূরা কাহাফে আল্লাহ তাঁর এক বিশিষ্ট বান্দা সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি কতিপয় হিতকর উদ্দেশ্যে আল্লাহর হুকুমে কয়েকজন দরিদ্র লোকের নৌকা ছিদ্র করে দিয়েছিলেন এবং একটি শিশুকে হত্যা করেছিলেন। এ ঘটনার ভিত্তিতে আমরা কি এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারি যে, আমরাও কোনো হিতকর উদ্দেশ্যে সামনে রেখে যার সম্পদকে ইচ্ছা ত্রুটিযুক্ত করতে পারি এবং যাকে ইচ্ছা হত্যা করতে পারি? যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য ভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং অন্যের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন, তখন আল্লাহর কতি'ায় বিশেষ কাজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে এবং তার উপর কিয়াস করে সেসব নিষিদ্ধ জিনিসকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নেওয়ার কি অধিকার আমাদের?

অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একথা সকলেই স্বীকার করে যে, অদৃশ্যের সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং যে জ্ঞান অন্য কারো দেয়ার নয় বরং সম্পূর্ণ নিজস্ব, তা

www.icsbook.info

একমাত্র আল্লাহরই একক বৈশিষ্ট্য। একথাও কেউ অস্বীকার করেনা যে, নিজের অদৃশ্য জ্ঞানের যেটুকু এবং যতোটুকু যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ দিতে পারেন। এই আংশিক এবং প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের ধরন ও প্রকৃতি আল্লাহর একক অধিকারভুক্ত সার্বিক ও নিজস্ব জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উল্লিখিত আংশিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান কোন বান্দার ভেতরে থাকতে পারে এরূপ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা কারো মতেই শিরক নয়।

আসলে বিভ্রান্তির সূচনা যেখান থেকে হয় সেটা এই যে, মানুষ আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে এমন দু'টো তত্ত্ব উদ্ভাবন করে যা ইসলামী আকীদার পরিপন্থী।

প্রথমটা এই যে, সে উক্ত আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানকে আংশিক নয় বরং সার্বিক ভেবে বসে এবং যে কোনো বান্দা সম্পর্কে এরূপ দাবি করে বসে যে, আল্লাহ তাকে নিজের মতোই ভূত ভবিষ্যতের যাবতীয় জ্ঞান দান করেছেন। এখানে আংশিক ও সার্বিক জ্ঞানের ব্যবধান ঘুঁচে যাওয়া সত্ত্বেও দৃশ্যতঃ নিজস্ব ও খোদাপ্রদত্ত হওয়ার পার্থক্যটা নজরে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের আকীদা পোষণ করা শিরক নয়। কিন্তু আপনি সামান্য একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, এ ধরনের আকীদা পোষণ করাতে কি মারাত্মক ঝুঁকি নিহিত রয়েছে। ধরে নেয়া যাক, এটা যদি মেনে নেয়ার যোগ্য হয় যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের দেয়া অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা কোনো বান্দাকে নিজেরই মতো আলেমুল গায়েব বানিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে একথা কেন মেনে নেওয়া যাবেনা যে, তিনি নিজের কোনো বান্দাকে নিজেরই মতো সর্বশক্তিমান, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, স্রষ্টা ও পালনকর্তা বানিয়ে দিয়ে থাকতে পারেন? এরপর আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাবলে কোনো বান্দার পুরোপুরি খোদা হয়ে বসতে আর বাধা থাকে কোথায়? এরপর একই ধরনের গুণাবলী ও ক্ষমতাশালী দুই খোদার মধ্যে কেবল নিজস্ব ও আর এক খোদার প্রদত্ত হওয়ার পার্থক্য কি মানুষকে শিরক থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হবে?

দ্বিতীয় বাড়াবাড়িটা করা হয় এভাবে যে, অতিরঞ্জিতকারী লোকেরা আল্লাহর প্রদত্ত জিনিসকে বণ্টন করার মালিক মোক্তার নিজেরাই হয়ে বসে। দাতা কোনো বান্দাকে কি দান করেছেন আর কি করেননি, এটা ঘোষণা করা আসলে স্বয়ং দাতারই কাজ। অন্য কোনো ব্যক্তির এ অধিকার থাকতে পারেনা যে, দাতার নিজের ঘোষণা ছাড়া সে নিজের পক্ষ থেকেই ঘোষণা করবে যে, তিনি কাকে কি

www.icsbook.info

দান করেছেন। এখন আল্লাহ্ যদি স্বীয় পাক কিতাবে কোথাও একথা বলে থাকেন যে, আমি অমুক বান্দাকে ভূত-ভবিষ্যতের সকল জ্ঞান প্রদান করেছি অথবা আল্লাহর রসূল যদি কোনো বিশুদ্ধ হাদিসে এ ধরনের সুস্পষ্ট উক্তি করে থাকেন, তবে তার বরাত দিলেই সব ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু যদি কোনো আয়াত বা কোনো হাদিস এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্টোক্তি না করে থাকে, তাহলে আল্লাহর এই দানের খবর লোকেরা কোন্ সূত্রে পেলো, সেটা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা খুব ভালো করে বুঝে নিন। আকীদা বিশেষত: তাওহীদের আকীদার ব্যাপারটা অত্যন্ত নাজুক। এটা এমন জিনিস যার উপর ঈমান ও কুফর এবং আখেরাতের মুক্তি ও সর্বনাশ নির্ভর করে। এ ব্যাপারে এমন নীতি অবলম্বন করা ঠিক নয় যে, একাধিক অর্থবোধক আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে একটা নির্যাস বের করে নিয়ে একটা আকীদা বানিয়ে নিলাম এবং তার উপর ঈমান আনা জরুরি বলে স্থির করে নিলাম। আকীদা গৃহীত হতে হবে অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদিস থেকে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল স্বচ্ছ ভাষায় একটি তত্ত্ব মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং একথা প্রমাণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ তত্ত্ব প্রচার করতেন, আর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণ সকলে তার উপর বিশ্বাস রাখতেন। কেউ কি একথা বলতে পারবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলেমুল গায়েব হওয়া এবং ভূত–ভবিষ্যতের সকল তত্ত্ব জানার কথিত আকীদা এই মানের ছিলো? এটা যদি প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনি অনর্থক নিজেকে এ ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন কেন?

হাজির ও নাজির প্রসঙ্গে আপন মালাকুল মাওতের যে উদাহরণ দিয়েছেন তাতে একাধিক ত্রুটি রয়েছে। কুরআনে কোথাও একথা বলা হয়নি এবং কোনো সহীহ হাদিসেও একথা নেই যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য মাত্র একজন মালাকুল মাওতই রয়েছেন। কুরআন থেকে একথাও জানা যায়না যে, মাত্র একজন ফেরেশতাই জান কবজ করার কাজে নিয়োজিত। বরঞ্চ একাধিক জায়গায় জান কবজকারী ফেরেশতাদের উল্লেখ বহুবচন দ্বারা করা হয়েছে। যেমন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ .

"নিজেদের উপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায় যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যু দিয়েছেন তাদেরকে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?" (সূরা নিসা, আয়াত ৯৭)

www.icsbook.info

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۔

"ফেরেশতারা যখন তাদের মুখে ও পিঠে প্রহার করতে করতে জান কবজ করবেন তখন কি উপায় হবে?" (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ২৭)

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

"যাদের জান ফেরেশতারা এমন অবস্থায় কবজ করবেন যে, তারা পবিত্র ছিলো, তাদেরকে ফেরেশতারা বলবেন তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" (সূরা নাহল, আয়াত ৩২)

حَتّٰى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۔

"অবশেষে যখন আমাদের ফেরেশতারা তাদের রূহ কবজ করতে আসবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকতে তারা এখন কোথায়?" (সূরা আল্-আরাফ, আয়াত ৩৭)

এসব আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন প্রধান মালাকুল মাওতের অধীন আরো বহুসংখ্যক সহযোগী ফেরেশতা প্রাণ সংহারের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এটা ঠিক কি এ রকম যে, ইবলিস একটা বড় শয়তান এবং তার অধীনে অসংখ্য শয়তান পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। ইবলিসকেও সব জায়গায় যেতে হয়না, প্রধান মালাকুল মাওতকেও নয়।

এমনকি শুধুমাত্র পৃথিবীর প্রাণসমূহ সম্পর্কেও কোথাও বলা হয়নি যে, জলস্থল অন্তরীক্ষের সকল প্রাণীর প্রাণ সংহারের কাজে সেই একই মালাকুল মাওত নিযুক্ত রয়েছেন, যিনি সকল মানুষের জান কবজ করার জন্য নিয়োজিত। কুরআনে শুধু এ কথাই বলা হয়েছে যে, يتوفكم ملك الموت "মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের জান কবজ করে থাকে।" এ থেকে যা বুঝা যায় তা শুধু এতোটুকুই যে, পৃথিবীতে সকল মানুষের জান কবজ করার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। যদি ধরেও নেই যে, এই একই ফেরেশতা সমগ্র পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রাণ সংহার করে থাকেন তাহলে এটা একটা অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের ক্ষমতা, যা আল্লাহ তাঁর এই ফেরেশতাকে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার সমগ্র বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে উপস্থিত থাকা এবং সবকিছু সরাসরি প্রত্যক্ষ করার (হাজির ও নাজির) সেই সীমাহীন গুণ বৈশিষ্ট্যের সাথে এ ক্ষমতার কোনো তুলনাই হয়না। এখানে আরো একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। সেটি এই যে, কিয়াস তথা আন্দাজ অনুমানের

www.icsbook.info

ভিত্তিতেই কি এখন আমরা আমাদের আকীদা বিশ্বাস গড়ে তুলবো? মালাকুল মাওত সম্পর্কে তো আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, আমি তাকে মানুষের জান কবজ করার কাজে নিযুক্ত করেছি। একথার আলোকে খুব বেশি হলেও এতোটুকুই ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, এই ফেরেশতা একই সময়ে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে লাখো মানুষের প্রাণ সংহার করে থাকেন। কিন্তু এর আলোকে কিভাবে একথাও আন্দাজ করে নেয়া যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বত্র বিরাজমান এবং সবকিছুই দেখতে পান। এ দু'টো জিনিসের মধ্যে কি সাদৃশ্য ও সাযুজ্য রয়েছে যে, একটার নিরীখে আর একটাকে অনুমান করা হবে? আর অনুমানও এমন যে, তা আকীদায় পরিণত হবে, তার উপর ঈমান আনতে মানুষকে দাওয়াত দেয়া হবে এবং যারা মানে না তাদের ঈমানে অসম্পূর্ণতা খুঁজে বের করা হবে? এ আকীদা যদি সত্যিই ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কিতাবে অবশ্যই খোলাখুলি ও অকাট্যভাবে বলতেন যে, আমার রসূলকে হাজির ও নাজির মানো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দাবি করতেন এবং এ দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাতেন যে, আমি সর্বত্র বিরাজমান রয়েছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হাজির ও নাজির থাকবো। সাহাবায়ে কিরাম ও অতীতের মনীষীবৃন্দের মধ্যে এ আকীদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও গৃহীত হতো এবং ইসলামের আকীদা তত্ত্বের কিতাবগুলোতে এটা লিপিবদ্ধ হতো।

আপনি এক শ্রেণীর লোকদেরকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করা ও না করার প্রসঙ্গ তুলেছেন। এ সম্পর্কে আমার মতামত বোধ হয় আপনার জানা নেই।

আমি এসব ব্যাপারে তাদের ধ্যান ধারণাকে ব্যাখ্যার ভ্রান্তি থেকে উদ্ভূত বলে মনে করি এবং তাকে ভুল বলতে দ্বিধা করিনা। তবে তাদেরকে মুশরিক বলতে হবে এবং আরবের মুশরিকদের সমতুল্য মনে করতে হবে– এ ব্যাপারে আমি একমত নই। আমি মনে করি না যে, তারা শিরককে শিরক জেনেও তাতে বিশ্বাসী হতে পারেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তারা তাওহীদকেই প্রকৃত ইসলামী আকীদা মানেন এবং তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করেন। কাজেই তাদেরকে মুশরিক বলা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। তবে একথা সত্য যে, তারা কোনো কোনো আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যায় মারাত্মক ভুল করেছেন। আমি এটাই আশা করি যে, জিদ ও হঠকারিতা উস্কে দেয়া কথাবার্তা যদি না বলা হয় এবং যদি বিবেকসম্মত পন্থায় যুক্তি দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়, তাহলে তারা জেনে বুঝে কোনো গোমরাহীর উপর অটল থাকবেননা। (তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৬২)

www.icsbook.info

'মুশরিক' শব্দটির পারিভাষিক প্রয়োগ

প্রশ্ন : মার্চ, ১৯৬২ সংখ্যা তরজমানুল কুরআনের 'রাসায়েল ও মাসায়েল' অধ্যায় পড়লাম। নিবন্ধের শেষের ক'টা লাইন সম্পর্কে আমার দ্বিমত রয়েছে। এই দ্বিমত নিরূপণ ও সত্য অনুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে নিম্নের কথাগুলো লিখছি :

কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য ঘোষণাবলী থেকে বুঝা যায় যে, ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান এবং 'সর্বত্র বিরাজমান থাকা ও সর্বদ্রষ্টা হওয়া' (হাজির নাজির হওয়া) আল্লাহ তায়ালার একক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যেসব মুসলমান আল্লাহর এসব একক বৈশিষ্ট্যকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য কোনো নবী বা অলির মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করে, কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য সিদ্ধান্তের আলোকে তারা শিরক এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে। তাদের বেলা 'মুশরিক' শব্দের প্রয়োগ না করা কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম অমান্য করার শামিল হবে। এ ধরনের লোককে আরবের মুশরিকদের সমতুল্য বলা মোটেই বাড়াবাড়ি নয়, বরং এটাই ইনসাফ ও ন্যায়নীতির যথার্থ দাবি।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভেতরে এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি স্বীকার করাতে তো আপনি শিরক মনে করেন। অথচ এ শিরক যে করে তাকে মুসলমান মনে করেন এবং তার উপর 'মুশরিক' শব্দের প্রয়োগকে সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি মনে করেন। এর হেতু কি এবং এই স্ববিরোধিতা কেন?

আপনি একজন মুসলমানকে এজন্য মুশরিক বলেন না যে, সে প্রথমত: ব্যাখ্যার ভ্রান্তিতে লিপ্ত। দ্বিতীয়ত: সে শিরককে শিরক মনে করে তাতে লিপ্ত হয়না। আপনার এই দু'টো ব্যাখ্যাই ভ্রান্ত বলে আমি মনে করি।

উত্তর : আমি কুরআন শরীফ যতোটুকু অধ্যয়ন করেছি তার আলোকে আমি মনে করি যে, কোনো ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলেই বা কারো চিন্তা ও কর্মে শিরক পাওয়া গেলেই তাকে পরিভাষাগতভাবে 'মুশরিক' আখ্যায়িত করা চলেনা এবং তার সাথে মুশরিকসুলভ আচরণও করা যায়না। এই আখ্যা ও আচরণ লাভের অধিকার কেবল তারাই যাদের কাছে শিরকই আসল ধর্ম, যারা তাওহীদকে মৌলিক আকীদা হিসেবে স্বীকার করেনা এবং অহি, নবুয়্যত ও আল্লাহর কিতাবকে ধর্মের উৎস হিসেবে একেবারেই প্রত্যাখ্যান করে।

এই প্রমাণ এই যে, পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা শিরকে লিপ্ত। যেমন :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ.

www.icsbook.info

"ইহুদীরা বলে যে, ওযায়ের আল্লাহর পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে যে, মাসীহ (ঈসা আ.) আল্লাহর পুত্র।" (সূরা তাওবা : আয়াত ৩০)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ـ

"যারা বলেছে যে, মরিয়মের পুত্র মাসীহই তো আল্লাহ, তারা অবশ্যই কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। -------- "

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ

"নিশ্চয়ই তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে যারা বলেছে যে, আল্লাহ তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়।" (সূরা মায়েদা : আয়াত৭২-৭৩)

কিন্তু তা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে তাদের জন্য 'মুশরিক' পরিভাষাটা প্রয়োগ করা হয়নি। বরং তাদের জন্য আরেকটা পরিভাষা 'আহলে কিতাব' প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া তাদের ও মুশরিকদের মধ্যে শুধুমাত্র এই পারিভাষিক পার্থক্যই রাখা হয়নি, বরং তাদের সাথে মুসলমানদের আচরণও মুশরিকদের থেকে ভিন্ন ধরনের মনোনীত করা হয়েছে। তাদেরকে যদি যথার্থই মুশরিক আখ্যায়িত করা হতো, তাহলে وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ 'মুশরিক নারীরা যতোক্ষণ মুসলমান না হয়, ততোক্ষণ তাদেরকে বিয়ে করোনা।' এ আয়াতের অধীন ইহুদী খৃষ্টান মহিলাদের বিয়ে করা আপনা আপনি হারাম হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ের বিধি মুশরিক নারীদের থেকে পৃথক রেখেছেন এবং তাদেরকে বিয়ে করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে মুশরিকদের বিপরীত আহলে কিতাবের যবেহ করা জন্তুর গোশত হালাল রেখেছেন। এর একমাত্র কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, শিরকে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা তাওহীদকেই আসল ধর্ম মনে করতো এবং নবুয়্যত ও আল্লাহর কিতাবকেই ধর্মের উৎস বলে স্বীকার করতো। এ কারণেই তো তাদেরকে বলা হয়েছিল যে :

تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ـ

"এমন একটি কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই সমান। সে কথাটা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবোনা, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবোনা এবং আমরা পরস্পরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবোনা।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৬৪)

www.icsbook.info

وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْکُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُکُمْ وَاحِدٌ

"এবং বল, আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপর আমরা ঈমান আনলাম আর আমাদের ও তোমাদের ইলাহ্ এক ও অভিন্ন।" (সূরা আনকাবুত : আয়াত ৪৬)

মুশরিকদের ব্যাপারটা এর ঠিক বিপরীত। আল্লাহ্ তায়ালা 'মুশরিক' পরিভাষাটা তাদের জন্য ব্যবহার করেছেন, যারা শিরককেই প্রকৃত ধর্ম মনে করতো, যাদের প্রধান আপত্তিই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এই ছিলো যে :

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ۔

"সে (নবী) কি বহুসংখ্যক মাবুদের স্থলে একজন মাত্র মাবুদ নির্ধারণ করে ছিলো? এতো খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! তাদের কাছে একথা আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিলনা যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকে অহি ও রিসালাত থেকে গৃহীত হতে হবে। যেমন :

وَاِذَا قِیْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَیْنَا عَلَیْهِ اٰبَآءَنَا ۔

"যেমন তাদেরকে বলা হলো যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো, তখন তারা বললো, আমরা বরং আমাদের বাপদাদাকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করবো।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৭০)

বস্তুত তাদেরকেই আল্লাহ্ 'মুশরিক' নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের সাথে মুসলমানদের আচরণ আহলে কিতাব থেকে ভিন্ন ধরনের স্থির করেছেন।

উল্লিখিত তত্ত্ব ও তথ্য আমার সামনে রয়েছে বলেই যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' এই কলেমায় বিশ্বাসী, যারা কুরআনকে আল্লাহর কিতাব, ইসলামের আসল উৎস, দলিল ও সনদ মানে, যারা ইসলামের প্রয়োজনীয় সকল নীতি ও বিধিকে স্বীকার করে এবং যারা শিরককে আসল ধর্ম মনে করা দূরে থাক্ তাদের বিরুদ্ধে শিরকের অভিযোগ আরোপ করাকে জঘন্যতম গালি হিসেবে বিবেচনা করে, অথচ এরপরেও কিছু আয়াত ও হাদিসের ভুল মর্ম গ্রহণের কারণে কোনো মুশরিকসুলভ আকীদা ও কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তাদেরকে 'মুশরিক' আখ্যায়িত করা এবং তাদের সাথে মুশরিকদের মতো আচরণ করাকে আমি একেবারেই জায়েয মনে করি না। তারা শিরককে শিরক মনে করে তাতে লিপ্ত হয় না, বরং এরূপ ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের এসব ধারণা বিশ্বাস ও কাজ তাওহীদ বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। এজন্য তাদেরকে একটা খারাপ

www.icsbook.info

নামে আখ্যায়িত করার পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও যুক্তির সাহায্যে তাদের ঐ ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আপনি নিজেই ভাবুন, আপনি যখন এ ধরনের কোনো লোকের সামনে তার কোনো আকীদা ও আচরণকে তাওহীদের পরিপন্থী প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও হাদিস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন তখন আপনার মনেও কি এ ধারণাই বিরাজ করেনা যে, লোকটা যাই করুক, কুরআন ও হাদিসকে চূড়ান্ত দলিল ও সনদ অবশ্যই মানে। কোনো হিন্দু, শিখ, অথবা খৃষ্টানের সামনে কি আপনি এভাবে যুক্তি তুলে ধরেন? এরপর যখন আপনি তাকে বলেন যে, দেখো! অমুক কাজটা শিরক, কাজেই ওটা পরিহার করো, তখন আপনি কি এটা মনে করেননা যে, ঐ ব্যক্তি শিরককে মহাপাপ বলে বিশ্বাস করে? তা যদি না হতো তাহলে আপনি তাকে শিরক থেকে সাবধান করার চিন্তাই বা করবেন কেন? (তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৬৩)।

তারাবীহ্ নামাযের রাকাত সংখ্যা

প্রশ্ন : তারাবীহ্ নামাযের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের আপনার প্রদত্ত উত্তর ৭-৩-১৯৬৩ ঈসায়ী তারিখে সাপ্তাহিক 'এশিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জবাব পড়ে বুঝলাম, বিষয়টির আপনি বিজ্ঞজনোচিত বিশ্লেষণ করেননি। বরং প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। এতে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেছে। একদিকে আপনি বলছেন 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারাবীহ্ ছিলো আট রাকাত।' অপরদিকে বলেন : 'উমর (রা.) বিশ রাকাতের প্রচলন করেন এবং সকল সাহাবি এর উপর একমত হন। পরবর্তী খলিফাগণও এই নিয়মেরই অনুসরণ করেন।

এখন প্রশ্ন জাগে, সুন্নতে রসূল যখন আট রাকাত তখন হযরত উমর (রা.) বিশ রাকাত কোত্থেকে গ্রহণ করলেন? কেমন করে তা জারি করলেন? সকল সাহাবি এবং খলিফাগণ সুন্নতে রসূলকে উপেক্ষা করে কিভাবে বিশ রাকাতের উপর ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠা করেন? সাহাবিগণ এরূপ দুঃসাহস করবেন, তা কি সম্ভব? (মাওলানা! হয়তো আট রাকাত সুন্নতে রসূল নয়, কিংবা বিশ রাকাতের উপর সাহাবিগণের ইজমা হয়নি)।

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সুন্নতে রসূল যেহেতু আট রাকাত, সেহেতু হযরত উমর (রা.) বিশ রাকাতের প্রচলন করেছেন না বলে আট রাকাত জারী করেছেন বললে অধিকতর কিয়াসসম্মত হয়না কি? কেননা প্রথমত সুন্নত তো আট রাকাত।

www.icsbook.info

দ্বিতীয়ত সুন্নতের দাবি তো হচ্ছে হযরত উমর (রা.) আট রাকাতেরই প্রচলন করবেন। তৃতীয়ত হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত উমর (রা.) আট রাকাতই পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তায় সায়িব ইবনে ইয়াযীদের নিম্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন :

সায়িব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর (রা.) রমযান মাসের নামাযের ব্যাপারে উবাই ইবনে কাব এবং তামীম আদ-দারীকে এগার রাকাত পড়ানোর নির্দেশ দেন।" (মিশকাত সূত্রে উদ্ধৃত)।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-রাজী বলেছেন 'হযরত উমর (রা.) সম্ভবত রসূলের তারাবীহ থেকেই আট রাকাত গ্রহণ করেছেন।' (তানবীরুল হাওয়ালেক)

ইমাম মালেক বলেছেন : হযরত উমর (রা.) লোকদেরকে যতো রাকাতের জন্যে একত্র করেছিলেন, সেটাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তা হচ্ছে এগার রাকাত। বস্তুত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাকাতই পড়েছিলেন।'

ইমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করা হয় : 'এগার রাকাত কি বিতরসহ?' জবাবে তিনি বলেন হ্যাঁ। আর তের রাকাত ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের কাছাকাছি। আমার বুঝে আসেনা লোকেরা এতো রাকাত তারাবীহ কোথেকে আবিষ্কার করলো' (সুয়ূতী : আল-মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ্)।

আপনার বক্তব্য পড়ার পর একথা আমার বুঝে আসছে না যে, সুন্নতে রসূলে আট রাকাত হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) কেন বিশ রাকাতের প্রচলন করলেন? তাঁর নিকট কি সুন্নতে রসূলের কোনো বাস্তবতা ছিলনা? নাকি সুন্নতের অনুসরণে কমতির আশংকা ছিলো তাঁর? আর নাকি বিশ রাকাত পড়াটা উম্মতের জন্যে আট রাকাতের মতোই সহজ ছিলো? কিংবা বিশ রাকাত আট রাকাতের চাইতে অধিক খোদাভীতি জাগ্রত হতে পারতো? শেষ পর্যন্ত কোন্ যুক্তিতে, কোন্ দাবির ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.) একটি সহজতর সুন্নতে রসূলের স্থলে একটি কঠিন কাজ করার হুকুম উম্মতকে প্রদান করলেন?

উপরোদ্ধৃত উক্তি সনদ ও মতনের উভয় দিক থেকে সহীহ, সুন্নতে রসূল অনুসরণের দর্পণ এই সঠিক হাদিসগুলোর পরিবর্তে আপনি গ্রহণ করেছেন জয়ীফ হাদিস, সেগুলোর রেওয়ায়েত এবং দেরায়াত কোনো দিক থেকেই সহীহ নয়। তবে কেন? আপনার নিকট হাদিস গ্রহণ বর্জনের এবং অগ্রাধিকার দানের কি মানদণ্ড যদ্বারা আপনি হাদিস যাচাই বাছাই করেন? মেহেরবানী করে বিস্তারিত ও

www.icsbook.info

স্পষ্টভাবে আলোচনা করবেন, যাতে আমরাও একটি ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হই।[১]

উত্তর : 'এশিয়া' এবং 'শিহাব' পত্রিকা আমার দরসের যে সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছে, সে সম্পর্কে ঐ পত্রিকা দু'টির মাধ্যমেই বহুবার একথা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সেগুলো শাব্দিকভাবে হুবহু আমার বক্তব্য নয়। আমার পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যও সেখানে উদ্ধৃত হয়না। আর যতোটুকু প্রকাশ করা হয় তাও আমাকে দেখিয়ে প্রকাশ করা হয়না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে এসব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পড়ে লোকেরা আমার উপর প্রশ্নের বাণ ছুঁড়তে থাকে। এমনকি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি। এ সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের ব্যাপারে আমি এজন্য রাজি হয়েছিলাম যে, মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয এবং কাওসার নিয়াযী উভয়ে মত প্রকাশ করেন যে, এতে সাধারণ পত্রিকা পাঠকগণও দরস থেকে উপকৃত হতে থাকবেন। কিন্তু এগুলোর উপর প্রশ্ন যদি এতো ব্যাপকভাবে আসতে থাকে, তাহলে তাদের উভয়কেই এ জিনিস প্রকাশ করা বন্ধ করতে অনুরোধ করতে হবে। অন্যদের সংকলিত রিপোর্টের উপর আমি আর কতো জবাবদিহি করতে থাকবো!

তারাবীহর রাকাতের বিষয়টি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিনের ঝগড়া ও তর্ক বাহাছ উভয় পক্ষকে বেপরোয়া বানিয়ে দিয়েছে। তাই আট বা বিশ শব্দটি কারো মুখ দিয়ে বেরুতেই অপর পক্ষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হয়ে যায় এবং চ্যালেঞ্জ করা শুরু করে দেয়। বর্তমান প্রশ্নটি সেই মত্ততারই পরিণতি। অথচ বিষয়টি এরকমই নয় যে, তা নিয়ে ঝগড়া বা তর্ক বাহাছের প্রয়োজন আছে। কেউ যদি আট রাকাতের প্রমাণ পেয়ে থাকেন তবে আট রাকাত পড়বেন এবং অযথা বিশ রাকাতকে বিদ'আত ঘোষণা করতে গিয়ে নিজের শক্তি সামর্থ অপব্যয় করার কোনো প্রয়োজন তার নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিশ রাকাতেরই প্রমাণ পেয়ে থাকেন, তবে তিনি বিশ রাকাত পড়বেন। আট রাকাতের অনুবর্তনকারীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা তার উচিত নয়। পৃথিবীতে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মুখে এর চাইতে অনেক বিরাট কাজ

---

১. উল্লেখ্য, মাওলানা নিয়মিত যে দরসে হাদিস পেশ করতেন, মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয সম্পাদিত 'এশিয়া' এবং কাওছার নিয়াযী সম্পাদিত 'শিহাব' পত্রিকায় তার সারসংক্ষেপ তাঁরা প্রকাশ করতেন। শ্রোতা হিসেবে অনুষ্ঠান থেকে বক্তব্য সংগ্রহ করেই তা সংক্ষিপ্তাকারে তাঁরা প্রকাশ করতেন। এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত এরূপ একটি রিপোর্টের উপরই প্রশ্নকর্তার অভিযোগ। –অনুবাদক

www.icsbook.info

পড়ে আছে, যা তাদের মনোযোগ, শ্রম, সময় এবং সম্পদের দাবি করছে। সেগুলোকে ত্যাগ করে এসব গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ এবং তর্ক বাহাছ নিজেদের সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য খুইয়ে দেয়া আল্লাহর দীনের সংগে ইনসাফ হতে পারেনা।

সম্মানিত প্রশ্নকর্তা প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তারাবীহর নামায আট রাকাতের অধিক পড়া সুন্নতের খেলাফ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ আট রাকাত পড়েছেন– এটাই তার দাবির ভিত্তি। অথচ এর ভিত্তিতে যদি তারাবীহ আট রাকাতের অধিক পড়াকে সুন্নতের খেলাফ বলা বৈধ হয়, তবে একজন লোককে গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাতে পড়তে হবে এবং এর চাইতে অধিক পড়াকে সুন্নতের খেলাফ বলে ঘোষণা করতে হবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাতে পড়েছেন বলেই প্রমাণিত। প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত উমর (রা.) যে সকল মুসলমানদের জন্যে গোটা রমযান মাসে নিয়মিত প্রতিদিন মসজিদে জামাতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার বন্দোবস্ত করে গেছেন– আপনি তাঁর এই ইজতিহাদকে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে সুন্নতের খেলাফ বলে আখ্যায়িত করলেননা। তাহলে তাঁর তারাবীহর নামায বিশ রাকাত নির্ধারণ করাটা কোন্ দলিলের ভিত্তিতে সুন্নতের খেলাফ হয়ে গেলো?

হযরত উমর (রা.) থেকে যে বিশ রাকাত প্রমাণিত– বিজ্ঞ প্রশ্নকর্তা এ ব্যাপারেই সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে দিতে চাইছেন। মূলত এটা উন্যাসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত উমর (রা.) যে তারাবীহ বিশ রাকাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সাহাবিগণ তা কবুল করে নিয়েছিলেন। তাঁর পরেও খলিফা ও সাহাবিগণ এরি আমল করেন। ইমাম তিরমিযি (র.) বলেন :

"অধিকাংশ আহ্লে ইল্ম' সেই নিয়মই মেনে চলেন যা হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ বিশ রাকাত।"

মুহাম্মদ বিন নাসরুল মারওয়ারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এই একই কথার উল্লেখ করেন। ইবনে আবি শাইবা বিশ রাকাতকে হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত উবাই ইবনে কাব এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের আমল বলে উল্লেখ করেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন, প্রসিদ্ধ আলেমগণ বিশ রাকাতেরই প্রবক্তা ছিলেন। তাছাড়া বিশ রাকাতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিলনা। ইবনে কুদামাহ্ তাঁর আল–মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন :

www.icsbook.info

"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে তারাবীহ্ বিশ রাকাতই উত্তম। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা এবং শাফেয়ীর বক্তব্যও তাই। কিন্তু ইমাম মালেক ছত্রিশ রাকাতের প্রবক্তা। তাঁর মতে, ইসলামের প্রাচীন যুগ থেকে ছত্রিশ রাকাতই চলে আসছে। .... এর প্রতিকূলে আমাদের দলিল হচ্ছে, হযরত উমর যখন সকল বিচ্ছিন্ন তারাবীহ্ পড়ুয়াদের উবাই ইবনে কাবের ইমামতিতে একত্র করলেন, তখন হযরত উবাই ইবনে কাব বিশ রাকাত তারাবীহ্ পড়াতেন। .... আর একথাও প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রা.) এক ব্যক্তিকে রমযানে বিশ রাকাত তারাবীহ্ পড়ানোর জন্যে নিয়োগ করেন। তাঁদের এ আমল প্রায় 'ইজমার' সমার্থক। যদি একথা প্রমাণও হয় যে, পরবর্তীতে মদিবাবাসীরা ছত্রিশ রাকাত তারাবীহ্ পড়েছেন, তবু হযরত উমর (রা.) যা কিছু করেছিলেন এবং যার উপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের যুগে একমত হয়েছিলেন– তার অনুসরণ করাই উত্তম।" (আল মুগনী : প্রথম খণ্ড)

এসব দলিল প্রমাণের প্রতিকূলে সম্মানিত প্রশ্নকর্তার সমস্ত আস্থা কেবল সেই বর্ণনাটির উপরই নিবদ্ধ যা ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তায় সায়িব ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে সংকলন করেছেন। তাতে তিনি বলেন 'হযরত উমর (রা.) বিতরসহ তারাবীহ্ এগার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।' কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনটি কথা বিবেচ্য। প্রথমত, এই মুয়াত্তা গ্রন্থেই ইমাম মালেক ইয়াযীদ ইবনে রূমানের এই বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন :

"হযরত উমর বিতরসহ তারাবীহ্ তেইশ রাকাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্মানিত প্রশ্নকর্তা এ বর্ণনাটি উপেক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সেই সায়িব ইবনে ইয়াযীদ, যার সূত্রে ইমাম মালেক এগার রাকাতের বর্ণনা সংকলন করেছেন, তাঁরই সূত্রে অত্যন্ত সহীহ্ সনদসহ বায়হাকী তেইশ রাকাতের পক্ষে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, হযরত উমর (রা.) প্রথম দিকে যদিও এগার রাকাত নির্ধারণ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে তা তেইশ রাকাতে পরিবর্ধন করেন।

তৃতীয়ত, স্বয়ং ইমাম মালেক এ দু'টি বর্ণনার একটিও গ্রহণ করেননি। বরং তিনি ছত্রিশ রাকাতের পক্ষে ফায়সালা দেন। তিনি বলেন, এক শতাব্দী কালেরও অধিক সময় থেকে মদিনায় তিন রাকাত বিতর এবং ছত্রিশ রাকাত তারাবীহ্ পড়ার প্রথা চলে আসছে। সুয়ুতী তাঁর আল–মাসাবীহ্ গ্রন্থে যা-ই লিখে থাকুন না কেন, মালেকী ফকীহগণ কিন্তু তাঁদের ইমামের উপরোক্ত বক্তব্যকেই সঠিক মনে করেন।

www.icsbook.info

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে বুঝা যায়, যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট রাকাত পড়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেয়ীগণ প্রায় সমষ্টিগতভাবে তাঁর এ কাজের অর্থ এটা মনে করেননি যে, আট রাকাত পড়াই সুন্নত এবং তার চাইতে অধিক পড়া সুন্নতের খেলাফ কিংবা বিদ'আত। আশ্চর্যের বিষয়, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কে কি করে এ ধারণা করা হলো যে, তাঁরা সুন্নত এবং বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা থেকে ততোটা মাহরূম ছিলেন, কিংবা তাঁরা সুন্নত ত্যাগ করে বিদ্দ'আত গ্রহণ করেছেন?

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, কেউ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আট রাকাত পড়ার অর্থ এটা মনে করেন যে, সুন্নত হিসেবে আট রাকাতের প্রচলন করাই তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তবে তিনি ভালোবাসার সাথে তার উপরই আমল করুন এবং তার মতের সমর্থকগণও এরই উপর আমল করুন। কিন্তু বিশ রাকাতকে সুন্নতের খেলাফ ঘোষণা এতোটা সহজ নয়, যতোটা প্রশ্নকর্তা ধারণা করেছিলেন। কেননা বিশ রাকাতের পক্ষে দলিল প্রমাণ মওজুদ রয়েছে।

সমাপ্ত

www.icsbook.info